সৈয়দ আমীর আলী : শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ - ২০১০ ইং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড: মুহাম্মদ রুহুল আমীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনায়
রঞ্জনাহার মুক্তা
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
B
320.92
MUS
c.1

জুন- ২০১০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

448887

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলী : শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ - ২০১০ ইং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনায়
রঞ্জুনাহার মুক্তা
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন- ২০১০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলী : শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ - ২০১০ ইং
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড: মুহাম্মদ রুহুল আমীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনায়

রঞ্জুনাহার মুক্তা
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন- ২০১০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলী : শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান

রঞ্জুনাহার মুক্তা
এম. ফিল. গবেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা' কে

করকমলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রঞ্জুনাহার মুক্তা, এম. ফিল. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে "সৈয়দ আমীর আলী: শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান" শীর্ষক অভীসন্দর্ভটির কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছে। আমার জানা মতে, ইতো:পূর্বে অভিসন্দর্ভটির পুরো কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ভাষাতেই ডিগ্রী অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। তাই তার অভিসন্দর্ভখানি জমা নিয়ে মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের সুপারিশ করছি।

তারিখ.....০৩/০৮/২০২০

(ড. মুহাম্মদ রহুল আমীন)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার নামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "সৈয়দ আমীর আলী : শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম। এর সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

রঞ্জনাহার মুক্তা
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। দূরূদ ও সালাম জানাই বিশ্বমানবতার পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর উপর। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ অনুগ্রহে " সৈয়দ আমীর আলী: শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান" শিরোনামে আমার লেখা এই অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম।

সর্বপ্রথমে আমি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। তাঁর কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা না ফেলে আমার পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল। তাঁর কর্ম ব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বে ও তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম শিকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় মা ও বাবাকে। যাদের একান্ত উৎসাহ ও দিক নিদের্শনায় আমি উচ্চ শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়েছি। তাঁদের আপত্যস্নেহ অকৃত্রিম ভালবাসা ও দোয়াই হল আমার জীবন চলা ও জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পাথেয়। তাঁদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণা কর্মের এক অনুপম নিয়ামক। এজন্য আমি তাঁদের প্রতি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

আমার এই গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক, ডঃ আ.ব. ম. আলী হায়দার, ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বাকী, ডঃ মুহাম্মদ মুজতবা হুসাইন , ডঃ আ.ব.ম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ডঃ আ.ন.ম. রইচ উদ্দিন ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ও ডঃ মুহাম্মদ শফিকুর রহমান । এ ছাড়াও রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সাইদ-উর রহমান ও ডঃ ওয়াকিল আহমেদ এবং উর্দু ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রমুখ অন্যতম। তাঁদের ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে দু:সাধ্য।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ডঃ মু: বাসার ভাইকে। তার আন্তরিক উৎসাহ অনুপ্রেরণা, সুচিন্তিত অভিমত ও মূল্যবান পরমর্শ আমার গবেষণা কর্মকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আমার গবেষণা কর্মের তথ্য- উপাত্তের উৎসের সন্ধান দানে এবং তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদানে তার আন্তরিকতার কোন কমতি ছিল না। বিভিন্ন পর্যায়ে তার অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ সাহায্য- সহযোগিতা আমার গবেষণা কর্মকে আরও সহজ ও করেছে। তার প্রতি আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা রইল।

আমার গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার জন্য যিনি সার্বক্ষনিক সাহায্য, সহযোগিতা, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন। তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী এস. এম. হাদিউজ্জামান। এই গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করেছেন। তার সাহয্য-সহানুভূতি না পেলে আমার পক্ষে এত দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। তাই আমি তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমার এই গবেষণা কর্ম চালাতে গিয়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার হতে উপাত্ত, উপকরণ সংগ্রহ করেছি তম্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, গুলিস্থান জাতীয় লাইব্রেরী এবং বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার অন্যতম। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আরো অনেক সূধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তাদেরকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এ ক্ষেত্রে আমার ভাই মোঃ মাসুদুর রহমান, ভ্রাতৃতুল্য মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম, খালা মঞ্জুনাহার শিউলি, চাচা শামীম মুহাম্মদ সাকী, মামা মোঃ ফসিয়ার রহমান, ছোট ভাই বাবু, বোন সঞ্জুনাহার রিক্তা এবং সাবিহা খাতুন। এ ছাড়াও নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝে আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদন করার সময় যেসব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন সাহায্য-সহযোগিতা যুগিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

কর্মকর্তা

পরিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কর্মচারী জনাব মো ঃ ইকবাল হোসেন, রফিক, মোয়াজ্জেম ভাই, মুন্না, এবং গিয়াস উদ্দীনের সহযোগিতা মোটেও ভুলবার নয়। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এ সঙ্গে আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরাফাত কম্পিউটার সেন্টারের মোঃ জহিরুল আলমকে। যিনি এ প্রচণ্ড উত্তপ্তের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট শর্তে ও আমার গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করছেন।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ — রঞ্জুনাহার মুক্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা:

আ./আঃ	:	আরবী / আলাইহিস সালাম
সঃ	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রাঃ	:	রাদিয়াল্লাহু আনহু/ আনহা
ইং	:	ইংরেজী
বাং.	:	বাংলা
জানুঃ	:	জানুয়ারী
অক্টোঃ	:	অক্টোবর
শী'আঃ	:	শীয়া সম্প্রদায়
OP:	:	Opera
Cit:	:	Citra
P:	:	Page
পৃঃ	:	পৃষ্ঠা
মোঃ	:	মোহাম্মদ
প্রঃ	:	প্রকাশ
অনুঃ	:	অনুবাদ
অনূঃ	:	অনূবাদক
হিঃ	:	হিজরী
খৃ.	:	খৃস্টাব্দ
মৃ.	:	মৃত্যু
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর

Dhaka University Institutional Repository

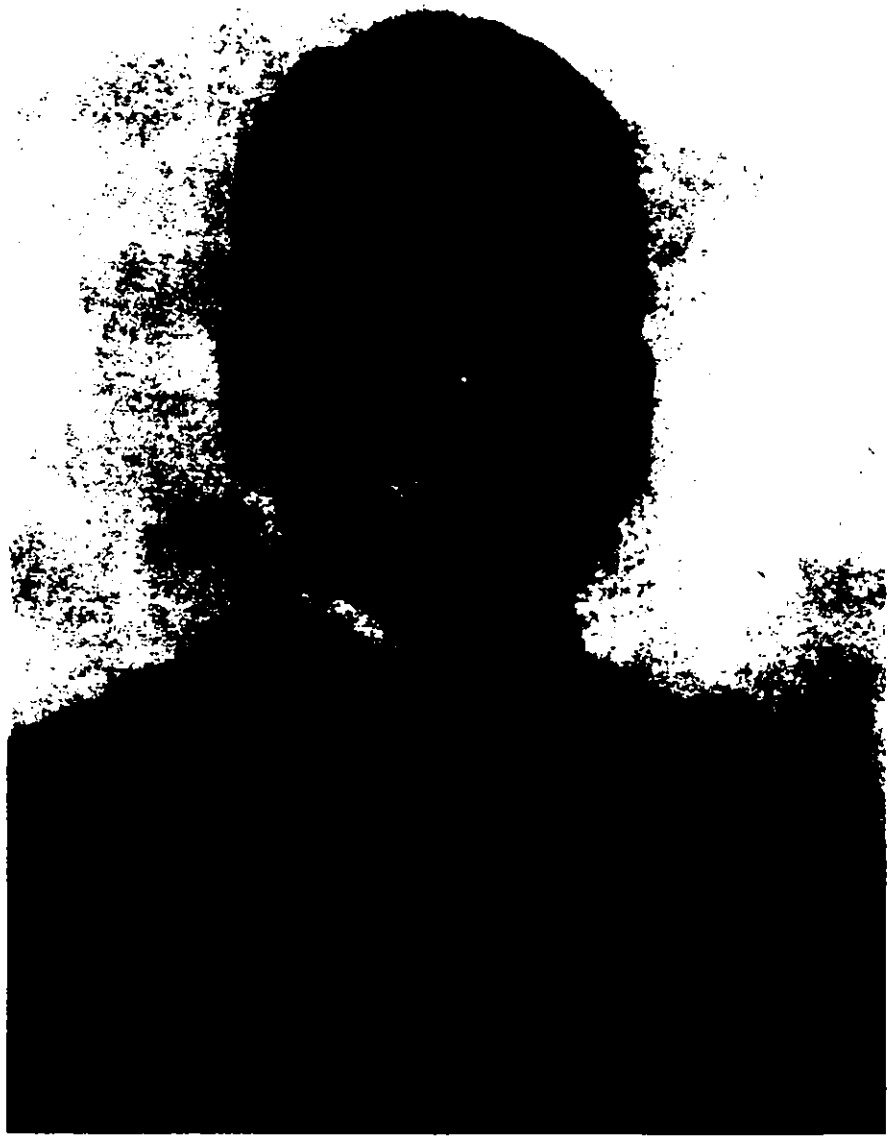

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা :

বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর গুরুত্ব অনেক। এই শতাব্দীতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি যুগের অবসান এবং আর একটি নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটে। এই পালাবদলের কালে বাঙালি যা অর্জন করেছে এবং যা অর্জন করতে পারেনি, তা-ই দিয়ে তার জাতীয় সম্পদ, জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে পরিবর্তনের ধারাগুলো বোঝা যায় এবং তদনুযায়ী জাতীয় জীবনের রূপ-প্রকৃতি ও গতিবিধি নির্ণয় করা যায়।

বাংলার দুটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান। উভয়ের জীবন এক সূত্রে বাঁধা থাকলেও উভয়ের ভাগ্য এক নিয়মে গড়ে ওঠেনি। এক রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বসবাস করলেও তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সমভাবে পাননি এবং ধর্মনীতি ও সমাজনীতিতে ভেদ থাকায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাঁদের উপর সমভাবে কাজ করেনি।

মধ্যযুগে মুসলমান শাসক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় মুসলমানদের একটি শ্রেণী যে সুবিধা ভোগ করেছেন, হিন্দুগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বঞ্চিত হয়ে তা পাননি। আবার আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তৃতীয় পক্ষের হাতে গেলে হিন্দু ও মুসলমানদের উপর তার প্রভাবও সমভাবে পড়েনি। কোম্পানির শাসনের শুরু থেকে হিন্দু সম্প্রদায় যেসব সুযোগ গ্রহণ করে অগ্রসর হন, মুসলমান সম্প্রদায় প্রথম দিকে সেসব সুবিধা পরিহার করে পিছিয়ে পড়েন। তারা নবযুগের পরিবর্তনের ধারাটি ও উপলব্ধি করতে দেরি করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের চৈতন্যোদয় হয় উনিশ শতকের দিত্বীয় ভাগে। তখন থেকে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের পালা শুরু হয়। নবজীবনের দৌড়-পাল্লায় অন্যূন পঞ্চাশ বছরের এই ব্যবধান বাংলার দুটি সম্প্রদায়কে দুটি স্বতন্ত্র কক্ষে স্থাপন করে এবং পরস্পর স্বার্থে বিবাদমান দুটি শিবিরের সূচনা করে। তাইতো প্রখ্যাত ঐতিহাসিক W.W Hanter এর মতে,"একশ বছর

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে যেখানে কোন গরীব বা অশিক্ষিত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব। একশ বছর পরে সেই মুসলমানদের মধ্যে কোন বিত্তবান ও বিদ্বান ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর।" তাঁর এ বক্তব্য ছিল ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত যাওয়ার পর। অর্থাৎ ১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য-অস্ত যাওয়ার পর ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজ যখন শিক্ষা-দীক্ষা, আমল-আখলাক ইত্যাদি সকল দিক থেকে চরমভাবে অবহেলিত ছিল বিশেষ করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আল্লাহর মনোনীত দ্বীন তথা ইসলাম চরমভাবে অবহেলিত এমনই সংকটময় মুহূর্তে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ধর্মীয় পুনর্জাগরণ ও সাংস্কৃতিক পুনজন্মের জন্য যে কয়েকজন মনীষী ত্রানকর্তা রূপে মুসলমান সমাজে আবির্ভুত হয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য দ্বারা বাংলা তথা বিশ্বের মুসলমানদের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ ও সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের জন্য তাঁর দান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম আইন ও ইতিহাসে তাঁর জ্ঞান ছিল অসামান্য। তিনি বহু বছর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র কেবল আইন ও বিচারালয়ের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; তিনি সমাজসেবার কাজেও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পুনর্জাগরণের পথ প্রশস্ত করেন। মুসলমানদের প্রাচীন সংস্কৃতির-পুনরুদ্ধার এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রেণেসাঁ আন্দোলন সৃষ্টি তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। এই মহান উদ্দেশ্যে তিনি জীবনব্যাপী যে সাধনা করেছিলেন তার ফল সুদূর প্রসারী হয়েছিল। তাছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন একজন

Dhaka University Institutional Repository

আইনজীবী তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগী এবং ইসলামের ইতিহাস ও সমাজবিপ্লবের লেখক ছিলেন। তিনি মুসলিম জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য এবং তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে রচনা করে গেছেন প্রাঞ্জল ভাষায় বেশ কয়েকখানা গ্রন্থ। যা থেকে আজও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং অনাগত দিনেও করবে।

সৈয়দ আমীর আলী একটি জীবন্ত ইতিহাস। তাঁর মত প্রাত:স্মরণীয় মহান এ সংস্কারকের কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মতি- সূক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনা করে গবেষণা ধর্মী একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। তথাপিও আমি মহান আল্লাহর সীমাহীন রহমতের উপর ভরসা করেই উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় ক্ষণজন্মা মহান এ সংস্কারকের জীবন কর্মকে ভবিষৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার জন্য আমার গবেষণা সন্দর্ভের জন্য নির্বাচন করেছি এই তথ্য বহুল বিষয়বস্তুটি।

এই অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববরেণ্য মনীষী-সৈদয় আমীর আলী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদভাবে পর্যোলোচনা করা। তাই এই শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। "সৈয়দ আমীর আলী: শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান"

আমার জানা মতে এ যাবত কোন গবেষক তাঁর বিস্ময়কর অবদান মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ব্রতী হননি এবং তাঁর বনাঢ্য কর্ম বহুল জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। অথচ বিশ্ব বরেণ্য এই মনীষীর জীবন চরিত আমাদের চলার পথে যেন এক ধ্রুব নক্ষত্র। এসব কথা বিবেচনায় এনে তার জীবন ও কর্ম গবেষণার জন্য নির্ধারণ করেছি।

এই গবেষণা কর্ম সূচনা করতে গিয়ে আমি নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হই। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের নিখুঁত জীবন চরিত উপস্থান করা অত্যন্ত শ্রম সাধ্য

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপার তার জীবন চরিত এবং কর্ম জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত কোন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়নি। কাজেই আমার অধিকংশ তথ্য সংগ্রহ করিছি ঐতিহাসিক ও জীবনী গ্রন্থকারগণের মূল গ্রন্থাবলী থেকে এবং দুস্প্রাপ্যতার কারণে ঐ সকল মূল গ্রন্থের সাহায্যে রচিত পরবর্তী কালের গ্রন্থাবলী থেকে।

তাঁদের জীবন কথা লিখতে গিয়ে আমি যেমন বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি তেমনি তাদের লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকেও উপাত্ত গ্রহণ করেছি। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম ও বংশ পরিচিতি, তিনি শৈশবকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছেন এবং শিক্ষা জীবনে কোথায়-কোথায় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে- সৈয়দ আমীর আলীর সংসার জীবন, চাকুরী ও পদক লাভ আর অবসর/বিলেতে প্রবাস জীবন কেমনভাবে অতিক্রম করেছেন সেদিক উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে- সৈয়দ আমীর আলীর অবদান, মুসলমাদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা, হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, (সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান"- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী : সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য, আইন, রাজনীতি ও স্মারকপত্র, ডেপুটেশন ও বিপ্রেজেন্টেশন, সভা, পরিণতি, শাখা এসোসিয়েশন : বগুড়া শাখা, চট্রগাম শাখা, খুলনা শাখা, হুগলী শাখা, জাহানাবাদ শাখা, মেদিনীপুর শাখা, রাজশাহী শাখা, রংপুর শাখা, বর্ধমান শাখা, ময়মনসিংহ শাখা, পাবনা শাখা ও মালদহ শাখা) রাজনৈতিক কর্মসূচী, মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদ, লণ্ডন মুসলিম লীগ, স্বতন্ত্র নির্বাচন,

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম রেণেসাঁ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বিচার ক্ষেত্রে ও জীবনাবসান প্রভৃতি পর্যালোচনা বিষয়ক দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে- সৈয়দ আমীর আলীর গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা, লাইফ এণ্ড টিচিং অব দি প্রফেট, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, এ সর্ট হিস্টরী অব দি সারা সিনস্, ইসলামীক হিস্টরী এন্ড কালচার, খ্রীশ্চীয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামীক স্টেন্ড পয়েন্ট, ইসলাম লিগাল সেন্টাস অব ওনমিন ইন ইসলাম, মোহামেডান ল, পারসোন্যাল ল অব দি মোহামেডান, কমেন্টারী অব দি ইন্ডিয়ান এভিডেন্স, কমেন্টারী অব দি সিভিল প্রোসেডিউর কোড, আইন-উল-হিদায়া, জিহাদ ও কমেন্টারী অব দি বেঙ্গল টেনান্সী এ্যাক্ট ইত্যাদি গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে- শিক্ষা বিস্তারে সৈয়দ আমীর আলীর অবদান, মূল্যায়ন সমাপণী বক্তব্য আলোকপাত করা হয়েছে।

পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির একটি তালিকা প্রদান করে অভিসন্দর্ভের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ **রঞ্জুনাহার মুক্তা**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

উৎসর্গ

প্রত্যয়ন পত্র

অঙ্গীকার নামা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

ছবি

অবতরণিকা

বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ঃ	(১-১১)
(ক) সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম ও বংশ পরিচিতি	২-৩
(খ) সৈয়দ আমীর আলীর শৈশবকাল	৪-৭
(গ) সৈয়দ আমীর আলীর শিক্ষা জীবন	৭-৮
(ঘ) তথ্য নির্দেশ	৯-১১
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	(১২-১৯)
(ক) সৈয়দ আমীর আলীর সংসার জীবন	১৩
(খ) সৈয়দ আমীর আলীর চাকুরী ও পদক লাভ	১৩-১৬
(গ) সৈয়দ আমীর আলীর অবসর/ বিলেতে প্রবাস জীবন	১৭
(ঘ) তথ্য নির্দেশ	১৮-১৯
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	(২০-৮৫)
(ক) সৈয়দ আমীর আলীর অবদান	২২-২৩
(খ) মুসলমানদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা	২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

(গ) হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ২৪-২৬

(ঘ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ২৬-২৮

(ঙ) সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন ২৮

(চ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৮-৩০

(ছ) গঠনতন্ত্র ৩০-৩২

(জ) কর্মসূচী ঃ ৩৩-৪২

(১) সমাজ

(২) শিক্ষা ও সাহিত্য

(৩) আইন

(৪) রাজনীতি

(৫) স্মারকপত্র

(৬) ডেপুটেশন ও রিপ্রেজেন্টেশন

(৭) সভা

(৮) পরিনতি

(ঝ) শাখা এসোসিয়েশন ৪২-৫৩

(১) বগুড়া শাখা

(২) চট্রগ্রাম শাখা

(৩) খুলনা শাখা

(৪) হুগলী শাখা

(৫) জাহানাবাদ শাখা

(৬) মেদিনীপুর শাখা

(৭) রাজশাহী শাখা

(৮) রংপুর শাখা

(৯) বর্ধমান শাখা

(১০) ময়মনসিংহ শাখা

Dhaka University Institutional Repository

(১১) পাবনা শাখা ও

(১২) মালদহ শাখা

(ঞ) রাজনৈতিক কর্মসূচী ৫৩-৫৬

(ট) জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলমান ৫৬-৫৯

(ঠ) মুসলিম জাতীয়তাবাদ ৬০-৬১

(ড) বিশ্ব মুসলিমবাদ ৬২-৬৫

(ঢ) মুসলমানদের স্বাতন্ত্রবাদ ৬৫-৬৮

(ণ) লণ্ডন মুসলিমলীগ ৬৯

(ত) স্বতন্ত্র নির্বাচন ৬৯-৭২

(থ) মুসলিম রেণেসাঁ ৭২-৭৫

(দ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ৭৫-৭৬

(ধ) বিচারক্ষেত্রে ৭৬-৭৭

(ন) জীবনাবসান ৭৭

(প) তথ্য নির্দেশ ৭৮-৮৫

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ৮৬-১০২

সৈয়দ আমীর আলীর গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনা; ৮৭-১০০

(ক) লাইফ এন্ড টিচিং অব দি প্রফেট

(খ) দ্য স্পিরিট অব ইসলাম

(গ) এ সর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিনস

(ঘ) ইসলামিক হিস্টরী এন্ড কালচার

(ঙ) খ্রীশ্চীয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামীক সেণ্ড পয়েন্ট

(চ) ইসলাম

(ছ) লিগাল স্টেটাস অব ওইমিন ইন ইসলাম

(জ) মোহামেডান ল

(ঝ) পারসোন্যাল ল অব দি মোহামেডান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ঃ

(ক) সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম ও বংশ পরিচিতি

(খ) সৈয়দ আমীর আলীর শৈশবকাল

(গ) সৈয়দ আমীর আলীর শিক্ষা জীবন

(ঘ) তথ্য নির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম ও বংশ পরিচিতি ঃ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আইনবিদ, আধুনিক চিন্তানায়ক, মুসলিম জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত, ইংরেজী শিক্ষার বলিষ্ঠ প্রবক্তা, মুসলমানদের রাজনৈতিক শিক্ষার পুরোধা এবং মুসলিম সংস্কৃতির ব্যাখ্যাকারক ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বাংলার মুসলমানদের এক যুগসন্ধিক্ষণে হুগলী জেলার চুঁচুড়াতে এক সম্ভ্রান্ত অথচ দরিদ্র শিয়া পরিবারে ১৮৪৯ সালের ৬ এপ্রিল চুচুঁড়াতে জন্ম গ্রহন করেন।[১] কারো কারো মতে তিনি ১৮৪৯ সালের ৮ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর পিতার নাম সৈয়দ সা'দাত আলী। তিনি পেশায় একজন হেকিম ছিলেন এবং তাঁর কর্মস্থল ছিল উড়িস্যার কটক। তাই কোন কোন লেখকের মতে, উড়িস্যার কটকেই তাঁর (সৈয়দ আমীর আলী) জন্ম হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের অভিমত অনুসারে চুচুঁড়াতেই তাঁর জন্ম।

সৈয়দ আমীর আলী মিশরের মহাত্মা ইমাম হযরত আলী-আর-রেজার বংশধর, যে ইমামদের একজন তাঁর জ্ঞান সাধনার জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৩] তাঁর পূর্বপুরুষ মহাত্মা ইমাম আলী-আর-রেজা সাহেব মিশরের একজন স্বনামধন্য মহাপুরুষ ছিলেন। ইমাম রেজার বংশের অনেকেই ইরানের রাজ-দরবারে কাজ করতেন। এদের কেউ ছিলেন উজির, কেউ ছিলেন নাজির, কেউ কাজী আবার কেউবা ছিলেন সেনাপতি। তাঁদের পরিবারের অন্যতম একজন মুহাম্মদ সাদেক আলী শাহ্; দ্বিতীয় আব্বাসের রাজত্বকালে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতপর বিশ্ব ত্রাস নাদির শাহের সময় খ্যাতি লাভ করেন সৈয়দ আহমদ ফাজেল খাঁ।

সৈয়দ আহমেদ ফাজেল খাঁ ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের নের্তৃত্বে সৈন্যদলের সাথে সেনা নায়ক রূপে ইরান পরিত্যাগ করে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন। তিনি (আহমদ ফাজেল খাঁ) ছিলেন এ অভিযানে নাদির শাহের সহকারী। লক্ষ প্রাণের তর্পন-গর্জন নিয়ে যুদ্ধের অবসান হলো। অভিযান শেষে নাদির শাহ্ ভারত ত্যাগ করে চলে গেলেও কিন্তু তিনি (সৈয়দ আহমদ ফাজেল খাঁ) আর ফিরে যাননি।[৪] কারণ

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আবহাওয়া তাঁকে দারুন ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাইতো তিনি মুঘল সম্রাটের অধীনে চাকুরী নিয়ে মুঘলের রাজধানী দিল্লীতেই থেকে যান।[৫]

সৈয়দ আহমদ ফাজেল খাঁর পুত্র তাহের খাঁ মারাঠা বিদ্রোহের সময় অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এখানকার উনাও জেলার অর্ন্তগত মোহনে তাঁর বাসস্থান ছিল। নবাব আসফাউদ্দৌলার রাজত্ব কালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাহের খাঁর পুত্রদের মধ্যে দুইজন- সৈয়দ আমীর আলীর পিতামহ সৈয়দ মনছুর আলী খান ও সৈয়দ আলী খান বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। এদের দুজনেই লক্ষ্মের নবাব দরবারে কাজ করতেন। বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য মনসুর আলী খাঁর খ্যাতি ছিল। জনৈক বিদ্রোহী রাজাকে দমন করতে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ আমীর আলীর পূর্বপুরুষেরা এতদিন নবাব দরবারেই কাজ করছিলেন। সৈয়দ আলী খানের পুত্র জাফর আলী খান সকলের আগে ইংরেজ সরকারের অধীনে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন উড়িস্যার সেটেলমেণ্ট বিভাগের কর্মকর্তা।

সৈয়দ আমীর আলীর পিতা সৈয়দ সা'দাত আলী, মনছুর আলী খানের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর (সৈয়দ মনছুর আলী খান) মামা হেকিম সিরাজ উদ্দিন খান লক্ষ্মৌর নবাব গাজী উদ্দীন হায়দারের দরবারে সভা-হেকিমের কাজ করতেন। তাঁরই (মামা) নিকট সৈয়দ সা'দাত আলী হেকিমী শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। মা আমেনা বেগমের মৃত্যুর পর সা'দাত আলী উড়িষ্যার কটকে জাফর আলী খাঁর (সা'দাত আলীর চাচাত ভাই) নিকট চলে যান। সেখানেই স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ বাংলার জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক ডঃ মোরাট ও মেলেটের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁদের সংস্পর্শে এসে তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন।[৬] এদের পরামর্শেই সৈয়দ সা'দাত আলী খাঁন চুচুড়াঁয় এসে হেকিমী ব্যবসা আরম্ভ করেন। কারণ তিনি ছিলেন ইউনানী চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং পাণ্ডিত্যের অনুরাগী। আরবি ও ফারসি ভাষায় ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান।

ইরানের মোশদ থেকে আগত এক শিয়া পরিবারের বংশধর সৈয়দ সা'দাত আলী খান সম্বলপুরের (মধ্যপ্রাচ্যের) সম্ভ্রান্ত জমিদার শামসুদ্দিনের কন্যাকে বিয়ে করেন। সৈয়দ সা'দাত আলী খাঁনের পাঁচ পুত্রের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন চতুর্থ।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

শৈশবকাল ঃ

সৈয়দ আমীর আলীর জন্মের অল্প কিছুকাল পরেই তাঁর পিতা বাসস্থান পরিবর্তন করে পরিবার-পরিজনসহ প্রথমে কলকাতায় আসেন এবং পরে চুচুঁড়ায় চলে যান। সেখানে তারা আশরাফ অভিযাতদের মতো সংযত আরামপ্রদ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর পরিবারের ঐতিহ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ সৈয়দ আমীর আলীকে তাঁর নিজস্ব পরিচিতি সর্ম্পকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। তিনি তাঁর শৈশাববাস্থায় নিজেকে পারিপাশ্বিকতা থেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর সমালোচনাও হয়েছিল।[৮]

তাঁর পিতা সৈয়দ সা'দাত আলী অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী পুরুষ ছিলেন। তাঁর সময় সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমাজ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাদের বিরাগ ছিল প্রবলতর। ফলে এই সময় অনেক মুসলমান পরিবার ইংরেজ সরকারের শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগাতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এসব কুসংস্কার সৈয়দ সা'দাত আলীকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। সৈয়দ সা'দাত আলী, যাঁর অনেক ইংরেজ বন্ধু ছিল, তিনি তাদের কাছ থেকে নতুন অনেক সুবিধাদি সাদরে গ্রহণ করেন। আর এইজন্য তাঁর পিতা এসব কুসংস্কার অতিক্রম করে শরিয়তী শিক্ষার পাশাপাশি পুত্রদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষারও উপযুক্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। সেকালের বাংলার জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালক ডঃ মোরাটের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। মূলত: তারই পরামর্শে তিনি পুত্রদেরকে ইংরেজী শিক্ষাদানে ব্রতী হয়েছিলেন। সেই সাথে তাঁর পরিবার একজন গৃহশিক্ষক নিয়োজিত করেন। যথারীতি তাঁর (মৌলভী সাহেব) তত্ত্বাবধানে বাড়ীতে আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল। সুতরাং সৈয়দ আমীর আলী শৈশব থেকেই প্রতিচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষারই পূর্ণ সুযোগ পান, যা তাঁর চরিত্র গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়।[৯] সে কালের মুসলিম অভিজাত পরিবারের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সৈয়দ আমীর আলী প্রাচ্য শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। ছাত্র হিসেবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের

Dhaka University Institutional Repository

পরিচয় দেন এবং অতি অল্প বয়সেই অনেকগুলো ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁর দখল ছিল বিস্ময়কর। সর্বোপরি; কুরআন, হাদিস, ফিক্‌হ এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর লেখনীতেই বিদ্যমান। তাঁর সময়ে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ইংরেজী জানা ভারতীয় রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ছোট বেলা থেকেই তার শিকারের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল।[১০]

সৈয়দ আমীর আলীর বয়স যখন সাত বছর তখন তাঁর পিতা সাহাদত বরণ করেন।[১১] তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না এইজন্য তাঁকে ছোটবেলা থেকেই অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। কারণ শৈশবকাল থেকেই তাঁর লেখাপড়ার প্রতি বিপুল আকর্ষণ ছিল। এছাড়াও তাঁর মেধাশক্তি ছিল দারুন প্রখর। তাই প্রত্যেক বছর তিনি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। ফলস্বরূপ তিনি ছাত্রজীবনে মুহসিন ফাণ্ডের সাহায্যও পেয়েছিলেন।[১২] কারণ তাঁর যোগ্যতা আর ভবিষ্যৎ উন্নতির নিশ্চিত সম্ভাবনা নওয়াব আব্দুল লতিফের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ফলে তিনি তাঁর জন্য "মহসিন ফাণ্ড" থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৩] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজ মুসলিম সমাজের শীর্ষে যারা অবস্থান করছেন, তাঁদের অনেকেই সাফল্যের শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছেন এই দানবীর হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের দানের বদৌলতে।[১৪]

সৈয়দ আমীর আলীর বড় তিন ভাই প্রথমে কলকাতা মাদ্রাসা ও পরবর্তী সময়ে হুগলি কলেজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তাঁরা সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি শীঘ্রই তাঁর ভাইদের শিক্ষাগত সাফল্য ও সুনামকে অতিক্রম করেন। হুগলি মাদ্রাসায় বৃটিশ শিক্ষকদের সহায়তায় এবং কতিপয় প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি লাভের কারণে তিনি পরীক্ষায় বিশিষ্ট ফলাফল অর্জন করেন ।[১৫] স্বনামধন্য বাংলা সহিত্যিক অক্ষয়কুমার সরকার ছিলেন তাঁর সহপাঠী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অক্ষয়কুমার সরকার প্রথম স্থান অধিকার করেন। আর সৈয়দ আমীর আলী প্রথম দ্বাদশ জনের মধ্যে একজন হয়ে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলীর সহোদর সৈয়দ ওয়ারেস আলী হুগলি জেলা স্কুলে পড়তেন। সৈয়দ আমির আলী ও উপযুক্ত বয়সে ভাইয়ের পাদঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি পরিশ্রমী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ তিনি (সৈয়দ ওয়ারেস আলী) দুই বৎসর কাল মাসিক ত্রিশ টাকা হিসেবে সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। কলেজের শিক্ষা শেষ করে তিনি হুগলি কলেজের এ্যাংলো পারসিয়ান বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর (সৈয়দ আমীর আলী) অসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে ডেপুটি কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত করেন। সৈয়দ আমীর আলীর উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর ভাই সৈয়দ ওয়ারেস আলীর অনেকটা অবদান রয়েছে।[১৭]

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, Morning shows the day. সৈয়দ আমীর আলীর জীবনে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এই কারণে পরবর্তী কালে তিনি বিদ্যাবুদ্ধির জন্য দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেন।

সৈয়দ আমীর আলীর জীবনে তিনজন ব্যক্তি গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরা হলেন তাঁর মা, হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ রবার্ট এবং সৈয়দ কেরামত আলী। সৈয়দ কেরামত আলী ছিলেন হুগলি ইমাম বাড়ির মোতাওয়াল্লী এবং মুসলিম এশিয়ার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত।

অপরদিকে তাঁর ইসলামী শিক্ষাও অবহেলিত হয়নি। ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর উপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁর মা, বিশেষকরে সাত বৎসর বয়সে তাঁর পিতার অকাল মৃত্যুর পর থেকে। পরবর্তীসময়ে তিনি গৃহের বাইরে অধিকতর উচ্চ পর্যায়ের আরবি ভাষা শিখেন। ইসলামী সমাজের উদ্ভব, অগ্রগতি ও প্রকৃতি সর্ম্পকে তাঁর আজীবন কৌতূহল গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছিলেন নিকটবর্তী হুগলি ইমামবাড়া। সৈয়দ আমীর আলী স্কুল ছাত্র থাকাকালেই এই ইমামবাড়ার মুতাওয়াল্লী মৌলভী সৈয়দ কেরামত আলী জৌনপুরী তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় ধর্মীয় পণ্ডিতদের সাথে সাপ্তাহিক আলোচনা সমূহে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর ফলস্বরূপ সতের বছর বয়স্ক সৈয়দ আমীর আলী গ্রিক, ইসলামী ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে জ্ঞানের আদান-

Dhaka University Institutional Repository

প্রদানের উপর লিখিত কেরামত আলীর উর্দু রচনাবলী ইংরেজীতে অনুবাদ করতে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিষয়টি তিনি তাঁর নিজস্ব ইতিহাস সর্ম্পকিত পুস্তকে প্রকাশ করেন (মাখাজ-ই-উলুম অথবা এট্রিটিজ অন দ্যা অরিজিন অব দি সাইন্সেস, অনুবাদ মৌলভী ওবায়েদ উল্ল্যাহ আল ওয়ায়েদী ও মৌলভী সৈয়দ আমীর আলী, কলকাতা ১৮৬৭ সাল)। বাংলায় তাঁর কর্মজীবন কালে তিনি হুগলি ইমামবাড়ার সাথে সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।[১৮]

শিক্ষা জীবন ঃ

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৬৩ সালে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি নিয়ে কৃতিত্বের সাথে হুগলি জেলা স্কুল মতান্তরে মহসিন কলেজ থেকে প্রবেশিকা (এনট্রান্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর তিনি হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন।[১৯] কারো কারো মতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬৭ সালে স্নাতক এবং ১৮৬৮ সালে ইতিহাসে সম্মান সহ এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু অধিকাংশ লেখকের মতে তিনি হুগলী কলেজ থেকেই ১৮৬৭ সালে বি. এ. পাশ করেন।[২০] অত:পর ১৮৬৮ মতান্তরে ১৮৬৯ সালে প্রথম মুসলিম ছাত্র হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনৈতিক অর্থবিদ্যা (Political Economics) ও ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই ডিগ্রী লাভ করেন। পরের বৎসর তিনি আইন পরীক্ষাতে ও উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ বি. এল. ডিগ্রি লাভ করেন। আইন পাস করে তিনি যথারীতি কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।[২১] স্বনামধন্য ড: ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র তাঁর সময় হুগলী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁরই ছাত্র ছিলেন।[২২] সৈয়দ আমীর আলীর লেখাপড়াকালীন সময়ে হুগলীর কালেক্টর মি. রোনাল্ডর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। রোনাল্ড প্রায়ই তাঁর বাসায় আসতেন। তাঁর নিকট হতে তিনি ইউরোপ সম্পর্কে বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। এই ইংরেজ প্রশাসক ইউরোপ সর্ম্পকে তাঁকে বিশেষ ভাবে আগ্রহী করে তুলেছিলেন।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

কিছুদিন পরেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের উপযুক্ত ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য কতকগুলো বৃত্তি দেওয়ার কথা ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন। সেই বৃত্তি যুক্ত প্রদেশে পেলেন স্যার সৈয়দ আহমদের পুত্র সৈয়দ মাহমুদ আর বাংলাদেশে দেওয়া হলো সৈয়দ আমীর আলীকে।[২৪] তাই অচিরেই ভারতবর্ষের বৃটিশ সরকারের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্য ১৮৭০ সালে মতান্তরে ১৮৬৯ সালে তিনি বিলেতে যান ব্যারিষ্টারী পড়তে। লণ্ডনে তাঁর প্রথম বসবাসের সময় (১৮৬৯ থেকে১৮৭৩) তিনি আইন ব্যবসায় যোগ দেন।[২৬] সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৩ সালে বিলেতের ইনার টেম্পলের "লিংকন্স ইন" বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে ব্যারিস্টারী পাস করেন।[২৭] ইতোমধ্যে বিলেতে তাঁর সাথে স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের পরিচয় হয়। তাঁর উপর সৈয়দ আহমেদ খানের প্রভাব যে কত গভীর ছিল পরবর্তী কালে আমরা তার পরিচয় পাই। বস্তুত, সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন সৈয়দ আহমেদ খানের একজন ভাবশিষ্য।[২৮] বিলেতে থাকাকালীন সময়ে তিনি ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞানার্জন করেন এবং "The Critical Exemination of the Life and Teaching of Muhammad" রচনা করে তা বিলেতেই প্রকাশ করেন। অত:পর তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।[২৯] ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তাঁর আগে খুব কম লোকেই ব্যরিষ্টারী পাশ করেন।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) তথ্য নির্দেশ ঃ

১. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী (১৮৫৭-১৯৪৭), পৃ.১৯৮

২. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৩৩৬

৩. সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃ.v

৪. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ-বি, এ. উন্নত জীবন গ্রন্থমালা-১ শিরোনাম- আমীর আলী, পৃ. ১৩

৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪৯

৬. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ-বি, এ. উন্নত জীবন গ্রন্থমালা-১ শিরোনাম- আমীর আলী, পৃ. ১৪

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪৯

৮. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দীকা, এবং এস. এম হুমায়ন কবির,- বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৭

৯. সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ v

১০. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনু : ডঃ রশীদুল আলম, এম. এ. পৃ. ১

১১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৯

১২. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ-বি, এ, উন্নত জীবন গ্রন্থমালা-১, শিরোনাম- আমীর আলী, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

১৩. অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব, পৃঃ ১৭

১৪. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ-বি, এ, উন্নত জীবন গ্রন্থমালা-১, শিরোনাম- আমীর আলী, পৃ. ১৯

১৫. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দীকা, এবং এস. এম হুমায়ন কবির,- বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৬

১৬. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ-বি, এ, উন্নত জীবন গ্রন্থমালা-১, শিরোনাম- আমীর আলী, পৃ. ১৮

১৭. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ-বি, এ, উন্নত জীবন গ্রন্থমালা-১, শিরোনাম- আমীর আলী, পৃ. ১৭

১৮. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দীকা, এবং এস. এম হুমায়ন কবির,- বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৬

১৯. সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ v

২০. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৩৩৬

২১. সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ iv

২২. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ-বি, এ, উন্নত জীবন গ্রন্থমালা-১, শিরোনাম- আমীর আলী, পৃ. ১৯

২৩. সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ iv

২৪. অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব, পৃঃ ১৮

২৫. সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ iv

Dhaka University Institutional Repository

২৬. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দীকা, এবং এস. এম হুমায়ন কবির,- বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৬

২৭. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুঃ ডঃ রশীদুল আলম পৃঃ ১

২৮. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ iv

২৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫০

৩০. মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ-বি, এ, উন্নত জীবন গ্রন্থমালা-১, শিরোনাম- আমীর আলী, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

(ক) সৈয়দ আমীর আলীর সংসার জীবন

(খ) সৈয়দ আমীর আলীর চাকুরী ও পদক লাভ

(গ) সৈয়দ আমীর আলীর অবসর/ বিলেতে প্রবাস জীবন

(ঘ) তথ্য নির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

(ক) সৈয়দ আমীর আলীর সংসার জীবন

(খ) সৈয়দ আমীর আলীর চাকুরী ও পদক লাভ

(গ) সৈয়দ আমীর আলীর অবসর/ বিলেতে প্রবাস জীবন

(ঘ) তথ্য নির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সৈয়দ আমীর আলীর সংসার জীবন ঃ

বৃটেনের সাথে সৈয়দ আমীর আলীর যোগাযোগ জোরদার হয়েছিল লণ্ডনে বারবার সফরের মাধ্যমে। লণ্ডনে তিনি ১৮৮৪ সালে একেশ্বরবাদী চার্চে ইসাবেল ইডা কনস্ট্যামকে বিয়ে করেন, যিনি তাঁর বাকী বিশ বছরের কর্মজীবনে তাঁর সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করেন।[১] তাঁর স্ত্রী ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ। তাঁর দাম্পত্য জীবন খুবই সুখকর ছিল। তিনি ছিলেন দুই সন্তানের জনক।[২] তাঁর দুই পুত্রই ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া করত। তাঁর পুত্ররাও তাঁরই মত প্রভুত সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩] জ্যেষ্ঠ পুত্র সায়্যিদ ওয়ারিস আমীর আলী C.I.E (জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৮৬ সালে) ১৯২৯ সালে Indian Civial Service হতে অবসর গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র স্যার তারিক আমীর আলী (জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৮১ সালে) ১৯৪৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। সায়্যিদ ওয়ারেস আমীর আলী ও সায়্যিদ তারিক আমীর আলী বিলেতেই বসবাস করেন। পারিবারিক কারণে ১৯০৪ সালে তিনি অবসর গ্রহণের পর বিলেতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪]

সৈয়দ আমীর আলীর চাকুরী ও পদক লাভ ঃ

দেশে প্রত্যাবর্তন করেই সৈয়দ আমীর আলী আইনকেই তাঁর পেশা হিসেবে গ্রহণ করে পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে যোগদান করেন।[৫] তাঁর পূর্বে কলকাতা হাইকোর্টে মাত্র তিনজন এই দেশীয় লোক ব্যারিস্টার রূপে যোগদান করেছিলেন। তিনিই ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম ব্যারিস্টার। মুসলিম আইন সর্ম্পকে গভীর জ্ঞান তাঁকে ব্যবসা ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।[৬] তিনি তাঁর এ কর্মবহুল জীবনে বহু দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আইনজ্ঞ হিসেবে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন।[৭] তবে তাঁর এ সুনাম শুধু আইন ব্যবসাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং একজন শিক্ষক এবং "মুসলমানদের ব্যক্তি জীবন সর্ম্পকিত আইন" বিষয়ের লেখক হিসেবেও তা সমভাবে প্রযোজ্য ছিল।[৮] আর সাথে সাথে একজন শিক্ষাব্রতী হিসেবেও

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, যার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৭৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্বাচিত হন এবং পরের বৎসর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৯] কারো মতে, পরের বৎসর তিনি মুসলিম ব্যবহার বিধির অধ্যাপকের পদ পেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তিনি পাঁচ বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১০] তিনি ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত বাংলা (বঙ্গীয়) ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।[১১] এই সময় থেকেই তিনি মুসলিম আঞ্জুমান ও সভা- সমিতির প্রতি অনুরোক্ত হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ঠ সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দেন। ১৮৭৬ সালে তিনি হুগলীর ইমামবাড়া কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন, যে পদে তিনি ১৯০৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আঠাশ বৎসর যাবত অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৩] ১৮৭৭ সালে তিনি মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "ন্যাশন্যাল মোহামেডান এসোসিয়েসন"। এটিকে তিনি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাখা সমূহের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীকালে সেন্ট্রাল শব্দটি যুক্ত হয়ে যার নতুন নামকরণ করা হয়েছিল "সেন্ট্রাল ন্যাশন্যাল মোহামেডান এসোসিয়েশন"। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন। তিনি এ সমিতির সম্পাদক হিসাবে ব্যাপকভাবে এই উপমহাদেশ পরিভ্রমন করেছিলেন। ফলে গঠিত হয়েছিল এসোসিয়েশনের ৫৩ টি শাখা। এ সমিতি প্রতিষ্ঠার আট বৎসর পরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টাতেই করাচিতে মুসলিম কলেজ স্থাপিত হয়।[১৪]

এসব সাংগঠনিক কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি নিজের পেশাতেও সৈয়দ আমীর আলীর সাফল্য অব্যাহত ছিল । ১৮৭৮ সালে ছোট লাট স্যার এস্‌লি ইডেনের সময় তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে তাঁকে স্থায়ী ভাবে (চীফ) প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু কোন পদাধিকারের প্রতিই তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী ও আত্ববিশ্বাসী। এছাড়াও তিনি ছিলেন উদারচেতা মনোভাবের অধিকারী। তাই তিনি চাকুরীর গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি। ফলে তিনি ১৮৮১ সালে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ঠিক আছে ত্যাগ করে পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। এই সময় হতেই তিনি

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন মুসলিম সামাজের নেতারূপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ১৮৭৭ সালে "বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল" এর সদস্য মনোনীত হন। তিনি ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত বড়লাট লর্ড রিপনের রাজকীয় ব্যবস্থাপক উপদেষ্টা পরিষদের (Imperial Legislative Council) সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।[১৫] এই পদে তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙ্গালী মুসলমান।[১৬] তিনি কাউন্সিলের একজন অসাধারণ বাগ্মী ও কর্মতৎপর সদস্য ছিলেন। পরিষদে তিনি সর্বদা স্বধর্মীদের স্বার্থে বক্তৃতা করতেন।

১৮৮৪ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইনের অধ্যাপক (Tagore Law Proffessor) নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা অবস্থায় আইনজ্ঞ হিসেবে পারদর্শিতা ও সমাজসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে ১৮৮৭ সালে সি. আই. ই. (স্যার) উপাধি লাভ করেছিলেন। যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্রের পর ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। তিনিই কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি (তাঁর পূর্বে সৈয়দ আহমেদের পুত্র সৈয়দ মাহমুদ ১৮৮২ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন)।[১৭] তিনি দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর যাবত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ৫৫ বছর বয়সে বিচারক হিসেবে তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও গভীর আইন জ্ঞানের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্যার সৈয়দ আমীর আলীর পুত্ররাও এ দেশের আইনজীবী হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং তাঁরাও বিভিন্ন আদালতে কৃতিত্বের সাথে বিচারপতির দায়িত্ব পালন করে গেছেন।[১৮]

সৈয়দ আমীর আলী সবরকমের সংকীর্ণতা ও সাম্প্রাদায়িকতার উর্ধেব ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে অন্যতম প্রস্তাবি ছিল "ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রাদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।" বেশ কিছু সংখ্যক হিন্দু ও খ্রিষ্টান নবাব আব্দুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ ও আমীর আলী পরিচালিত সংস্থা

Dhaka University Institutional Repository

গুলোর সদস্য ছিল। তথাপিও মুসলমানদের ভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯০৬ সালে ঢাকায় যখন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন সৈয়দ আমীর আলী লণ্ডন থেকেই তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি মুসলমানদের সতন্ত্র নির্বাচনের দাবীর সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। বিলেতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও তিনি অধ:পতিত ভারতীয় মুসলিমগণকে ভুলেননি।[১৯] এরপর ১৯০৮ সালে তিনি "মুসলিম লীগ" এর লন্ডন শাখা স্থাপন করেছিলেন। প্রথম হতেই তিনি এ শাখার সভাপতি ছিলেন।[২০] তিনি ১৯০৯ সালের ২৩ মে ইংল্যাণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতি মনোনীত হন। তাঁর আগে আর কোন ভারতীয় এই সম্মান লাভ করতে পারেননি। তিনি ১৯২৮ সালের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।[২১] তাঁর অবসর জীবনের প্রধান কীর্তি ১৯১১ সালে রেড ক্রিসেন্টসোসাইটি (Red Crecent Society) স্থাপন । ১৯২৮ সালে মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন।[২২] ১৯১২ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিলেতে অবস্থান করলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই উপমহাদেশের মুসলমানদের সেবা করে গেছেন।[২৩] তাঁর আইনজ্ঞান ও পাণ্ডিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ কেম্ব্রিজ, কলকাতা ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে এল.এল.ডি (L.L.D) , ডি.এল. (D.L.) ডি.লিট ডিগ্রী দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন।[২৪] তাঁর প্রতিভা সেবা ও যশস্বীয়তায় মুগ্ধ হয়ে বৃটিশ সরকার তাঁকে ১৮৬৪ সালে খান বাহাদুর, ১৮৭৫ সালে নবাব উপাধিতে ১৮৮৭ সালে সি আই সি (C. I. E) তে ভূষিত করেন।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলীর অবসর/ বিলেতে অবসর জীবন ঃ

সৈয়দ আমীর আলীর স্ত্রী ছিলেন একজন বৃটিশ রমণী। তাই ১৯০৪ সালে তাঁর অবসর গ্রহণের পর পারিবারিক কারণেই তিনি ইংল্যাণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[২৬] তাঁর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে (১৯২৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কদাচিৎই বাংলায় এসেছিলেন) সম্ভবত তাঁর স্ত্রীর প্রভাবই প্রতিফলিত হয়। কিন্ত তাঁর নিজেরও পশ্চিমা ধাঁচে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অতিবাহিত করা অধিকতর পছন্দনীয় ছিল।[২৭] কিন্তু লণ্ডনের কোলাহল তাঁর ভাল লাগত না, এই জন্যে তিনি লণ্ডন নগরীর কোলাহল থেকে বার্ক শায়ারের এক নিভৃত পল্লীতে ল্যাম্বডেন নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ একটি রমণীয় অট্টালিকা মনোনীত করেছিলেন-থিয়েল ও অলডার ম্যাসটনের ক্রমনিম্ন ঢালুর উপর যার অবস্থান এবং যার উত্তরে আফটন পর্বতমালা এবং উভয় পাশে বীনহাম ও হাদল পার্ক বিদ্যমান। অন্যদিকে ইঙ্গল ফিল্ড উদ্যান। "প্রাচীন" ভারতীয় পদ্ধতিতে জাফরি শিল্প দ্বারা পরিবেষ্টিত এই অট্টালিকার বারান্দার পাশ দিয়ে জম্বীর বৃক্ষ শোভিত সুরম্যরাজ পথ চলে গেছে, যার পাদদেশস্থ একটি ছোট্র হ্রদ তার চারপাশের শোভা বৃদ্ধি করেছিল। এই ল্যাম্বডেন অট্টালিকাটি সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর স্ত্রীর সংগৃহীত ভারতীয় ও আরব্য শিল্প ভাণ্ডার দ্বারা সুসজ্জিত। এই মনোরম পরিবেশে অবস্থান কালে তাঁর অধিকাংশ সময় জ্ঞান-চর্চায় অতিবাহিত হয়েছিল।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দীকা, এবং এস. এম হুমায়ন কবির,- বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৭

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫০

৩. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দীকা, এবং এস. এম হুমায়ন কবির,- বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৭

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫০

৫. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ iv

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৯

৭. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুঃ ডঃ রশীদুল আলম পৃঃ ১

৮. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দীকা, এবং এস. এম হুমায়ন কবির,- বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৭

৯. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ iv

১০. অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব, পৃঃ ১৮

১১. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনদ, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ iv

১২. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ ইতিহাস ও দর্শন, ঢাকা- পৃ. ৩৩৬

১৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৯

১৪. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ iv

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৯

১৬. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ iv

১৭. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুঃ ডঃ রশীদুল আলম পৃঃ ২

১৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৯

১৯. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ v

২০. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুঃ ডঃ রশীদুল আলম পৃঃ ৩

২১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫০

২২. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ ।

২৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫০

২৪. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুঃ ডঃ রশীদুল আলম পৃঃ ৩

২৫. ডঃ আব্দুর রহিম, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' পৃ, ১৫৬

২৬. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ ইতিহাস ও দর্শন, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭

২৭. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ v

২৮. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দীকা, এবং এস. এম হুমায়ন কবির,- বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৭

২৯. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনুঃ হাবিব আহসান, এম. এ পৃঃ v

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

(ক) সৈয়দ আমীর আলীর অবদান

(খ) মুসলমানদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা

(গ) হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান

(ঘ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন

(ঙ) সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন

(চ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ছ) গঠনতন্ত্র

(জ) কর্মসূচীঃ

(১) সমাজ

(২) শিক্ষা ও সাহিত্য

(৩) আইন

(৪) রাজনীতি

(৫) স্মারকপত্র

(৬) ডেপুটেশন ও রিপ্রেজেন্টেশন

(৭) সভা

(৮) পরিণতি

(ঝ) শাখা এসোসিয়েশন

(১) বগুড়া শাখা

(২) চট্টগ্রাম শাখা

(৩) খুলনা শাখা

Dhaka University Institutional Repository

(৪) হুগলী শাখা

(৫) জাহানাবাদ শাখা

(৬) মেদিনীপুর শাখা

(৭) রাজশাহী শাখা

(৮) রংপুর শাখা

(৯) বর্ধমান শাখা

(১০) ময়মনসিংহ শাখা

(১১) পাবনা শাখা ও

(১২) মালদহ শাখা

(ঞ) রাজনৈতিক কর্মসূচী

(ট) মুসলমানদের স্বাতন্ত্রবাদ

(ঠ) লণ্ডন মুসলিমলীগ

(ড) স্বতন্ত্র নির্বাচন

(ঢ) মুসলিম রেণেসাঁ

(ন) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

(ত) বিচারক্ষেত্রে

(থ) জীবনাবসান

(দ) তথ্য নির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলীর অবদান ঃ

সৈয়দ আমীর আলীর সমকালীন ব্যক্তিবর্গের যে কয়েক জন মুসলমান বিষেশ সাফল্য লাভ করেন, তাদের মধ্যে তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন।[১] মুসলমান সমাজের সর্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষা ও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সৈয়দ আমীর আলী আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।[২] সে জন্য কখনও সাংগঠনিক তৎপরতা কখনও তথ্যনির্ভর বুদ্ধিদীপ্ত লেখনী আবার কখনও রাজনীতিতেও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে তার সংগ্রামকে সফল করে তুলতে চেয়েছেন।[৩] সৈয়দ আমীর আলীর লণ্ডনে প্রথমবার বসবাসের সময় (১৮৬৯ থেকে ১৮৭৩) তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন।[৪] অর্থাৎ আইন ব্যবসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজ সেবার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। বিচারক রূপে কর্মজীবনের মধ্যেও তিনি সমাজসেবা ব্রত অব্যাহত রাখেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় মুসলমান সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা পরিবর্তত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ায়ে চলতে পারেনি। তারা দরিদ্র ও অনুন্নত অবস্থায় পতিত হয়। বৃটিশ সরকার তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতো। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ও জিহাদ আন্দোলনের জন্য তারা শাসকদের প্রতিহিংসা চক্রে নিষ্পিষ্ট হয়। এতে মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন এবং কোন কোন মুসলমান চরম পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮৭১ সালে একজন অভিযুক্ত মুসলমান প্রধান বিচারপতি জন. পি. নরম্যান কে বিচারালয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। পরের বৎসর শের আলী নামক দীপান্তর দণ্ডপ্রাপ্ত একজন রাজবন্দী বড়লাট লর্ড মেয়োকে আন্দামানে হত্যা করে।[৫] এভাবে সিপাহী বিদ্রোহের পর ওয়াহাবী আন্দোলন এবং কয়েকটি হিংসাত্মক হত্যাকাণ্ডের ফলে বৃটিশ সরকারের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরীভূত হওয়ার কথা নয়। তিনি ঠিক তোষণনীতি নয়, আপোষমূলক নীতির দ্বারা কার্য উদ্ধারের পক্ষপাতি ছিলেন।[৬]

সৈয়দ আমীর আলীর কর্মকাণ্ড ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যাবলী নিয়ে ভারত সচিবের সাথে আলোচনা থেকে শুরু করে বৃটিশ নারীদের সম্পত্তিতে ও নাগরিক অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

আদায়ের জন্য সদ্য শুরু হওয়া ভোটাধিকার আন্দোলনের পক্ষে প্রচার অভিযান চালানো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এছাড়া বিচারকের ভূমিকায় তিনি কতিপয় সামাজিক বিষয়ের উপর বিশেষ করে বহুবিবাহ, সে সম্পর্কে তিনি তাঁর পূর্বেকার Critical Examination গ্রন্থে সমালোচনা করেছেন এবং মুসলমানদের মতামতকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যাবলীর উপর তিনি উন্মুক্ত বক্তৃতাও দেন।[৭] আর এ ক্ষেত্রে তাঁর সংগ্রামের চূড়ান্ত সফলতা তিনি দেখে না গেলেও সংগ্রামী চেতনার যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন তা বিশ্বব্যাপীই মুসলমান সমাজকে যুগযুগ ধরে আন্দোলিত করে চলেছে।[৮] নিম্নে তাঁর প্রচেষ্টাগুলো তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হল:-

মুসলমানদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দিতে মুসলমানদের মহা সংকটের সময় তাদের পথ নির্দেশের জন্য কয়েকজন নেতার আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে নওয়াব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আহমেদের নাম বিশেষভাবে সুপরিচিত। এই দুইজন খ্যাতনামা নেতা দুর্দিনে মুসলমানদেরকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। মুসলমানদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁরা দ্বিবিধ কর্মপন্থা অবলম্বন করেন প্যারা

প্রথমত: ভারতবর্ষে মুসলমানদেরকে বৃটিশ শাসনের অনুগত করা এবং

দ্বিতীয়ত: প্যারা তাদের (মুসলমানদের) জন্য ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

নওয়াব আব্দুল লতিফ বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য রাজভক্তি ও ইংরেজী শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং সৈয়দ আহমেদ খান উত্তর ভারতে তা প্রচলন করেন। নানারকম ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা বৃটিশ শাসক ও মুসলমানদের মধ্যে আপোষমূলক মনোভাব সৃষ্টি করতে ও মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সৈয়দ আহমদের খ্যাতি সৈয়দ আমীর আলী এবং এমনকি নওয়াব আব্দুল লতিফের খ্যাতিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের রাজনীতি ও পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আলীর দান তাঁর সমসাময়িক দুই বয়োজ্যেষ্ঠ নেতার কৃতিত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

কার্য অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুসলমান নেতাদের মধ্যে তিনি (সৈয়দ আমীর আলী) সর্বপ্রথম মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং ১৮৭৭ সালে তিনি মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই তিনি তখনকার বিতর্ক সমূহে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলায় অন্যান্য মুসলমানগণ ইত:পূর্বেই তাদের নিজ সম্প্রদায়ের সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মতামত সংগঠিত করতে শুরু করেন। তবে সৈয়দ আমীর আলী এ বিষয়ের সবচেয়ে বড় সমর্থক নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-৯৩), যিনি রক্ষণশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিসহ অধিকতর মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ১৮৭৭ সালে মুসলমানদের জন্য প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই সময় বয়োজ্যৈষ্ঠ মুসলমান নেতাগণ রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তায় বিশ্বাস করতেন এবং মনে করতেন যে, ইংরেজী শিক্ষার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলেই মুসলমানদের ভাগ্যের নিশ্চিত উন্নতি হবে। তিনিও মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্রুত উন্নতি সাধন তাঁরও জীবনের ব্রত ছিল। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শিক্ষা বিস্তারের কাজে অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারবে।[৯]

হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। সৈয়দ আমীর আলী লক্ষ্য করেন যে, হিন্দুদের রাজনৈতিক জাতীয়াতাবাদ ধর্ম ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচলন করেন। অনেক হিন্দু কবি রাজপুত, মারাঠা ও শিখদের কৃতিত্বের বিষয় নিয়ে দেশপ্রেমের কবিতা ও জাতীয় সংঙ্গীত রচনা করেন। বাংলাদেশেই প্রথম রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় এবং এর কয়েকটি কারণ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় ও প্রসার লাভ করে। এইজন্য এ প্রদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব অনুভূত হয়।

দ্বিতীয়তঃ তখন হিন্দু ধর্ম পুনর্জাগরণের যে আন্দোলন চলছিল তা হিন্দুদের রাজনৈতিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করে ।

তৃতীয়তঃ বাংলা সাহিত্য সাময়িকী ও সংবাদপত্র বিশেষতঃ হিন্দু প্রেট্রিয়ট ও অমৃতবাজার পত্রিকা জাতীয়তাবাদের বাণী প্রচার করে।

চতুর্থতঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যাণার্জী প্রমুখ নেতারা শিক্ষিত যুবকদেরকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই সময় হিন্দুদের মধ্যে কয়েকটি সমিতি গঠিত হয়। ১৮৩৭ সালে জমিদারদের সমিতি (Landholders Society) ও ১৮৪৩ সালে বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়। বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ১৮৫১ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সাথে মিলে এক হয়ে যায়। ১৮৭৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যাণার্জীর উদ্দ্যোগে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সাথে ইণ্ডিয়ান লীগ এক হয়ে যায়। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এক রাজনৈতিক পতাকা তলে সন্নিবেশিত করে দেশের স্বার্থের জন্য শক্তিশালী জনমত গঠন করা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সমিতির উদ্দেশ্য ছিল।[১০] বাংলার নেতাদের রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা অন্যান্য প্রদেশের লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। এই জন্য গোখলে বলেছিলেন, " বাংলাদেশ আজ যা ভাবে সারা ভারতে পরের দিন তা ভাবে।"

সৈয়দ আমীর আলী বুঝতে পারেন যে, হিন্দু নেতাদের অনুসৃত জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে এবং এর ফলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কলকাতা ছিল জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থল। তিনি জাতীয়তাবাদের নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি দেখেন যে, অতি শিক্ষিত হিন্দুগণও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন এবং চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দুদের এক চেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষিত হিন্দুগণ মুসলমানদেরকে কোন পেশায় ঢুকতে দিতে অনিচ্ছুক।[১১]

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ঃ

হিন্দুদের মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠে এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তনের আভাস দেখা দেয় তখন মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়তার দরুন তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারেনি। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সৈয়দ আমীর আলী তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করেন। এটা তাঁর উক্তি থেকে ব্যক্ত হয়। এই কথা স্মরণ রেখে এবং হিন্দুদের রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করে তিনি তাঁর স্মৃতি কথায় (মেময়ার্স) লিখেছেন," আমি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিপত্তি দেখতে পাই। এই জন্য আমি ১৮৭৭ সালে ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করি।[১২]

(Perceiving the complete lack of political training among the Moslem inhabitants of India, the immense advantage and preponderance the Hindu organisations gave to their community, I had founded in 1877 the National Mahommedan Association).[১৩]

তখনকার মুসলমান নেতাদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার উল্লেখ করে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, " বিলেতে ও ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদের সাথে ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যা ও তাদের ভবিষ্যৎ সর্ম্পকে আমার সময় আলোচনা করার সুযোগ হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজী শিক্ষা পেলে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হবে। আমিও ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করি, কিন্তু তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যবস্থা হচ্ছে মুসলমাদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সেরূপ না হলে তারা হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবল স্রোতে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। তিনি আমার সাথে একমত হতে পারেননি। কিন্তু আমি মনে করি যে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তাঁর চোখ খুলেছে। ১৮৭৭ সালে যখন আমি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহমেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করি, তখন আমি তাঁর সমর্থনের জন্য আবেদন করে। কিন্তু তিনি সমর্থন দিতে অস্বীকার করেন"।[১৪] যেহেতু মুসলমানদের উপর বৃটিশ সরকারের সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল, সেহেতু সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আব্দুল লতিফ বৃটিশ বিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তো দূরের কথা, কোন রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের সাথে জড়িত হতে চাননি। স্যার সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আব্দুল লতিফ বিশ্বাস করতেন যে, সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়ন ব্যাহত হবে। এ জন্য তাঁরা রাজনীতি এড়িয়ে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই জাতীয় নবজাগরণ চেয়েছিলেন। এর অবশ্য কারণও ছিল। হয়ত সরকারী কর্মচারী হওয়ার জন্য তাঁরা রাজনীতির সংস্পর্শে আসতে দ্বিধাবোধ করতেন। অথচ সেখানে তিনি (সৈয়দ আমীর আলী) এরূপ রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা পছন্দ করতেন না। ইংরেজী শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে যদি রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে তোলা যায়, তবে ফল দ্রুত ফলবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি এসোসিয়েশনকে এই উদ্দেশ্যেই গড়ে তুলেছিলেন। সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আব্দুল লতিফের চিন্তাধারার সাথে তাঁর (সৈয়দ আমীর আলী) চিন্তা ধারার এখানেই পার্থক্য।[১৫] সৈয়দ আমীর আলীর মতে, 'মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্যকলাপ শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ রেখে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক শিক্ষা হতে দূরে রেখে ভবিষ্যতে যে তাদের বিপদ হতে পারে স্যার সৈয়দ আহমেদ পরে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সেই জন্য তাঁর (সৈয়দ আহমেদ) মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল এবং তিনি মুসলিম প্রতিরক্ষা সংসদ (Moslem Defence Association) স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তখন যা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, তা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।'[১৬] নওয়াব আব্দুল লতিফও সৈয়দ আমীর আলীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন করেননি; তিনি এমনকি সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর সহকর্মীদের কার্যকলাপের সমালোচনা করেন। [১৭]

সে যুগের মুসলমানদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে ১৮৮৩ সালে ডব্লিও.এস. ব্লান্ট (W.S.Blant) এর মন্তব্য, " বিলেতে আমরা সব সময় এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সন্ত্রস্ত থাকি যে , ভারতে যে কোন সময় মুসলমানদের বিদ্রোহ হতে পারে এবং আমরা বিশজন হিন্দুর উক্তি অপেক্ষা একজন মুসলমানের উক্তিকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কিন্তু যদি তারা তাদের ক্ষতির জন্য ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে ইংরেজ জনগণ ও তাদেরকে বর্তমান অবস্থায় রেখে দিবে।"

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন ঃ

১৮৬৩ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফের "মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি" স্থাপনের পনের বৎসর পরে সৈয়দ আমীর আলী ন্যায় সঙ্গত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয় মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন (National Mohammedan Association)"। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজী ১২ মে ১৮৭৭ সালে। এটা মুখ্যত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তবে সমাজ ও শিক্ষা এর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৮]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ ছিল এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ১৮৮৩ সালে এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সর্ম্পকে সৈয়দ আমীর আলী বলেন,- "The Association has been formed with the object of promoting, by all legitimate and constitutional means, the well-being of the Mussulmans of India. It is founded essentially upon the principle of strict and loyal adherence to the British Crown. Deriving its inspirations from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmany with western culture and the

Dhaka University Institutional Repository

progressive tendencies of the age. It aims of the political regeneration of the Indian Mahomedans by a moral revival and by constant endeavours to obtain from Government a recognition of their just and reasonable Claims" [১৯] অর্থ্যাৎ "আইনগতভাবে ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে এই সমিতিটি গঠিত হয়েছে। এটা বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করে চলবে। এটা মুসলমানদের অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য হতে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবে এবং তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল মতবাদ প্রচলন করতে চেষ্টা করবে। এটা ভারতীয় মুসলমানদের নৈতিক জীবন সুসংহত করে তাদের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের পথ সুগম করবে। এটা ভারতের বিশেষ করে মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আর্কষণ করবে।" [২০]

মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং তাদের দাবী-দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করেন।[২১] কারণ সেই সময় মুসলমানদের অবস্থার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরার মতো প্রতিনিধিত্বমূলক কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। সেই সময়ে অর্থ্যাৎ ১৮৬৩ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফ "কলকাতা মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি (Calcutta Mahomedan Literary Society) এবং ১৮৬৪ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ "গাজীপুর ট্রানশ্লেসন সোসাইটি (Gazipur Translation Society)" প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান গুলো যদিও যুগোপযোগী প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় সাধনের প্রয়াসী ছিল,তথাপি এই দুইটি প্রতিষ্ঠান মুসলমানদের জন্য পুরোপুরিভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।[২২] মোট কথা মুসলমানদের অবস্থার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরার মতো প্রতিনিধিত্ব মূলক কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। এজন্য রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের স্বার্থ ঠিক মতো প্রতিফলিত হতো না। আর

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। তাই স্বসমাজের এই শূন্যতা ও অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যারিস্টার সৈয়দ আমীর আলী কলকাতায় "ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন "(National Mahomedan Association)" নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁর এই প্রতিষ্ঠানটি উপরোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্নধর্মী। ঐ সময় তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। এই এসোসিয়েশনের দায়িত্বভার তিনি নিজ কাধেই তুলে নেন। পাটনার নওয়াব আমীর আলী সভাপতি ও সৈয়দ আমীর হোসেন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৮৩ সালে যখন এর শাখা-এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়; তখন প্রতিষ্ঠানটির নামের আগে 'সেন্ট্রাল' শব্দটি যুক্ত হয়। সে সময় এটার নতুন নামকরণ হয়েছিল "সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন"। (Central National Mahomedan Association) ". [২৩]

গঠন তন্ত্র ঃ

ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই একটি সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক প্রতিবেদনে গঠনতন্ত্রের বিধিবিধান লিপিবদ্ধ হয়। ২০টি মুখ্য ধারা ও ১৮টি উপধারার সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা নিম্নরূপ ঃ

মুখ্যধারা ঃ ১. এসোসিয়েশনের একজন সভাপতি, তিন জন সহ-সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন যুগ্ম-সম্পাদক ও দুই জন সহকারী সম্পাদক থাকবেন। (১)

২. ২৪ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহক কমিটির উপর এসোসিয়েশনের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকবে; কমপক্ষে ৫ জনের উপস্থিতিতে সভার 'কোরাম' হবে। (৬)

৩.কার্যনির্বাহ কমিটি একজন অমুসলমানকে স্বাভাবিক নিয়মেই সাধারণ সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন। কেবল নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ জড়িত প্রশ্ন ছাড়া তিনি অন্যত্র সাধারণ সদস্যর মতো ভোট দানের অধিকার পাবেন। (৮)

Dhaka University Institutional Repository

৪. সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশনের সকল আদান-প্রদান ইংরেজীর মাধ্যমে করবেন। (১৭)

৫. যুগ্মঃ সম্পাদক মাতৃভাষায় ঐরূপ আদান প্রদান করবেন। (১৮)

৬. সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় ধারা বিবরণী ও হিসাবপত্র দাখিল করবেন। প্রত্যেক জুলাই মাসে এরূপ সভা হবে। সভা কার্যনির্বাহক কমিটির ঐ ধারাবিবরণী ও হিসেবপত্র বৈধ বিবেচনায় অনুমোদন করবেন।

উপধারাঃ ১. বিশেষভাবে মুসলমানদের ও সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মঙ্গলের জন্য কার্যনির্বাহক কমিটি যে-কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সহযোগিতা করতে পারবেন। (৭)

২. মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কার্যনির্বাহক কমিটি মাঝে মাঝে বক্তৃতার আয়োজন করবেন, এতোদ্দশ্যে সময় ও স্থান তারা স্থির করবেন। (৮)

৩. শাখা-এসোসিয়েশনের সভাপতিগণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের অনারেরী সহ-সভাপতি হিসাবে গণ্য হবেন এবং কলকাতায় অবস্থানকালে তারা কার্য নির্বাহক কমিটির অথবা এসোসিয়েশনের সাধারণ অথবা বিশেষ যে-কোন সভায় ভোট দিতে পারবেন।(৭)

৪. শাখা-এসোসিয়েশনগুলো স্থানীয় বিষয় ও নিজস্ব অর্থ-সমস্যা স্বাধীন ভাবেই পরিচালনা করবেন। তবে মুসলমান জনসাধারণের প্রশ্নের ক্ষেত্রে এবং সরকারের জাতীয় স্বার্থে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁদের ভাবধারার আদান-প্রদান করতে হবে এবং ঐ প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের মাধ্যমে করতে হবে। (১১)

৫. শাখা-এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হবেন।[২৪] (১৫)

কলকাতা "সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" দুইশত জন সদস্য নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করে। আর পাঁচ-ছয় বৎসরের মাথায় তা সাতশত জনে গিয়ে দাঁড়ায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে যে সদস্য তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, বাংলা, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী এর সদস্যভুক্ত হয়। লণ্ডন ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদিকা শ্রীমতি ম্যানিং এর আজীবন-সদস্যা ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে বাংলায় বগুড়া, চট্রগ্রাম, হুগলি, জাহানাবাদ এবং বাংলার বাইরে ভাগলপুর, পাটনা, গয়ামতিহারি প্রভৃতি স্থানে শাখা খোলা হয়। তাছাড়া 'মীরাট সমিতি' 'লক্ষ্মৌ রিফর্ম এসোসিয়েশন' 'বোম্বে আঞ্জুমানে ইসলাম' কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের আদর্শে ও অনুকরণে স্থাপিত হয়। এ গুলোর সাথে কেন্দ্রের সম্পর্ক ছিল।[২৫] ১৮৮৩-৮৪ সালে এসোসিয়শনের 'কার্যনিবাহক কমিটি'র গঠনটি ছিল নিম্ন রূপ ঃ

সভাপতি- প্রিন্স মোহাম্মদ ফাররুক শাহ্ (মহীশূর পরিবার)

সহ-সভাপতি নবাব মীর মোহাম্মদ আলী, জমিদার (পদমদী, ফরিদপুর) সৈয়দ আমীর হোসেন, খান বাহাদুর (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট) ও হাজী নূর মোহাম্মদ।

সম্পাদক- সৈয়দ আমীর আলী, এম. এ।

যুগ্ম- সম্পাদক-করিরুদ্দীন আহমেদ, খান বাহাদুর।

সহকারী সম্পাদক- সিরাজুল ইসলাম বি. এ. বি. এল ও বদরুদ্দীন হায়দার।

সদস্য- মো ঃ ইউসুফ বি.এ, দীন মোহাম্মদ, গোলাম সরয়ার (অনুবাদক, কলকাতা হাইকোর্ট), সৈয়দ মোজাফর হোসেন (সায়েস্তাবাদ বরিশাল), মির্জা মোহাম্মদ খলিল সিরাজী, আগা শেখ মোহাম্মদ জিলানী, জহিরুদ্দীন আহমেদ (ডাক্তার), হাজী আব্দুল্লাহ দগমান, শাহ মীর লতফত হোসেন (মোক্তার কলকাতা হাইকোর্ট), শালিগ্রাম সিংহ, কে,এম চট্টোপাধ্যায়, হাকিম মোহাম্মদ সাজ্জাদ , আব্দুস সালাম এম, এ, আব্দুল হাসান খান, আশরাফ উদ্দীন আহমদ (মোতাওয়াল্লী, হুগলী ইমাম বাড়া), আবুল খায়ের এম, এ (অধ্যাপক কলকাতা মাদ্রাসা), ।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচী ঃ

প্রথম পাঁচ বৎসরের কর্মসূচীকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য, আইন ও রাজনীতি। নিম্নে এগুলোর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:-

(১) সমাজ ঃ এসোসিয়েশন শহরের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে, কিন্তু অর্থাভাবে অল্পকালের মধ্যে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। শহরের মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নভাব দূর করার জন্য সামাজিক মিলন উৎসবের আয়োজন করে। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানরা অযথা অর্থ ব্যয় করে। এসোসিয়েশন এ ব্যয় সংকোচের অভিযান চালায় এবং শাখা এসোসিয়েশনকে অনুরূপ কাজে উৎসাহিত করে। উপরিউক্ত বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আব্দুস সালাম বি.এ. ঐরূপ প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণ পদক পান।[২৭]

(২) শিক্ষা ও সাহিত্য ঃ স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্যের উন্নতির জন্য এসোসিয়েশন প্রচার চালায়। ১৮৮০ সাল থেকে পদক ও অন্যান্য পুরস্কার দান করে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে আসছে। ফারসি কাব্যের উপর প্রবন্ধ লিখে আব্দুল ওয়ালি অপর একটি স্বর্ণ পদক পান। ১৮৮২ সালের ১৭ জানুয়ারী তারিখে পুরস্কার বিতরণী সভায় লর্ড রিপন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতির সম্মান স্বরূপ ঐ বৎসর থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য চারটি 'রিপন স্কলারশিপ' দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ছাত্রদের সাহায্য দানের জন্য ১৫,০০০ টাকার একটি তহবিল গঠনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। নবাব খাজা আহসানুল্লাহ (জীবন সদস্য) ৩,০০০ টাকা প্রিন্স মোহাম্মদ ফারুক শাহ (সভাপতি) ১,০০০ টাকা, হাজি নূর মোহাম্মদ (সহ-সভাপতি) ১,০০০ টাকা চাঁদা দিতে সম্মত হন। পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ঐ বৃত্তি দেওয়া হয়।[২৮] কলকাতা মাদ্রাসাকে কলেজ স্তরে উন্নীত করার জন্য এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই চেষ্টা করে আসছে। ১৮৮৪ সালে

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৭৪ সালের জুলাই মাসে মাদ্রাসার লিটারেরী ক্লাব এ বিষয়ে এসোসিয়েশনের দৃষ্টি আর্কষণ করে। রক্ষণশীলরা বাধা দেওয়ায় নারী শিক্ষার বিষয়টি প্রায় অচল অবস্থায় ছিল । এসোসিয়েশন একটি 'স্ট্যাণ্ডিং' কমিটি গঠন করে এবং প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এর একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করে।[২৯]

(৩) আইন ঃ এসোসিয়েশন ১৮৭৭সালের ১০ ধারা আইনের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী "কাজী বিল" সম্পর্কেও এসোসিয়েশন অভিমত জ্ঞাপন করে। মুসলমানদের একটি পুরাতন ও প্রয়োজনীয় এজেন্সির স্বপক্ষে উক্ত বিলটি আইনে পরিণত হয়। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন খসড়া বিলের প্রতিও এসোসিয়েশনের দৃষ্টি পড়ে। বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামুলক হবে না পূর্বের মতো ঐচ্ছিক থাকবে এ নিয়ে মতভেদ ছিল। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের এই বির্তকে এসোসিয়েশন একটি মধ্যপন্থার পরামর্শ দেয়। অ-রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহে কতকগুলো প্রতিবন্ধক সূচক শর্ত আরোপের কথা বলা হয়। সরকার শেষ পর্যন্ত বিবাহ-রেজিস্ট্রেশন বিলটি নাকচ করে দেন।[৩০]

(৪) রাজনীতি ঃ এসোসিয়েশন বড় লাট লর্ড রিপনকে সংবর্ধনা ও ছোট লাট লর্ড স্যার এ্যাসলি ইডেনকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। ১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবর্ধনা কালে লর্ড রিপনকে এসোসিয়েশন ২৮টি পরিচ্ছেদের একটি দীর্ঘ 'স্মারকলিপি' প্রদান করে।[৩১] এটি মুসলমান সম্প্রদায় সর্ম্পকে পরবর্তীকালে সরকারের গৃহীত নীতিসমূহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

(৫) স্মারকপত্র ঃ বস্তুত এসোসিয়েশনের সম্পাদক স্যার সৈয়দ আমীর আলীর সুচিন্তিত অনুধ্যানের ফল ১৮৮২ সালের এই 'স্মারকপত্র'। তিনি স্বয়ং রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন বলে যুগের স্পন্দনটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সাহিত্য, সভা-সমিতি, ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, পত্র-পত্রিকা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির সহায়তায় যে জাতিয়তাবাদ ও পুনর্জাগরনের জোয়ার এসেছে তিনি তাঁর অন্তর্লীন মর্মসুর উপলব্ধি করেছিলেন। স্বসমাজের মৃতপ্রায় অবস্থার প্রেক্ষাপটও তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

(সৈয়দ আমীর আলী) জানা ছিল। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠির বর্তমান নমনীয় ও সহানুভূতিপূর্ণ নীতি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সমাজ-স্বার্থে হাল ও পাল কিভাবে নিয়ন্ত্রন করা যায়, তারই পূর্ণ রূপ এই স্মারকপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, শিক্ষার পশ্চাদবর্তিতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার একটি ইতিহাসভিত্তিক তথ্যপূর্ণ পটভূমি রচনা করে প্রতিবন্ধকস্বরূপ এগুলোর অবসান কামনা করেছেন এবং তৎসঙ্গে সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র দাবী উত্থাপন করেছেন। একজন উদ্দীপ্ত বুদ্ধিজীবী হিসেবে সে আইনানুগ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়নের আদর্শে এসোসিয়েশনের লক্ষ্য নিরূপিত করেছিলেন এই স্মারকপত্রে অনেক কিছুর সীমাবদ্ধতার মধ্যে সে ভাবটি স্পন্দিত হয়েছে। মুসলমান ব্রিটিশ সরকারের অনুগত কিন্তু বর্তমান দুর্গতির জন্য তাদের ক্ষোভ আছে, ইংরেজ শাসকদের গৃহীত নীতির জন্য মুসলমানদের দুরবস্থা, সুতরাং তাদের অবস্থার উন্নতি শাসকশ্রেণীর সহানুভূতির দ্বারাই সম্ভব-স্মারকপত্রের এটাই মূল সুর। তিনি প্রধানত শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সুযোগ-সুবিধা চেয়েছেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষার সমার্থক ছিলেন। দারিদ্রহেতু ব্যয়বহুল ইংরেজী স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য একাধারে মাদ্রাসাগুলোতে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, মুসলমান অঞ্চলে মুসলমান শিক্ষক ও ইনস্পেক্টর নিয়োগ করার কথা বলেন, অন্যধারে মহসিন ফাণ্ডের ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির টাকা কেবলমাত্র মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে-এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করেন। শিক্ষা-বিভাগ, বিচার-বিভাগ, প্রশাসন-বিভাগ, পররাষ্ট্র-বিভাগ সর্বত্র মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম। মুসলমান যোগ্যপ্রার্থী থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তার বঞ্চনার জন্য চাকরি পাচ্ছে না, এ অভিযোগ স্মারকপত্রে করা হয়। কেউ চাকরি পেলেও অনেক সময় তাকে উৎখানের ষড়যন্ত্র করা হয়। কলকাতা ও মফস্বলে সরকারি উচ্চ চাকরিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টানের সংখ্যা কিরূপ ছিল তার একটা তালিকা দিয়ে বলা হয়েছে, মুসলমান না জনসংখ্যার অনুপাতে না শিক্ষার অনুপাতে ঐসব চাকরিতে স্থান পেয়েছে। ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানরা পশ্চাদপদ, সুতরাং প্রতিযোগিতায় তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। এ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের জন্য চাকরিতে নিয়োগ পদ্ধতির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না হলে অধিক পরিমান চাকরি পাওয়া সম্ভব হবে না। দেশের খয়রাতি সম্পত্তিগুলোর সুষ্ঠু তদারকির ব্যবস্থা করে সেগুলোর অর্থ শিক্ষা খাতে নিয়োজিত করার জন্য একটি এবং মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে চাকরি ক্ষেত্রে নিয়োগের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অপর একটি কমিশন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ ঐ স্মারকপত্রে করা হয়েছে। স্মারকপত্রে বিহারে নাগরির পরিবর্তে আরবি লিপি রাখা এবং আদালতের ভাষারূপে উর্দু চালু রাখার পক্ষে ওকালতি করা হয়েছে। মুসলমানদের দুরবস্থা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিজনক নয়, ব্রিটিশ সম্রাজ্যের স্বার্থেরও পরিপন্থী হবে বলে উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের এই স্মারকপত্র ব্যর্থ হয়নি, ভারত সরকার এর নকল প্রাদেশিক সরকার ও শিক্ষা-বিভাগ, সভা-সমিতি ও হান্টার কমিশনের কাছে পাঠান। এদের মতামতের ভিত্তিতে এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশে ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই বড়লাট লর্ড ডাফরিনের এক শিক্ষা প্রস্তাবে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

(৬) ডেপুটেশন ও রিপ্রেজেন্টেশন ঃ কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন অধিকাংশ ডেপুটেশন দিয়েছে বড় লাট ও ছোট লাটের কাছে তাঁদের আগমন ও বিদায় কালীন সংবর্ধনার সময়। ১৮৮৭ সালের ১২ নভেম্বর করাচিতে এসাসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল লর্ড ডাফরিণের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মুসলমানদের অনুন্নত অবস্থার কথা ব্যক্ত করে। ১৮৮৮ সালের ২৪ মার্চ কলকাতায় রাজভবনে অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনায় তিনি স্বীকার করেন যে, ঐতিহাসিক কারণে মুসলমানদের অসন্তোষজনক অবস্থায় পড়তে হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন যে, তাদের দুরবস্থা দূর করার সংগ্রামে তারা সরকারের সহানুভূতি ও সমর্থন পাবেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন সৈয়দ আমীর আলী।[৩৪] ১৮৮৮ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখে নব-নিযুক্ত বড়লাট ল্যান্সডোনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১২০ জনের এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এসোসিয়েসনের সভাপতি প্রিন্স ফাররুখ শাহ। তিনি এক মানপত্রে ভারতীয় মুসলমানরা অন্য সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেসব

Dhaka University Institutional Repository

অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তার চিত্র তুলে ধরেন । বড়লাট প্রত্যুত্তরে জানান যে, মুসলমানরা সংখ্যানুপাতে সম্পদের ভাগ পাচ্ছে না; তিনি বলেন যে, সংঘশক্তির অভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে না পারার দরুন তারা সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[৩৫]

(৭) সভা ঃ কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের ১৮৮৩-৮৪ সালের বার্ষিক বিবরণীতে সদস্য সংখ্যা ছিল সাতশত । আগের বৎসর ছয়শত ছিল। ১৮৮৩ সালের ৩৬০ জন সদস্যের এই তালিকায় মুসলমান ছাড়া হিন্দু, খ্রিস্টান, ফার্সী (মোট ২৯) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আছেন। বিত্ত ও বিদ্যার দিক থেকে শ্রেণী বিন্যাস করলে দেখা যায় যে, এতে প্রধানত নবাব,রাজা, জমিদার শ্রেণীর সামন্তপতি আছেন এবং সরকারী কর্মচারী , আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আছেন। পেশার দিক থেকে এরূপ একটি তালিকা নির্ণয় করা যায়।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত শ্রেণী	সরকারী কর্মচারী	স্বাধীন পেশাজীবী	অন্যান্য	পেশা অজ্ঞাত
জমিদার ২৫ নবাব ৯ প্রিন্স ৯ রাজা ১	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ১৯ অনুবাদক কেরানী ১৯ সাব-রেজিস্ট্রার ১০ পুলিশ কর্মচারী ৮ মুন্সেফ-জজ-সাব-জজ ১২ ডেপুটি কালেক্টর ৪ পেশকার ২ ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ২ ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর ১	উকিল ১ ব্যারিস্টার ৮ মোক্তার ৭ এর্টনী৩ ডাক্তার ৬ হাকিম ২ স্কুল শিক্ষক ৫ অধ্যাপক ২	তালুকদার ১ দেওয়ান ২ মতওয়াল্লী ১ ব্যবসায়ী ১	১৭৩
৪৪	৭৭	৬১	৫	১৭৩

পুরাতন অভিজাত শ্রেণী (১২.৫%) অপেক্ষা নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (৮৭.৫%) সংখ্যা বেশী। কার্যনির্বাহী কমিটিতে এক প্রিন্স ফাররুক শাহ ও জমিদার মীর মোহাম্মদ আলী ছাড়া অন্যরা মধ্যবিত্তের লোক। মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির সাথে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের এখানেই একটা বড় রকম পার্থক্য ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর এ, কে নাজমুল করিম এসোসিয়েশনকে উদীয়মান বাঙ্গালী মুসলমান মধ্যবিত্তের 'মুখপাত্র' বলে অভিহিত করেছেন।[৩৭]

(৮) পরিণতি ঃ ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হলে এবং সম্পাদকের পদ ত্যাগ করলে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের কর্মোদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করে সৈয়দ আমীর আলী লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তখন এসোসিয়েশনের সাথে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর এসোসিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্ব নেন পাটনার সৈয়দ আমীর হোসেন (১৮৯৩)। দু-তিন বছরের মধ্যেই এসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে এর পূর্বের মর্যাদা হ্রাস পায়। ১৮৯৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে সম্পাদক সৈয়দ আমীর হোসেনকে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র সংস্কারের প্রশ্নেও সদস্যদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়।[৩৮] 'মোহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' (১৮৯৬) অভিযোগ করে যে, সমাজের চোখে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন বিরক্তির কারণ হয়েছে। শহরের নের্তৃবৃন্দ সভায় বড় একটা যোগদান করে না।[৩৯]

ঐ সময়ের দিকে সোসাইটি ও এসোসিয়েশন উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। 'মোসলেম ক্রনিকলে' মন্তব্য করা হয়েছিল- "----------the only service of activity which has been Characteristic of our Association (i.e.MLS and CNMA) is to be seen in dancing attendance on coming and retiring of viceroys and Licutenant Governors, and swallowing in silence bitter replies to unsolicited, unasked for fulsome addresses of welcome and farewell" [৪০]

মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধানের মৌলিক উদ্দেশ্য এক হওয়া সত্বেও সোসাইটি ও এসোসিয়েশনের মধ্যে মতৈক্য অপেক্ষা মতবিরোধই বেশী ছিল। এর প্রধান কারণ নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর ব্যাক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। উভয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্ত

Dhaka University Institutional Repository

ান, উভয়ের কর্মস্থল ছিল কলকাতায়। আবদুল লতিফ কলকাতা মাদ্রাসার জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ, সৈয়দ আমীর আলী বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার । বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ দ্বারা উভয়ে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েই তাঁদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। আবদুল লতিফ রক্ষণশীল সংস্কারক ছিলেন, অন্য দিকে সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন প্রগতিশীল সংস্কারক। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার নিয়ে তাঁরা একমত হতে পারেননি। আবদুল লতিফ আরবি-ফারসি ভাষাসহ ধর্মশিক্ষা অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছিলেন, আর সৈয়দ আমীর আলী ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সৈয়দ আমীর হোসেন মাদ্রাসা তুলে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সৈয়দ আমীর আলীর প্রস্তাবিত সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সুবিধার দাবী আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদ যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।[৪১] উইলফ্রেড স্কয়েন বব্লান্ট দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় "It is a pity they (i.e. Abdul Latif and Ameer Ali) hate each other so that they can not join any common action" [৪২]

মীর মোশাররফ হোসেন মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'সাহিত্য-সমিতি ও জাতীয় সমিতির মধ্যে মর্মগত, আত্মগত, ব্যক্তিগত, অব্যক্ত মনোমালিন্য' ছিল।[৪৩] 'ইসলাম-প্রচারকে' সৈয়দ এমদাদ আলী ও উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনৈক্যের কথা বলেছিলেন, সমাজের গভীরে এগুলোর প্রভাব প্রসারিত হয়নি। তিনি লিখেছেন, "কেউ কেউ বলতে পারেন, আমাদের মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সভা আছে, এই সভা সমূহের যারা নেতা তাঁরা যদি একযোগ হয়ে কাজ করত, তবেই তো আমাদের নেতার অভাব পূরণ হত। আমরা যেরূপ আদর্শ নেতার (সর্বজনমান্য নেতা) কথা বলেছি, এ সমূদয় সমিতিতে কি তেমন কোন নেতা আছেন?"[৪৪] তিনি যখন এই প্রবন্ধ লিখেন তখন মোহামেডান

Dhaka University Institutional Repository

লিটারেরী সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন আবদুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আমীর হোসেন। উনিশ শতকের নব্বই দশকের দিকে প্রতিষ্ঠান দুটি তাদের পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল, ঐ দশকের কলকাতা ও মফস্বলে স্থাপিত বিভিন্ন সভা-সমিতির অভিযোগের মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত,'কলকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩) ও 'মোহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন'(১৮৯৬) এগুলোর লুপ্ত গৌরবের প্রশ্ন তুলে আপন আপন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের যথার্থতা প্রমাণ করেছিল।

১৯২৩ সালে সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব ছিল। তখন এর সদস্য সংখ্যা ছিল একশত সাতানব্বই (১৯৭) জন। এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন খান বাহাদুর আবদুস সালাম।[৪৫]

কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের পূর্বাপর প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের উপর সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করে নিম্নরূপ মন্তব্য করা যায় ঃ

১) কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন মুখ্যত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তবে শিক্ষাও সমাজ বিষয়ক সমস্যাও এর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২) ইংরেজ-আনুগত্য ও রাজভক্তি ক্ষুণ্ন করে এসোসিয়েশন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেনি।

৩) বাংলা ও ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের উন্নতির চিন্তা ও সাধনা এসোসিয়েশনের ব্রত ছিল।

৪) সংগঠনের দিক থেকে উদার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিন্তু স্বসমাজের স্বার্থের বাইরেও কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। সমাজগত ভাবে হিন্দু- মুসলমানের ঐক্য ও উন্নতি কামনা করলেও রাজনীতিগতভাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষকেই প্রশ্রয় দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫) এসোসিয়েশনের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক অর্থকরী বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সাথেও সহযোগিতা করতে চেয়েছে (১৮৮৫), কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ায়।

৬) উদীয়মান প্রভাবশালী নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'মুখপাত্র' হিসেবে এসোয়িেশনের সংগঠন শক্তি ও কর্মক্ষমতা অনেক বেশী ছিল।

৭) শাখা- এসোসিয়েশনের মাধ্যমে চিন্তাধারা ও আদর্শাবলী সমাজের বিস্তৃত পটভূমিতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে এবং সেদিক থেকে সফলকাম ও হয়েছে।

৮) শাসক শ্রেণীর সাথে আপোষমূলক নীতি ও আবেদন- নিবেদনের মনোভাব বজায় থাকায় রাজনৈতিক চেতনার পূর্ণ বিকাশ হয়নি। এজন্য সমাজকে জাগাবার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৯) 'জাতীয়তা'র প্রশ্নে এসোসিয়েশনের সর্ব ভারতীয় চিন্তা থাকলেও পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। উর্দুভাষার সমর্থন দিয়েছে এবং ইসলামধর্ম ও মুসলমানদের অতীত গৌরবের উপর ভিত্তি করে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতি কামনা করেছে। স্বয়ং সৈয়দ আমীর আলী ঐরূপ সংস্কৃতির সাধনা করেছে।

১০) পত্র-পত্রিকা,বই-পুস্তক কিংবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন নিজস্ব স্কুল গড়ে তুলতে পারেনি। মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির-মতো কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনেরও এখানে ব্যর্থতা।[৪৬]

শাখা এসোসিয়েশন ঃ

এসোসিয়েশনের কর্মসূচীকে কলকাতার বাইরে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে শাখা-এসোসিয়েশনের পরিকল্পনা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যাতে নিজেদের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নানা স্থান থেকে আবেদন তুলুক যে, তারা বঞ্চিত, দুর্গতও অসন্তুষ্ট। নিজেদের অস্তিত্ব, অধিকার ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে সমাজের মানুষকে নিশ্চল, নিষ্কর্ম অবস্থা থেকে সক্রিয়, সবর ও জাগ্রত করে তুলতে পেরেছিল, এটাই এসোসিয়েশনের বড় সাফল্য। বাংলা ও বাংলার বাইরে ভারতবর্ষে

Dhaka University Institutional Repository

এসোসিয়েশনের শাখা ছিল। ১৮৮৮ সাল অবধি ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে এর শাখার সংখ্যা ছিল ৫৩টি। রামগোপালের মতে এগুলো হলোঃ করাচি, শাহজাদপুর, শিকারপুর, লারকানা, সুক্কুর, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, হারদই,হিসার, গুজরাট, আম্বালা, লুধিয়ানা, বেরেলী, বদাউন, মোহন, এলাহাবাদ, আজমীর, লক্ষ্মৌ, গাজীপুর, সুরাট, দিন্দিগল, বাঙ্গালোর, টুমকুর, ভিজাগাপত্তম, ভিজিয়ানাগ্রাম, সাসারাম, আররাহ, দিনাপুর, গয়া, পাটনা, ছাপরা, সেওয়ান, মজাফফরপুর, মতিহারি, ভাগলপুর, হুগলী, জাহানাবাদ, পাণ্ডুয়া, রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, বগুড়া, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শিলং, চট্টগ্রাম, দুমকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কটক।[৪৭] ১৯০৯ সালে বাংলাদেশের শাখাগুলোর নাম ছিল- বর্ধমান, পাবনা, রংপুর, মালদহ, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম, হুগলী, জাহানাবাদ, বরিশাল, খুলনা, যশোর, মেদিনীপুর, গাইবান্ধা ও চুয়াডাঙ্গা।[৪৮] কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সাথে শাখা এসোসিয়েশনের সম্পর্ক কিরূপ থাকবে তা আমরা পূর্বেই গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য করেছি। এখন বাংলার কতকগুলো শাখা এসোসিয়েশনের বিবরণ দেওয়া হলঃ-

(১) বগুড়া শাখা ঃ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চ - বার্ষিকী রিপোর্টে (১৮৮৩) বগুড়ার 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' এর কার্যকরী কমিটির সদস্যসহ মোট ৭৮ জনের একটি সদস্য তালিকা স্থান পেয়েছিল।

কার্যকরী কমিটির ঐ সময়ের গঠন রূপটি ছিল এরূপঃ

সভাপতি- সৈয়দ আব্দুস সোবহান চৌধুরী

সহ-সভাপতি- শাহ নাজমুদ্দীন আবুল হোসেন ও সৈয়দ ওয়ালিউল্লা

সম্পাদক- সমিরুদ্দীন ও মোহাম্মদ আব্দুল করিম

সহকারী সম্পাদক- মোহাম্মদ ইসহাক মহসিন ও বাহাজুদ্দীন

কোষাধ্যক্ষ- খাজা আজিজুদ্দীন ও গোলাম মহিউদ্দীন

সদস্য বৃন্দ- খোন্দকার মফিজউদ্দিন, আব্দুর রশিদ, শামছুর রহমান খান, আমীরুদ্দীন,

মোহাম্মদ হাসান মহসিন, মোতারফ আলী খান, ও নাসির উদ্দীন আহমদ।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে (৫ জানুয়ারী ১৮৯৭) জনৈক পত্র লেখক বলেছিলেন যে, বগুড়ার এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক সমীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর এটি নির্জীব হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে মুসলমান সমাজে পরিবর্তন এসেছে এবং এসোসিয়েশনটি পুর্নগঠিত হয়েছে। পত্র লেখক তৎকালীন সম্পাদক সাজ্জাদ আলীর নিকট বগুড়ার ধ্বংসমুখী মাদ্রাসাটিকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।[৫০] ১৯০৫ সালে বগুড়ার 'জাতীয় মুসলমান সমিতির অনুষ্ঠান পত্র' শিরোনামে ৮ পৃষ্ঠার একটি নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। এটি শেখ জমিরুদ্দীন বগুড়ার 'রায়প্রেস' থেকে প্রকাশ করেন।[৫১]

(২) চট্রগ্রাম শাখা ঃ 'সেন্ট্রাল ন্যাশনল মোহামেডান এসোসিয়েশন' এর প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক রিপোর্টে চটগ্রাম শাখা-এসোসিয়েশনের ৬৪জন সদস্যের একটি তালিকা স্থান পেয়েছে । জমিদার, সরকারী কর্মচারী, আইনজীবী, শিক্ষক, ধর্মনেতা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইকরাম রসুল খান বাহাদুর সভাপতি এবং চট্রগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জুলফিকার আলী সম্পাদক ছিলেন। [৫২]

(৩) খুলনা শাখা ঃ 'খুলনা জেলা মোহামেডান এসোসিয়েশন' ১৮৯০ সালে স্থাপিত হয়। 'সুধাকার' পত্রিকায় 'খুলনা মুসলমান সমিতি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভার (২ মার্চ ১৮৯০) সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'মুসলমান বোর্ডিং' স্থাপনের চাঁদা সংগ্রহ করা সভার উদ্দেশ্য ছিল। ধামালিয়ার জমিদার আব্দুল আহাদ সভায় উপস্থিত হতে না পেরে সমিতির হিতকার্যে ঐক্যমত জ্ঞাপন করে একটি পত্র প্রেরণ করেন।[৫৩]

(৪) হুগলী শাখা ঃ এই শাখাটি ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন প্রিন্স বশিরুদ্দিন। আর সম্পাদক ছিলেন আশরাফ উদ্দিন আহমদ। হুগলী জেলার 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' এর প্রতিষ্ঠার বছরে কার্যকরী কমিটির সদস্য বৃন্দ ছিলেন এরূপঃ

সভাপতি- প্রিন্স বসিরউদ্দীন

সহ-সভাপতি- প্রিন্স আমিরুদ্দীন ও নাজির উদ্দীন আহমেদ, খান বাহাদুর

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ- আশরাফ উদ্দীন আহমেদ, মোতওয়াল্লী, ইমামবাড়া

সহকারী সম্পাদক- ইজাদ বক্স বিএ, বিএল, ও মির্জা মোহাম্মদ শরীফ

যুগ্ম-সম্পাদক-মযহারুল আনোয়ার চিত্র, বিএল, উকিল ও জমিদার

সদস্যবৃন্দ- আলী আহমদ, খান বাহাদুর, সৈয়দ আবদুল মোজাফফর, জমিদার, মির্জা রমজান আলী, আইনুদ্দীন আহমদ, প্রধান কেরানী, ইমামবাড়, হাজি মোহাম্মদ শিরাজী, সৈয়দ আমজাদ আলী, অফিসার, ডাক বিভাগ ও আবদুল জলিল, শিক্ষক, হুগলী কলেজ। [৫৪]

১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় হুগলীর শাখা এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জেলার মুসলমানদের আশা-আকাক্ষা তুলে ধরা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব রক্ষা করা এর লক্ষ্য।[৫৫] ১৮৯০ সালে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে মুসলমানদের বিরত থাকার যে অভিযান চালান হয় তাতে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের নির্দেশে হুগলীর শাখাও অংশ গ্রহণ করে।[৫৬]

১৮৯৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশন কনফেরেন্সে' অংশ গ্রহণ করার জন্য এসোসিয়শনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি পাঠান হয়ঃ

মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর (সহ-সভাপতি), সৈয়দ আশরাফউদ্দীন আহমদ (সম্পাদক), মযহারুল আনোয়ার (যুগ্ম-সম্পাদক), সৈয়দ ইরফান আলী, জমিদার, বীরভূম, সৈয়দ খয়রাত আলী, মীর আলী, মীর হায়দার হোসেন, অফিসার, ইমামবাড়া, ইমদাদ আলী, জমিদার ও মোহাম্মদ আলী। [৫৭]

(৫) জাহানাবাদ শাখা ঃ সম্ভবত শাখাটি ১৮৮৫ সালের গোড়ার দিকে স্থাপিত হয়। 'মুসলমান বন্ধু' পত্রিকায় (৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫)বলা হয় , কলকাতার জাতীয় মুসলমান সভার একটি শাখাসভা মেদিনীপুরে স্থাপিত হওয়ার জন্য পরিকল্পনা হচেছ। 'মুসলমান বন্ধু'র পরবর্তী সংখ্যায় (১৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫) আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'র খবর প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, জাহানাবাদের কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীরা মিলিতভাবে সভাটি স্থাপন করেন। রসুলপুরের ডাক্তার গোলাম হোসেন এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই সভাই পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মোহামেডান এসোসিয়েশনের শাখাভুক্ত হয়। তখন এর নামও পরিবর্তিত হয়। ১৮৯০ সালে ২০ মে সমিতির সম্পাদক গোলাম হোসেন স্যার সৈয়দ আহমদকে সম্বোধন করে একটি পত্র লিখেন। ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য বৃদ্ধির জন্য একটি বিল বৃটিশ পার্লামেন্টে বিবেচনাধীন ছিল। সে বিলের স্বপক্ষে স্যার সৈয়দ আহমদ এক স্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে এ দায়িত্ব অর্পিত হয় কেন্দ্রীয় মোহামেডান এসোসিয়েশনের উপর। কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন শাখা এসোসিয়েশনগুলোকে স্বাক্ষর সংগ্রহের নির্দেশ দেন। গোলাম হোসেন চৌধুরীর পত্রখানি ছিল তাঁর অঞ্চলের মুসলমানদের স্বাক্ষরপত্র প্রেরণের বিষয় সম্পর্কিত।[৫৮]

(৬) মেদিনীপুর শাখা ঃ এটি ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল প্রকার ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে ও আইনসঙ্গত উপায়ে জেলার মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধান ছিল মেদিনীপুর ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। স্থানীয় ভূস্বামী, শিক্ষিত ব্যক্তি, আইনজীবী, ডাক্তার , সরকারী কর্মচারী, ধর্মপ্রচারক, ব্যাবসায়ী প্রভৃতি এর সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতেন।[৫৯] ১৮৯৫ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারী 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে শাখা-সমিতির ঐ সময়ে সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর ইকরাম রসুল এবং সম্পাদক ছিলেন ব্যারিস্টার-সৈয়দ আবদুর রহমান। ঐ সময় বাংলার ছোট লাট চালর্স এলিয়ট (১৮৯০-৯৫) মেদিনীপুর পরিদর্শনে গেলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং একটি স্মারকপত্রে মুসলমান সমাজের দাবি-দাওয়া তুলে ধরা হয়। একটি মাদ্রাসা ও একটি স্কুল বোর্ডিং এর উন্নতিকল্পে অর্থমঞ্জুরি এবং চাকুরীতে মুসলমানদের যথাযথ নিয়োগের আবেদন জ্ঞাপন ছিল স্মারকপত্রের প্রধান বক্তব্য।[৬০]

১৯০০ সালের আগস্ট মাসে ছোটলাট জন উডবার্ন (১৮৯৮- ১৯০২) মেদিনীপুর পরিদর্শনে গেলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাদের তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এসোসিয়েশনের সম্পাদক ইকরাম রসুল 'অভিনন্দন-বাণী' পাঠ করেন। আবদুল বারি উর্দুতে এবং সদর কাজী বাহাউদ্দিন আরবিতে প্রশস্তি পাঠ করেন। [৬১]

Dhaka University Institutional Repository

(৭) রাজশাহী শাখা ঃ এ শাখাটিও ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'রাজশাহী মোহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন নাটোরের জমিদার এরশাদ আলী খান চৌধুরী এবং সম্পাদক ছিলেন ইমামুদ্দীন। মুসলমান সমাজের উন্নতি এসোসিয়েশনের সর্বাত্মক লক্ষ্য ছিল। হিন্দু জমিদার ও গণ্যমান্য ব্যক্তি পরিচালিত 'রাজশাহী সভা' (১৮৭৮) ছিল। রাজশাহী মোহামেডান এসোসিয়েশন সংস্থাপনের পেছনে এই সভার প্রেরণা ছিল। ১৮৯১ সালে এসোাসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। তাঁরই উদ্যোগে এসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবন তৈরী হয়; ডাক্তার সিরাজ উদ্দীন আহমদ গৃহ নির্মাণের জন্য ভূমি দান করেন।[৬২] এটি পরবর্তীকালে 'রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়'কে দান করা হয়।[৬৩]

(৮) রংপুর শাখা ঃ 'রংপুর মোহামেডান এসোসিয়েশন'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন মহীপুরের শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী জমিদার আবদুল মজীদ চৌধুরী। 'মোসলেম ক্রনিকলে' এটিকে সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'এর শাখা রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতেশ্বরীর জুবলী উৎসব (১৮৭৭) উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রযত্নে 'রংপুর মোহামেডান এসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। পত্রিকায় বলা হয় যে, ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ঐ শাখা-সমিতি দুটি কাজে সফলতা লাভ করেছে, একটি রংপুর মাদ্রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং অপরটি মাদ্রাসার একটি বৃহৎ দালান নির্মাণ। আবদুল মজিদ চৌধুরী, চৌধুরী ওসমান উদ্দীন (জমিদার) ও সৈয়দ আবদুল হায়াত গোলাম হাফিজের আর্থিক সাহায্যে ঐগুলোর নির্মাণ কাজ সম্ভব হয়। ১৮৯০ সালে স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলী মাদ্রাসা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।[৬৪]

১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় রংপুরের শাখা-সমিতির স্থাপনের কাল আছে ১৮৮৭ সাল। ঐ তালিকায় বলা হয়েছে যে, রংপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমান সমাজের ন্যায্য দাবী-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরা এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো আদায় করা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।[৬৫]

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে যোগদানের জন্য রংপুরের শাখা সমিতি একটি সভার (৩ নভেম্বর ১৮৯৯) মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। তাঁরা হলেন তসলিমুদ্দীন আহম্মদ, বিএল, সরকারি উকিল সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ, জমিদার, মোহাম্মদ আশফ খান, বিএল, মোহামদ মোজাম্মল এল, এম, এস, আবদুস সোবহান, ইনকাম-ট্যাক্স এসেসর, তহসীনুদ্দীন আহমদ, মোক্তার, সমীরুদ্দীন আহমদ, জমিদার, মেসেরউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ জিয়াফত উল্লাহ ও মনিরুজ্জামান। [৬৬]

ঐ সময় সমিতির সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তাহা (জমিদার) ও সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ, সম্পাদক তসলিমুদ্দীন আহমদ, সহকারী সম্পাদক ডাক্তার মোহাম্মদ মোজাম্মেল এবং যুগ্ম-সম্পাদক মোহাম্মদ আশফ খান। [৬৭]

সমিতির কেন্দ্রীয় শক্তির মূলে ছিলেন আবদুল মজিদ চৌধুরী। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করতেন, তবে সে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার চেয়েছিলেন। তিনি বাংলার সরকারকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন যে, বাংলা পাঠশালার পুস্তকগুলোতে হিন্দুদের দেবতার কথাই বেশী, কোন মুসলমান পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে ঐরূপ বিদ্যা শিক্ষা দিতে চাবেন না। ইসলাম ধর্মের কথা,ফারসি, আরবি ও উর্দু পুস্তকে আছে, ধর্মশিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য ঐসব ভাষা শিক্ষা আবশ্যক বলে তারা মনে করেন । তিনি ছোট লাট উডবার্নের (১৮৯৮- ১৯০২) ঘোষিত শিক্ষানীতির সূত্র ধরে মক্তবগুলোর জন্য সরকারী সাহায্য ও স্কুল ইন্সপেক্টর দ্বারা সেগুলো সময়মত পরিদর্শনের দাবী জানান। তাঁর অভিমত, মাদ্রাসার সাথে সম্পর্ক রেখে মক্তবের শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন সরকারী অর্থ সাহায্য দ্বারা ছাত্রদের বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ দান এবং ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমান সাব-ইন্সপেক্টর দ্বারা মক্তব পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিলে মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হবে।[৬৮] ১৯০৩ সালে সরকারের কাছে প্রদত্ত একটি আবেদন পত্রে 'রংপুর ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' ঐ দাবীগুলোর কথা পুনরায় তুলে ধরেন। [৬৯]

মুসলমান সম্প্রদায় হিসেবে স্বাতন্ত্র্য-চেতনা এসোসিয়েশনের মাধ্যমে জাগতে শুরু করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ছোটলাট এন্ড্রু ফেজারকে(১৯০৩-১৫) প্রদত্ত এক অভিনন্দন-বাণীতে। তিনি ১৯০৪ সালের জুন মাসে রংপুর পরিদর্শনে যান। মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা-গরিষ্ট হলেও ঐ জেলায় কোন মুসলমান স্কুল-ইন্সপেক্টর নেই এরূপ অভিযোগ করে ঐ শাখা-সমিতি ছোট লাটের কাছে একজন আরবি-ফারসি অভিজ্ঞ ব্যাক্তিকে ঐ পদে নিয়োগ করার দাবী জানায়। [৭০]

(৯) বর্ধমান শাখাঃ সেন্টাল ন্যাশনাল মোহামেডানের এ শাখাটি ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মোসলেম ক্রনিকলে' 'বর্ধমান মোহামেডান এসোসিয়েশনে'র একটি চিঠি (২০ মার্চ ১৮৯৫) প্রকাশিত হয়। এতে উক্ত সমিতির এক সভায় গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবের উল্লেখ আছে। শহরে একটি মাদ্রাসা স্থাপন, একটি মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং স্থানীয় সরকারী অফিসে মুসলমানদের চাকুরীতে নিয়োগের কথা প্রস্তাবগুলোতে বলা হয়েছে।[৭১] ১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় বর্ধমান মোহামেডান এসোসিয়েশনের উল্লেখ আছে। ঐ সময় এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসিন বিএল এবং সম্পাদক ছিলেন মৌলভী নাজিরুদ্দীন আহমদ বিএল। মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯০ জন । বেশীর ভাগ সদস্য ছিলেন আয়মাদার যারা মুঘল আমল থেকে মালিকানা ভোগ করে আসছেন। সামগ্রিকভাবে জেলার মুসলমান সমাজে আধুনিক ও ধর্ম শিক্ষা বিস্তার করা এবং সমাজের অভাব-অভিযোগ সরকারের কাছে তুলে ধরা ও প্রতিকার করা এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল। [৭২]

(১০) ময়মনসিংহ শাখা ঃ আলিগড়ের সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে উনিশ শতকের আট দশকের দিকে কংগ্রেস- বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশেও গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন ও তার শাখা সমূহ এক স্বাক্ষর অভিযান' শুরু করে। ময়মনসিংহের শাখা এসোসিয়েশনের অনারেরি সম্পাদক হামিদউদ্দীন আহমদ ঐ আন্দোলনের পরিস্থিতি জানিয়ে সৈয়দ আহমদকে পত্র লেখেন (৩১ অক্টোবর ১৮৮৮)। ঢাকার 'আঞ্জুমানে ইসলামীয়া'র সভাপতি সৈয়দ আবদুল বারি কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, সে কথা উল্লেখ করে হামিদউদ্দীন বলেন, যে তিনি ও অন্যান্য নেতা ঢাকার মুসলমান সমাজ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ আবদুল বারির প্রভাব দূর করার চেষ্টা করেছেন। [৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

(১১) পাবনা শাখা ঃ ১৮৯৯ সালের ১১ জানুয়ারী পাবনার ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পাবনা জেলা স্কুলের মুসলমান বোর্ডিং এর উদ্বোধনী সভা হয়। পাবনার তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবুল মাহমুদ সভায় বক্তৃতা দেন। উক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণে প্রধান আর্থিক সাহায্য দান করেন পাবনার দুলাই-এর জমিদার ভ্রাতৃদয়- হোসেন জান চৌধুরী, ফাসিলউদ্দীন আবদুল গণি চৌধুরী ও আবদুল বাসেত চৌধুরী এবং ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ ও ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। ঐ সময় শাখা-সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন আলিমুদ্দীন।[৭৪]

জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে পাবনার শাখা-সমিতি ঘোর বিরোধী ছিল। সমিতির সদস্যগণের ধারণা ছিল যে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের বা জাতির সম্মিলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারে না। এটি মুখ্যত হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান, কতিপয় উচ্চাভিলাষী বাঙ্গালী হিন্দু এটি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সরকারী শাসনের বিরোধীতা করেন। তাঁরা মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, মুসলমানদের উন্নতিও তাঁরা চাননা। সুতরাং কংগ্রেসে যোগদান করা মুসলমানদের পক্ষে সংগত হবেনা। উল্লেখযোগ্য যে, পাবনার ঐ শাখা সমিতি সৈয়দ আহমদের 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনে'র আদর্শ সমর্থন করতো।[৭৫]

(১২) মালদহ শাখা ঃ ১৮৯০ সালে 'মালদহ মহোমেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। মালদহ জেলার মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা মূলক অবস্থার উন্নতি বিধান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল। এসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল আজিজ খান প্রেরিত একটি পত্র (২০ জুন ১৮৯৬) 'মোসলেম ক্রনিকলে' ছাপা হয়। তিনি লিখেছেন, ১৮৯৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত এসোসিয়েশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জেলা শহরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা। মালদহের 'বাইশ হাজারী' ওয়াকফ সম্পত্তির তত্তাবধায়ক মতওয়াল্লীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে এসোসিয়েশন ব্যর্থ হয়। ফলে মাদ্রাসা স্থাপন সম্ভব হয়নি। এসোসিয়েশনকে ঢেলে সাজাবার জন্য ১৮৯৫ সালের ১৫ডিসেম্বর একটি সভা ডাকা হয়। কলকাতার 'সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল মহোমেডান এসোসিয়েশনে'র আদর্শে এটিকে পুর্নগঠিত করা হয়। জমিদার চৌধুরী মোয়াহেদুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

সর্বসম্মতিক্রমে এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। জেলা- প্রশাসক মি: প্রাইস অনারেরী সভাপতি হন।[৭৬] ঐ সভায় গৃহীত একটি প্রস্থাবে জেলার শিক্ষা বিভাগে যাতে পরিমিত সংখ্যক মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করে, সে- বিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাছে সুপারিশ করা হয়। সরকারী বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে এসোসিয়েশনের অনুরোধ সত্ত্বেও বোর্ড মুসলমান কর্ম প্রার্থীর বিষয় বিবেচনা করেনি, এ বিষয়ে অভিযোগ তোলা হয়।[৭৭] ১৮৯৫ সালের ৮ মার্চ এসোসিয়েশনের 'কার্যনির্বাহক কমিটি'র একটি সভা হয়। তাতে নিম্নের বিষয়গুলো আলোচিত হয়:-

১. ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ১২ জন সদস্যের মধ্যে যাতে ৬ জন মুসলমান সদস্য নেওয়া হয়, সে উদ্দেশে বোর্ডের সভাপতির কাছে অনুরোধ করা হয়।

২. 'বাইশ হাজারী'র মতওয়াল্লী ও 'শাহ্ হাজারীর' তত্তাবধায়কের কাছে মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হয়। জেলার জমিদার ব্যাবসায়ী ও ধনী ব্যাক্তিরা সমাজের উন্নতির দিকে চরম অমনোযোগী বলে দুংখ প্রকাশ করা হয়। অরশ্য 'শাহ্ হাজারীর' তত্তাবধায়ক কিছু মেয়াদী সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

৩. জেলা স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোন ছাত্রাবাস নেই। শহরের কোর্টের কিছু উকিল ও কর্মচারীর গৃহে 'জয়গীর' থেকে দূর অঞ্চলের ছেলেরা লেখাপড়া করে। মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য একটা স্থায়ী অর্থ-তহবিল গঠনের প্রস্তাব নেয়া হয়।[৭৮]

স্ব-সমাজের স্বার্থের প্রতি এসোসিয়েশনের প্রখর দৃষ্টি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ভাগলপুর বিভাগীয় কমিশনার ডবিউ, বি ওলধাম (মালদহ তখন ঐ বিভাগের অন্ত র্ভুক্ত ছিল) -এর কাছে প্রেরিত এক দীর্ঘ আবেদনপত্রে (৮ অক্টোবর ১৮৯৬)। এতে তৎকালীন মালদহ জেলার মুসলমানদের বিবিধ অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। জেলা বোর্ড, জেলা মিউনিসিপ্যালিটি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি- মুখ্যত এই অভিযোগই প্রধান ছিল। অফিসে হিন্দু কর্মচারীর

Dhaka University Institutional Repository

একচেটিয়া প্রাধান্য এবং চাকুরী নিয়োগের ব্যাপারে তাঁদের স্বজনপ্রীতির অভিযোগের কথাও বিবৃত হয়েছে।[৭৯]

১৮৯৯ সালের আগস্ট মাসে ছোটলাট উডবার্ন মালদহ জেলা পরিদর্শনে গেলে তাঁকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংর্বধনা দেওয়া হয়। তাঁকে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রে সমাজের অভাব অভিযোগ তুলে ধরা সরকারী অফিস আদালতে মুসলমানদের চাকুরী সংস্থান ও মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণের আবেদন জানানো হয়। [৮০]

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে' অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য 'মালদহ মোহামেডান এসোসিয়েশনে'র একটি সভা (১১ ডিসেম্বর ১৮৯৯) অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় এসোসিয়েশনের অনারেরী সভাপতি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আবদুস সামাদ। মোক্তার মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী সহকারী সম্পাদক ছিলেন । এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণ নির্বাচিত হন।

চৌধুরী মোয়াহেদুর রহমান জমিদার (সভাপতি), আবদুল আজিজ খান, উকিল (সম্পাদক), আবদুর রহমান খান, শাম মোহাম্মদ চৌধুরী, জমিদার, কাজী আজহার উদ্দিন আহমদ, ডাক্তার, অনারেরী মেজিস্ট্রেট ও হাজী আলীজান আফজা, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। [৮১]

'১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় মালদহ মোহামেডান এসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ছিল দুইশত (২০০)। খান সাহেব আবদুস আজিজ খান তখনও সম্পাদক ছিলেন। [৮২]

'মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে বিভিন্ন জেলায় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। সেগুলো সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত ছিল, না স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ছিল তা বলা যায় না। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মোহামেডান এসোসিয়েশন ছিল এরূপ প্রতিষ্ঠান যার সহকারী সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ জাজুমাল আলী (১৮৮৮)। [৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

জলপাইগুড়ির 'মুসলমান সভা' বা 'মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৯৪) প্রতিষ্ঠা করেন একিনুদ্দীন আহমদ। এটি রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। একিনুদ্দীন ঐ জেলার মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৩ সালেও এসোসিয়েশনটির অস্তিত্ব ছিল; একিনুদ্দীন আহমদ তখন এর সভাপতি ছিলেন। [৮৪]

'মিহির ও সুধাকরে' (২৮জুন ১৯০১) বগুড়ার 'ধুপচাঁচিয়া' মোহামেডান এসোসিয়েশনে'র সম্পাদকের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রে বগুড়ার মুসলমান স্কুল-পরিদর্শক নিয়োগের দাবী জানান হয়। [৮৫]

'কুষ্টিয়া মোহামেডান এসোসিয়েশনে'র অস্তিত্ব জানা যায় মোহাম্মদ আবদুল আজীজ প্রনীত 'সংক্ষিপ্ত মোহাম্মদ - চরিত' (১৯০১) গ্রন্থ থেকে। উক্ত এসোসিয়েশন কর্তৃক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। [৮৬]

উপরোক্ত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনে' এর শাখা এসোসিয়েশনের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যাতে নিজেদের দাবী - দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নানা স্থান থেকে আবেদন তুলতে পারে যে, তারা বঞ্চিত, দুর্গত ও অসন্তষ্ট। আর নিজেদের অস্তিত্ব, অধিকার ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সমাজের মানুষকে নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে সক্রিয়, সবর ও জাগ্রত করে তুলতে পেরেছিল। এটাই এসোসিয়েশনের বড় সাফল্য।[৮৭]

রাজনৈতিক কর্মসূচী ঃ

'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' সর্ব ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখে। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বাণার্জী বিলেত ও দিল্লীতে একই সময় আই, সি, এস পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আন্দোলন করেন। সৈয়দ আমীর আলী বুঝতে পেরেন যে, এই ব্যবস্থা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। এই জন্য তিনি এর বিরোধিতা করেন। তিনি মনোয়ন প্রথা বজায় রাকার দাবী করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে সুরেন্দ্রনাথ বাণার্জীর মতাবলম্বী ছিলেন, পরে তিনি সৈয়দ আমীর আলীর মত গ্রহণ করেন।

১৮৮৭ সালে এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল লর্ড ডাফারিণের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং মুসলমানদের অনুন্নত অবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে ২৪ মার্চ এসোসিয়েশন লর্ড ডাফারিণের বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। সম্বর্ধনার উত্তরে ডাফারিণ স্বীকার করেছিলেন যে, ঐতিহাসিক কারণবশত মুসলমানগণ অসন্তোষজনক অবস্থায় পড়েছে এবং তিনি আশ্বাস দেন যে, তাদের প্রতি সরকারের সহানুভূতি আছে। ২২ ডিসেম্বর এসোসিয়েশন নবনিযুক্ত বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের অভ্যর্থনা সভার অনুষ্ঠান করেছিল। বড়লাট তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন যে, মুসলমানরা যে অসুবিধা ভোগ করছে এবং দেশের সম্পদের ন্যায্য অংশ হতে বঞ্চিত রয়েছে তা তিনি অবগত আছেন। এইরূপ অভ্যর্থনা ও অভিভাষণের আয়োজন করে সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।[৮৮]

সৈয়দ আমীর আলী শাসন সংস্কারের দাবী উত্থাপন করেন। ভারতীয়দেরকে অধিক সংখ্যায় দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ, শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ, ব্যাপক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেন। তিনি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের দাবী করেছিলেন। ১৮৮০ সালে নাইনটিনথ সেঞ্চুরীতে লিখিত 'ভারতের জন্য ভারতীয়দের কয়েকটি প্রস্তাব' (some Indian Suggestion for India) শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ আমীর আলী তাঁর অভিমত জোরের সাথে প্রকাশ করেন। এটা ভারত সচিব ডিউক অব ডেভনশায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারত সচিব তাঁর সাথে ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন।[৮৯] এরপর ১৮৮৩ সালে তিনি এসোসিয়েশন ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য দাবী করেন এবং সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবগুলো ১৮৮৩ সালের মিউনিসিপ্যাল বিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান হয়। [৯০]

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আলী ও তাঁর এসোসিয়েশনের আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়। ১৮৮৮ সালের ৬ নভেম্বর লর্ড ডাফারিণ ভারতের ব্যবস্থাপক পরিষদের সম্প্রসারণের ব্যাপারে ভারত সচিবের নিকট যে সুপারিশ করেন তাতে তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতীয়রা বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে বহু জাতিতে বিভক্ত এবং বৈষয়িক স্বার্থের বিরুদ্ধতায় একে অন্যের হতে বিচ্ছিন্ন। বিলেতের পার্লামেন্টে ১৮৯২ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ বিলের বিতর্কে লর্ড কেম্বারলী অনুরূপ মন্তব্য করেন এবং বলেন যে, ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্টারী পদ্ধতি প্রবর্তন যুক্তিযুক্ত হবেনা। তিনি বলেন, "যদি আপনারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জনমতের দ্বারা পরিচালিত হন তাহলে আপনাদেরকে বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে।"[৯১] অবশেষে বিলটি আপোষ-মূলক পরিকল্পনা রূপে গৃহীত হয়। ব্যবস্থাপক পরিষদগুলোতে বিভিন্ন স্বার্থ বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। এইজন্য ১৮৮২ সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের আইনে মুসলমানগণ পরিমিত প্রতিনিধিত্ব পেতে পারেনি।

বিলেতে বসতি স্থাপনের পরও সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করেন। তিনি ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে নাইনটিনথ সেঞ্চুরী সাময়িকীতে 'ভারত ও নতুন পার্লামেন্ট' নামক একটি প্রবন্ধে দাবী করেন যে, ভারতীয় মুসলমানেরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে তাদের জন্য পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তিনি ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য উপদেশ দেন এবং এর মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিজেদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে পরামর্শ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মাদ্রাজের মুসলমানদের সম্বর্ধনার উত্তরে অস্থায়ী বড়লাট লর্ড অ্যামপটহিল যে উক্তি করেন তার উল্লেখ করেন। অ্যামপটহিল মন্তব্য করেছেন যে, নম্রতা একদিকে মুসলমানদের বড় গুণ, অন্যদিকে এটা তাদের মস্তবড় দোষ। তিনি বলেছেন, " আপনারা জোর করে দাবী করতে পারেন না, আপনারা বেশী কিছু দাবী

Dhaka University Institutional Repository

করেন না এবং এমনকি সম্মুখে আসতেও সংকোচ বোধ করেন " সৈয়দ আমীর আলী বলেন যে, এই উক্তি হতে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।[৯২]

এই সময় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেখা যায়। এই বৎসর অক্টোবর মাসে সিমলা ডেপুটেশন অনুষ্ঠিত হয়, মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কার ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার দাবী জানান। এই সময় নবাব সলিমুল্লাহর সর্ব-ভারতীয় মুসলিম কনফেডারেন্সী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।[৯৩] এরপর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সর্ব - ভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁর এসোসিয়েশন মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এটা প্রায় ত্রিশ বৎসর তাদের প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় সংস্থার কাজ করে।[৯৪] তিনি এই এসোসিয়েশনের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। ১৯০৪ সালে তাঁর বিলেত চলে যাওয়ার পর এটা নেতৃত্বহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এইজন্য তিনি একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দেয়। [৯৫]

জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলমানঃ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে (১৮৮৪) যোগদানের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়। আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী কংগ্রেসে যোগদান করেননি। তাদের ধারনা হয়েছিল যে, কংগ্রেসে যা আলোচিত হয় এবং যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। উপরন্ত কংগ্রেসে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে অংশ গ্রহন করা মুসলমানের পক্ষে সমীচীন হবে না, কারণ অশিক্ষা ও দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের জন্য ঐ সময়ে ইংরেজদের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক ছিল। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রন পেয়ে আবদুল লতিফ

Dhaka University Institutional Repository

মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির পক্ষ থেকে লিখেন "This committee of Muhammedam Literary society of clacutta regret their inability form further discussion of the difficult and momentous questions likely to occupy the deliberations of the congress.[৯৬] সৈয়দ আমীর আলী সেন্ট্রালন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের পক্ষে থেকে প্রায় একই মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, This committee (C.N.M.A) think that no possible adventage will reuslt either to their community or the country at large by assuming attitude of uneasiness to wards the government and the steps it has taken and intends to take.[৯৭]

১৮৮৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর লক্ষ্যে ও ১৮৮৬ সালের ১৬ মার্চ মীরাটের বক্তৃতায় সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে প্রকাশ্যে নিষেধ করেন। আলীগড়ে পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন (আগষ্ট, ১৮৮৮) গঠন করে তিনি কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন [৯৮] ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও তার তরঙ্গ উত্থিত হয়। বাংলার সদর ও মফস্বলের শহরগুলোতে বিবিধ এসোসিয়েশন ও আঞ্জুমান ছিল। স্বাক্ষরতা অভিযান চালায়। ঢাকায় খাজা মোহাম্মদ ইউসুফের সভাপতিত্বে একটি কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন কমিটি গঠিত হয়। ঢাকার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের যে, ঐ সময় ঢাকার আঞ্জুমনে ইসলাম কংগ্রেসের পক্ষে ছিল।[৯৯] ১৪ ময়মনসিংহের মহামেডান এসোসিয়েশনের সম্পাদক হামিদউদ্দীন আহমদ এতঞ্চলে সন্তোষজনক আন্দোলনের বিবরণ দিয়ে সৈয়দ আহমদকে পত্রোত্তর দেন। হুগলীর ন্যাশনাল মহামেডান এসোশিয়েশনের সম্পাদক আশরাফউদ্দীন আহমদও অনুরূপ পত্রোত্তর দেন।[১০০] নব্বই দশকের মুসলমান সম্পাদিত বাংলা ও ইংরেজি পত্র-পত্রিকার বেশীর ভাগই সৈয়দ আহমদের আন্দোলনকে সমর্থন দেয় এবং জনমত গড়ে তুলতে প্রচার অভিযান চালায়। সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকরে ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যায় (২৭ পৌষ ১৩০৭) কংগ্রেস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান কেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে ঐ নিবন্ধে লেখা হয়, আমরা কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতিযোগী নই। কিন্তু সে প্রণালীতে কংগ্রেসের কায চলে আসছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের আপত্তি। আমরা দেখছি, প্রজার প্রকৃত হিতসাধনের পরিবর্তে কংগ্রেস এখন নানাবিধ অপ্রীতিকর রাজনৈতিক বিষয়ে অবতারণা করে সাধারণ বাঙ্গালী জাতিকে রাজপুরুষদের চোখে ঘৃণিত ও হেয় করে তুলছেন। এই চাকুরিজীবী বাঙ্গালী এই কংগ্রেসের জন্য রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হয়ছেন। একতা নিয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেস মন্দিরে কংগ্রেস পাণ্ডাদের মধ্যে সে একতা কোথায়? বাঙ্গালাদেশ কংগ্রেসের উদ্ভব ক্ষেত্র, কিন্তু বাঙ্গালী সম্পাদকেরা, কংগ্রেসের অধিনায়কেরা আত্মদ্রোহে নিমগ্ন।--সৈয়দ আহমদ সাহেব প্রথমে কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা দেখে ভবিষ্যৎ বুঝে সেই কর্মবীর তার প্রতি সহানুভুতিশূণ্য হন। আমরা তাই নানা কারণে কংগ্রেস দ্বারা সুফল লাভের আশা করছি না। অনেকে বলেন আমরা কংগ্রেসের বিরোধী নই বরং আমরা কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভুতিপূর্ণ। কিন্তু এ বর্তমান কর্ম প্রণালীর বিরোধী।

মাসিক হাফেজের প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারী-১৮৯৭) শেখ ওসমান আলী, বিএল, কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মুসলামনগণ কংগ্রেসের যোগদানে অনিচ্ছুক কেন সে বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি বলেন কংগ্রেস যেরূপভাবে গভর্ণমেন্টের কার্য্যাবলীর সমালোচনা প্রতিবাদ দাবি করে থাকে তাতে বোধ হয় কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের বিরোধী, সুতরাং এহেন কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দিয়া গভর্ণমেন্টের বিরাগভাজন হওয়া উচিৎ নয় ------। মুসলমানেরা বলেন যে, কংগ্রেস দ্বারা কোন ফল লাভ হলে হিন্দুরাই তা বণ্টন করে নিবে, মুসলমানেরা কিছুই পাবে না। মাসিক প্রচারকের ১৩০৮ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় (৩য় বর্ষ ৮-৯ সংখ্যা) এ. উ আহমদ কংগ্রেস ও মুসলামন শীর্ষক প্রবন্ধে কংগ্রেসের কার্যকলাপে সন্দেহ পোষণ করে বলেন, "ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্বাচন প্রথা প্রচলন করে গভর্ণমেন্ট অবশ্য কংগ্রেসের নেতাগণের অনুমোদিত কাজ করেছেন। এই সমস্ত অধিকার হিন্দু মুসলামান খ্রিস্টানগণ সকলেই পেয়েছে পেয়ে ফল কি

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়িয়েছে? প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীতেই হিন্দু মেম্বারগণই মনোনীত হয়েছে, লাট সাহেবের সভায় হিন্দু মেম্বরগণই নির্বাচিত হয়েছে। প্রথম বারে দেখাবার জন্য খান বাহাদুর সেরাজুল ইসলাম সাহেবকে চট্টগ্রাম বিভাগ হতে মনোনীত করেছিলেন? তারপর হতেই সেন বাঁড়ুয্যে, মুখুর্যদেরই এক চেটিয়া হয়েছে। কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চের উদারতা মিউনিসিপ্যাল প্রচলন হওয়ার পর হতে সে সমস্ত মুসলামন মেম্বর দেখতে পাই, তার সমস্তই গভর্ণমেন্ট নির্বাচিত মেম্বর। একিনউদ্দীন আহমেদ অভিন্ন শিরোনামে (Muhammedans and the congress) ইংরেজি সাপ্তাহিক মোসলেম ক্রনিকলে (১০ জানুয়ারি ১৯৯৫) বলেন "Among these one of the most import is the profound want confidence felt by them (Muhammedans) in their Hindu compatriots, who have, all along been demanding power in the name of the people at large."

ক্ষমতার দাবিতে কংগ্রেস নেতাদের স্বার্থপরতার জন্য মুসলমানরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত আছে। মৌলভী শামসুল হোদা এমএ বিএল 'Indian politics and the Muhammedans' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ মোসলেম ক্রনিকলে (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) প্রকাশ করেন। এখানে মুসলামানদের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাবের একটা পরিচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলমানের একটি শ্রেণী কংগ্রেসের বিপক্ষে ছিল, আবার একটি শ্রেণী পক্ষেও ছিল। ব্যতিক্রম ছাড়া কংগ্রেসের প্রায় সব অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধি যোগদান করেছেন। গুনিয়াউকের আবদুর রসুল, বর্ধমানের আবুল কাসেম, লেদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবী, পাবনার ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরী কংগ্রেসকে সমর্থন দেন। চট্টগ্রামের মৌলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জজামান সোলতানের সম্পাদক ছিলেন। এক ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল ছাড়া এদের নেতৃত্ব ছিল আঞ্চলিক, তারা বিশ শতকের গোড়ার দিকে আবিপূর্ভত হন।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জাতীয়তাবাদ

উনিশ শতক পর্যন্ত আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর প্রভাবই সর্বাধিক ছিল। আমীর আলী কেবল শিক্ষা, চাকুরি ও প্রশাসনে মুসলামানের আর্থিক সুবিধা ও ক্ষমতা লাভের দাবি উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বিবিধ প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করে ইসলামিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন দ্বারা সমাজের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বলা যায়, এটি তার রাজনৈতিক চিন্তার ও কর্মের দ্বিতীয় ধারা ছিল। ফারায়েজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক দিক ছাড়াও একটি ধর্মীয়-সামাজিক দিক ছিল-সেটি হল ইসলামিকরণ। অনৈইসলামি রীতিনীতি ও আচার-আচরণ মুসলিম সমাজকে পঙ্গু ও হীনবীর্য করে রেখেছে। এজন্যই পতন, দারিদ্র্য ও দুগর্তি। মৌলনা কেরামত আলীও (১৮০০-৭৩) দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে এ ধারার আন্দোলন চালিয়ে যান। হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুধু মিয়ার সাথে কেরামত আলীর সাক্ষাৎ পরচিয় ছিল। তিনি তরিকার আধ্যাতিধক দিক অক্ষুন্ন রেখে ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের মনোযোগী হন। ইসলামিকরণের সাথে ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের চেতনা যুক্ত হয়ে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। নব্বই দশকে বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাব হলে এ দুটি বিষয়ই সেগুলোর আলোচনার প্রধান বস্তু হয়ে ওঠে। স্বসমাজ সম্পর্কে এই নববোধ 'মুসলিম জাতীয়তা' সৃষ্টিতে সহায়তা করে। নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ইসলামের গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন। নবাব আবদুল লতিফ সর্ব প্রথম পাঠ্যপুস্তকের অনৈসলামিক ও সামাজের নিন্দামূলক বিষয়গুলো বাদ দেওয়ার কথা বলেন এবং 'সেন্ট্রাল টেকস্ট বুক কমিটি'তে বেশী মুসলমান সদস্য নিয়োগের প্রস্তাব দেন। যাতে তারা আকাঙ্ক্ষিত আর্দশের প্রতিফলন ঘটিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তারা অনুবাদ, গবেষণা ও অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেও ইসলামি ঐতিহ্য তুলে ধরেন। প্রধানত খ্রিষ্টান ও হিন্দুয়ানী বিষয় ও ভাবধারার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন হয়েছিল। মাতৃভাষাকে আন্দোলনের মাধ্যমে হিসেব গ্রহণ করায় ক্রমে বাঙালি মুসলমানের আত্মাপরিচয়বোধের উন্মেষ হয়। আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে বাঙালী হিসেবে আত্ম-পরিচয়ের ধারণাটি স্পষ্ট ছিল না; তাঁরা নিজেরোই উর্দু-ফারসির সমর্থক ছিলেন। উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বে উর্দুকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করে বাঙালি মুসলামান আত্ম-পরিচয়ের স্পষ্ট স্বাক্ষর দেয়।

অনেকে বলেন, দোভাষী পুথির বিষয়গত ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ উদেশ্য প্রণোদিত ছিল। দোভাষী বাংলায় কোন হিন্দু লেখক পুথি রচনা করেননি। পুথিকারগণ উর্দু-হিন্দি-ফারসি-বাংলার মিশ্রণে মুসলমানের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে গড়া বাংলা মুসলামানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এরূপ ধারণা আবদুল লতিফেরও ছিল। এজন্য তিনি বাংলা স্কুলে আদালতের দলিলপত্রের ভাষায় শিক্ষাদানের পরামর্শ দেন। দোভাষী পুথি শেষ পর্যন্ত টিকেনি সত্য, কিন্তু যতদিন তা চালু ছিল, ততদিন বাঙালি মুসলমানের আত্ম-পরিচয়ের প্রথম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দোভাষী পুথি। ইসলামিকরণের যে প্রক্রিয়া ওয়াহাবি-ফারায়েজিগণ করেছিলেন, দোভাষী পুথিতে তারই প্রতিফলন আছে। বাংলার কৃষক-মজুর-মাঝি-তাতি-জেলে সকল স্তরের মানুষ পুথির অনুরাগী পাঠক অথবা মনোযোগী শ্রোতা ছিল।

১৮৭১, ৮১, ৯১ সালের সেন্সার রিপোর্ট, কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের লেখা বাঙালির ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, খোন্দকার ফজলে রাব্বির 'হকিকাতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) ইত্যাদিতে নতুন ভাবে বাঙ্গালি মুসলমানের আত্ম পরিচয় জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয়। নব্য শিক্ষিত মুসলামন লেখক-সাংবাদিকগণ বাংলা সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে তারই সমাধান খুঁজেছেন। পরবর্তীকালে এটি আরও পল্লবিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। সুতরাং ইসলামিকরণের আন্দোলন এবং মুসলমান হিসেবে আত্ম-পরিচয়ের অনুসন্ধিৎসা মুসলিম জাতীয়তার বীজ বপন করে। হিন্দু জাতীয়তার পাশে মুসলিম জাতীয়তার স্থান করে নেয়। সম্প্রদায়ভিত্তিক জাতীয়তার চেতনা হিন্দু মুসলমানের রাজনীতিকে দ্বিখণ্ডিত ও দ্বিমুখী করে। মাতৃভাষার প্রশ্নে বাংলাকে গ্রহণ করে বাঙালি মুসলমান অবাঙালি মুসলান থেকে পৃথক হয়েছে, আবার জাতীয়তার প্রশ্নে স্বভাষী সাথে ঐক্য স্থাপন করেনি। অর্থনৈতকি-রাজনৈতিক স্বার্থে দেশ-ভাষা রক্ত-ঐতিহ্যের চেতনা চাপা পড়ে যায় এবং উভয়ে দুটি বিবদমান জাতিতে পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব-মুসলিমবাদ ঃ

এর সাথে প্যান ইসলামিজম বা বিশ্ব-মুসলিমবাদের বিষয়টি আলোচনা করলে বাংলার মুসলিমানের রাজনৈতিক স্বতন্ত্র চরিত্রটি পরিস্ফুট হয় বিশ্ব-মুসলিমদের প্রবক্তা ছিলেন আফগানিস্তানের সৈয়দ জামালউদ্দীন (১৮৩৮-৯৭)। তিনি ইরাকে-লেখাপড়া করেন। তার রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে ছিল তুরস্ক। তুরস্কের সুলতান মুসলিম বিশ্বে-'খলিফাতুল মোসলেমীন' বা আধ্যাত্মিক প্রতিনিধির মর্যাদা পেতেন। জামালাউদ্দীন আফগানী খলিফাতুল মোসলেমীনের সূত্র ধরেই বিশ্ব মুসলিমবাদের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি একাধিক বার ভারত ভ্রমন করেন। তিনি ১৮৮০-৮২ সালে কলকাতায় অবস্থান করেন এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। সৈয়দ আমীর আলী এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এলবার্ট হলে তার বৃক্ততার ব্যবস্থা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ভ্রমন করে তার ধারনা হয়েছিল যে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলো বিশ্বাস করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেরূপ প্রবল হয়ে উঠেছে, তাতে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে ক্ষুদ্র ও দুর্বল মুসলিম রষ্ট্রগুলোর সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। এজন্য তিনি ইসলামের সৌভ্রাতৃত্বের নীতিতে বিশ্ব-মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যসূত্রে বাধার চিন্তা করেছিলেন। এক আল্লাহ, এক রসূল, এক কোরানের বাণী প্রচার করে তিনি ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীক সীমানা অতিক্রম করে মুসলমানদের একতা ও সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এটাই ছিল প্যান-ইসলামের ভাবাদেশ। খলিফাতুল মোসলেমীনের আদর্শ ধর্মীয় প্যান-ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি রাজনৈতিক। স্বয়ং আমীর আলী এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাংলার অনেক লেখক ও এই আফগানীর সাক্ষাৎ ভাবশিষ্য ছিলেন। তার সমাজ ও সংস্কারক (১৮৮৯) গ্রন্থখানি, প্যান-ইসলামী ভাবদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়। ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন। প্রচারক পরিত্রকায় (পৌষ ১৩০৭) সম্পাদক মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ বলেছেন, "সমাজ ও সংস্কারকের প্রচারে বঙ্গের অধিকংশ মুসলমান নবজীবন লাভ করেছে, স্বার্থ বলিদান করতে শিখেয়েছে এবং কার্মক্ষম হয়েছে। মোহাম্মদ মেয়াবাজুদ্দীন আহমদ মনিরুজ্জচমান ইসলামাবাদী,

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ লেখক ও প্যান-ইসলামি ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের রচনায় আরব-ইরান-তুরস্ক- আফগানিস্তানের গৌরব যুগের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিবরণ বেশী স্থান পেয়েছে। সৈয়দ আমীর আরী প্রথম এদিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধে ও গ্রন্থে তাঁর স্বাক্ষর আছে।

১৮৭৭ সালে রুশ তুরস্ক যুদ্দ হয়। তখন তুরস্কের সিংহাসনে আবদুল হামিদ খান (১৮৪২-১৯১৮) অধিষ্ঠিত ছিলেন। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সার্ভিয়া, তুর্কী সুলতানের অধীনে ছিল। এগুলো আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুললে রাশিয়া, ফ্রান্স ইত্যালি ও ইংল্যাণ্ড চতুঃশক্তি তাদের মদদ জোগায়। আবদুল হামিদ খানের শাসন-সংস্কারেও (১৮৭৬) সন্তুষ্ট না হয়ে রাশিয়া সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে। এ সময় ইংল্যাণ্ড সুলতানের এশিয়ার রাজ্যগুলোকে আশ্রিত রাজ্য (Protectorate states) হিসেবে ঘোষনা করে।

অনেকে আহত হয় ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তুরস্কের এরূপ ক্ষয়ক্ষতিতে ভারতে মুসলমানরা মর্মাহত হয়, তারা যুদ্ধাহত ও ক্ষতিগ্রস্থ তুর্কীদের সাহায্যের জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করে দান হিসেবে সেখানে প্রেরণ করে। কলকাতায় মহামদি আখবার নামে একটি বহুভাষী পত্রিকা (৪ জুন ১৯৭৭) যুদ্ধের কথা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ও তাদের সহানুভুতি উদ্রেক করার উদ্দেশ্যেই জন্ম লাভ করে। তুর্কি মুসলমানেরা ঈমানকে জান হইতে অধিক জানে। এই বিপদ টালিবার জন্য জোরু, লাড়কা, জানমাল শুদ্ধা খোদার রাহে দিতে আছে। হাজার ও হাসপাতালে কতোকতো জখমি পড়ে আছে, হাজারও আওরত খবর নিতে টাকা পাঠাও। আমি 'দারুল খেলাফত' নামক তুর্কি পত্রিকায় দেখেছি এবং কর্ণেল লিস সাহেবের পত্রে জানেছি যে, তুর্কির প্রতি ইংল্যাণ্ডের ধনী প্রজারা অনেক মমদ করেছেন, আর চাদা কমিটিও স্থাপিত করেছেন যাহাতে সরকার কোন বাধা দেননি।

রুশ-তুর্কীর যুদ্ধকে ঐ পত্রিকা মুসলমানদের জন্য জেহাদ বলে উল্লেখ করেছেন, জেহাদে অংশগ্রহন করা মুসলমান মাত্রেরই পুন্যের কাজ। ঐ পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ঢাকার নববা খাজা আবদুল গণি এবং নববা আহসাউল্লাহ ২০ হাজার টাকা, নবাব

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল লতিফ মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা, সৈয়দ আমীর আলী ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ৫৭৮৩ টাকা তুরস্কের প্রেরণ করেন। বোম্বাই-এ তুরস্কেরে বাজদূত হোসেন হাবিবর আফেন্দীর মাধ্যমে ভূপালের বেগম ২ লক্ষ ২ হাজার টাকা প্রেরণ করেন।[১০১]

আবদুল লতিফ আত্মজীবনীতে (মাই পাবলিক লাইফ) লিখেছেন যে, তুর্কী-সার্ভিয়ার যুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সহানুভুতি সুলতান ও তুরস্কের জনগণের প্রতি পুরামাত্রায় ছিল। তিনি বাংলা সরকারের অনুমতি নিয়ে ১৮৭৭ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে কলকাতার টাউন হলে সভা করেন। এতে একটি সাহায্য তহবিল গঠনের এবং তুরস্কের সুলতানকে রানী ভিক্টোরিয়া যাতে সহযোগিতা করেন সেজন্য তার নিকট একটি স্মারকপত্র প্রেরণের প্রস্তাব নেওয়া হয়।[১০২] 'দি ইংলিশম্যান' (৯ অক্টোবর ১৯৭৭) ঐ সভায় বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, এত বড় সভা কলকাতা শহরে বা অন্যত্র হয়নি; আমীর থেকে মজদুর পর্যন্ত বহু লোক সমবেত হয়। আবদুল লতিফ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বেং উর্দুতে বক্তৃতা দেন। তিনি রুমের সাথে বিট্রিশ সরকারে মিত্রতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এটি রাজনৈতিক যুদ্ধ, জেহাদ নয়। ঐ পত্রিকা এই সভাকে মুসলমানদের পক্ষে অন্যতম রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মন্তব্য করেন।[১০৩] আবদুল লতিফ বলেছেন, তাঁর এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তুর্কীর সুলতান প্রতিদানে তাকে 'মুজিদী' উপাধি দেন।[১০৪] মহাম্মদি আখবার এক সংখ্যায় (২৩ জুলাই ১৮৭৭) বলেছে যে, ঐ সময় হিন্দুরা রুশ মৈত্রীর প্রতি কটাক্ষ করেছে। তবে উদারপন্থী নেতরা বাঙালি মুসলমানদের সমর্থন দিয়েছেন। দি বেঙ্গলির সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-৯৪) পূর্বোক্ত সভা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আবদুল লতিফকে সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধের সময় মুসলমানরা মসজিদে মসজিদে বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করে।[১০৫] তুর্কীর প্রতি এই সহানুভুতির রেশ দীর্ঘদিন চলে। ১৯০০ সালে 'দামেস্ক হেজাজ রেলওয়ে' নির্মানের সময় চাঁদা সংগ্রহের আন্দোলন হয়। এ উদ্দেশ্য কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও

Dhaka University Institutional Repository

সভাসমিতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তুরস্কের প্রেরণ করা হয়।[১০৬] তুর্কীর সুলতানের সিংহাসন আরোহনের রৌপ্য জুবিলী উৎস' (১৯০০) খুব উৎসাহের সাথে পালিত হয়। এসবই বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনার ফল। বাঙালি মুসলমানের আত্ম-পরিচয় ও 'মুসলিম জাতীয়তা'র গঠনে এসবের প্রভাব পড়েছে।

মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদঃ

হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় জাতীয়তা দেখা দেওয়ায় বাংলার মুসলমানগণ ক্রমশ তাদের নিকট হতে দূরে সরে যায়। মুসলমানগণ নিজেদের ধর্ম এবং অতীত ইতিহাস ও কৃষ্টির ভিত্তিতে জাতীয় জীবন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আলেমগণ অমুসলমান সমাজে মুসলিম জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে প্রয়াস পান। তাঁদের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) আন্দোলন শুরু হয়। মুসলমান জিহাদীদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল না। এতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পৃথক রাজনৈতিক জীবন নির্দেশিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিবিধ সমিতি স্থাপন করে বাংলার হিন্দুগণ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। বাংলার মুসলমানেরা অনুন্নত অবস্থায় থেকে যায়। কয়েকজন চিন্তাশীল মুসলমান নেতা অনুন্নত মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ও ১৮৭৭ সালে কলকাতায় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় হতে হিন্দুদের মত মুসলমানগণ পৃথক সমিতি ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছিল। মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আব্দুল লতিফ রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। মুসলমানদের মনে রাজভক্তি সঞ্চার করা এবং তাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসার করে তাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা তাঁর সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। কলকাতায়-'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল

Dhaka University Institutional Repository

মহোমেডান এসোসিয়েশন' বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষা প্রসার করে ও তাদের রাজনৈতিক জীবন সুসংগঠিত করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আমীর আলীর লক্ষ্য ছিল। তিনি (সৈয়দ আমীর আলী) বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং তিনিই সর্ব প্রথম তাঁর বক্তৃতায় ও লেখায় এদেরকে একটি "জাতি (Nationality, nation) নামে অভিহিত করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে মিউনিসিপ্যালিটি বিলে তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন।[১০৭] বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদের অন্যতম সদস্য মুহম্মদ ইউসুফও অনুরূপ দাবী জানান। তিনি মনোনয়ন প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "মুসলমানদের জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করে নির্বাচনের ব্যবস্থা হলে তাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবী মিটতে পারে।"[১০৮] সৈয়দ আহমদ খান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য রূপে (১৮৭৮-৮৩) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের জন্য পৃথক মনোনয়ন প্রথা প্রচলনের উপর জোর দেন।[১০৯]

বাংলা ভাষা বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান সকলের মাতৃভাষা এবং বাংলা সাহিত্য এদের সাধারণ কৃষ্টির অন্যতম। কিন্তু বাংলাভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁদের ধর্মীয় কৃষ্টি অনুসরণ করেন। মুসলমান সাহিত্যিকেরা ও সেরূপ তাঁদের রচনায় মুসলিম কৃষ্টি বজায় রেখে চলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমান সমাজে যে সব সাময়িক প্রত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও মুসলিম কৃষ্টি ও বিষয়বস্তু প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর ফলে হিন্দুদের ভাবধারা ও মুসলমানদের চিন্তাধারার মধ্যে বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই সময় শিক্ষিত মুসলমানগণ কয়েকটি সাহিত্য সমিতি গঠন এবং এদের মাধ্যমে মুসলমানদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হন। ১৮৮৩ সালে ঢাকা শহরে ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সমিতি (Dhaka Mahomedan Friends Association) স্থাপিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিও এটা সজাগ ছিল। এই সমিতি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৯০ সালে রাজশাহীতে আন্‌জুমান-ই- হিমায়েতুল ইসলাম নামে একটি সাহিত্য সমিতি গঠিত হয়। মুসলমানদের অতীত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করে শিক্ষা বিষয়ে মুসলমান সমাজকে সচেতন করা এ কর্মসূচীর অন্তভুক্ত ছিল। কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররা ১৯০২ সালে মুসলিম সংসদ (Moslem Institute) নামক একটি সমিতি স্থাপন করে এবং মুসলিম সংসদ ১৯০৪ সাল হতে একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশ করে। এটা নানাভাবে মুসলমানদের মধ্যে জাগরণের বাণী প্রচার করে।[১১০]

পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্ররা মুসলিম কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে । ১৯২১ সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বাংলা অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। ঢাকায় কয়েকটি সমিতি ও সাময়িকীর আবির্ভাব হয়। ১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ স্থাপিত হয়। এটা বাৎসরিক সভার আয়োজন করত ও শিখা নামক একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করত। মুসলিম কৃষ্টির ভিত্তিতে মুসলমানদের সমাজ জীবন সুগঠিত করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সমিতির সভাপতি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক সভায় বলেন, "হিন্দু সাহিত্য বেদান্ত, গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও জীবনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আমাদের সাহিত্য কুরআন, হাদীস,মুসলিম ইতিহাস ও জীবনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। হিন্দু সাহিত্য হিন্দু সমাজ জীবনের অনুভূতি গ্রহণ করে। এইরূপ সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানরা একে অন্যকে জানতে পারবে। জানাজানির মধ্য দিয়ে ভালবাসা গড়ে উঠবে।"[১১১]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাতে এই দুই সম্প্রদায়ের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। দুইটি কারণে গর্ভণর জেনারেল লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ বিভক্ত করেছিলেন। একটি শাসনতান্ত্রিক কারণ ও অন্যটি রাজনৈতিক কারণ। বঙ্গদেশটি খুব বড় প্রদেশ ছিল। বাংলা বিহার ও

Dhaka University Institutional Repository

উড়িষ্যা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন ছোটলাটের পক্ষে রাজধানী কলকাতা হতে এত বড় বিস্তৃর্ণ প্রদেশ শাসন করতে অসুবিধা হত। যাতায়াতের ভাল সুবিধা না থাকায় প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রতি ছোটলাট দৃষ্টি দিতে পারতেন না। সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্যে ও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের উন্নতির বন্দোবস্তের জন্য লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুইটি প্রদেশে ভাগ করেন। ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী (দার্জিলিং ব্যতীত) বিভাগ ও আসাম নিয়ে একটি প্রদেশ গঠিত হয় এবং এর নাম রাখা হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম। এই নতুন প্রদেশের রাজধানী হয়েছিল ঢাকায়। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার বঙ্গদেশ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে।[১১২] এই বিভাগের পিছনে রাজনৈতিক কারণও কিছুটা কাজ করেছিল। সেই সময় ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং এই জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ । বাঙ্গালী বিশেষত: বাঙ্গালী হিন্দুগণ এই জাতীয়তাবাদের অগ্রণী ছিল। লর্ড কার্জন এই নতুন জাতীয়তাবাদ শক্তির মধ্যে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের বিপদ দেখতে পান। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শক্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন । বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার দরুন বাঙ্গালী জাতিও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থার উন্নতির সুযোগ হয়। এই জন্য মুসলমানগণ লর্ড কার্জনের শাসন ব্যবস্থাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে। কিন্তু হিন্দুগণ এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানায়। তারা মনে করে যে, বাঙ্গালী জাতিকে দুর্বল করা জন্য এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে। তারা সারাদেশ ব্যাপী তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রবাসে থেকেও সৈয়দ অমীর আলী, নবাব সলিমুল্লাহ ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতাদের প্রবল আন্দোলনের সমালোচনা করেন। বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং এদের সাম্প্রদায়িক পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠে।[১১৩]

Dhaka University Institutional Repository

লণ্ডন মুসলিম লীগ ঃ

সৈয়দ আমীর আলী বিলেতে ১৯০৪ সালে যখন স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তখন তিনি বিলেতে ভারতীয় মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ফলে তাঁর উদ্যোগে লণ্ডনে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের লণ্ডন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালের ৬ মে কেক্সটন হলে এক সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে এই শাখা স্থাপিত হয়। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বপ্রীতি ও সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা এর উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সৈয়দ আমীর আলী বলেন যে, কয়েকটি বিষয়ে যেমন ভারতীয়দেরকে অধিক সংখ্যায় শাসনকার্যে নিয়োগ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ এক সূত্রে গাঁথা আছে এবং এমন কয়েকটি বিষয় আছে যা শুধু মুসলমানদের স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি প্রকাশ করেন যে, মুসলমানগণ অন্য জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে না, তবে তারা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অন্য জাতীয় লোকদের সাথে সহযোগিতা রক্ষা করে চলবে।[১১৪]

স্বতন্ত্র নির্বাচন ঃ

লণ্ডন মুসলিম লীগ ভারতে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সৈয়দ আমীর আলী বলেন যে, "লর্ড মর্লি যখন ভারতীয় শাসন সংস্কার পরিকল্পনা ঘোষনা করেন তখন যে তুমুল তর্কবিতর্কের সূচনা হয় তা হতে প্রমাণিত হয় যে, সেই সময় মুসলমানদের জন্য এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক ছিল"। লর্ড মর্লি তাঁর শাসন সংস্কার পরিকল্পনায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের নীতি স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তাদের জন্য স্বতন্ত্র-নির্বাচণ প্রথার ব্যবস্থা করেননি। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আসন নির্দিষ্ট করে দেন। ব্যবস্থা হয় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নিয়ে একটি মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী, (Mixed Electoral

Dhaka University Institutional Repository

College) গঠিত হবে এবং এই নির্বাচক মণ্ডলী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট আসনগুলোর জন্য সদস্য মনোনয়ন করবে।

১৯০৮ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগ অমৃতসর অধিবেশনে 'মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী' ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে, কারণ এই ব্যবস্থার ফলে কেবল হিন্দু ঘেষা মুসলমানদের পক্ষেই নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মুসলিম লীগ ব্যবস্থাপক পরিষদগুলোর জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা দাবী করে। এ সত্ত্বেও লর্ড মর্লির পরিকল্পনা পরিবর্তিত হয়নি এবং পার্লামেন্টে এর আলোচনা চলতে থাকে। এই সময় সৈয়দ আমীর আলী ও লণ্ডন মুসলিম লীগের আন্দোলনের প্রভাবে লর্ড মর্লি তাঁর পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা অন্ত র্ভুক্ত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন।

মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী ব্যবস্থার সমালোচনা করে সৈয়দ আমীর আলী লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় একটি চিঠির মাধ্যমে (জানুয়ারী ১৯০৯) জোরের সাথে প্রকাশ করেছিলেন যে, মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা অপরিহার্য। এর ফলে ভারত সচিবের কার্যালয়ে আলোড়নের সঞ্চার হয়। লর্ড মর্লি ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা আলোচনার জন্য সৈয়দ আমীর আলীকে আমন্ত্রণ করেন। এরপর ও তিনি নিশ্চুপ হয়ে থাকেন নি। তিনি লণ্ডন মুসলিম লীগের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ২৭ জানুয়ারী ভারত সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী করে তাঁর নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। সৈয়দ আমীর আলী ভারত সরকারের ১৯০৭ সালের ২৪ আগস্টের সার্কুলার পত্রের এবং ১৯০৮ সালের ১ অক্টোবর ভারত সচিবকে প্রেরিত এক চিঠির উল্লেখ করে বলেন যে, প্রচলিত নির্বাচন প্রথায় খুব অল্প সংখ্যক মুসলমান নির্বাচিত হতে পেরেছে এবং ব্যবস্থাপক পরিষদ ও স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিটিতে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯০৮ সালের ২৭ নভেম্বর ভারত সচিব তাঁর চিঠিতে ভারত সরকারের সাথে একমত হন যে, সম্প্রসারিত ব্যবস্থাপক পরিষদগুলোতে মুসলমানদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। তিনি প্রকাশ করেন যে, মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে সংখ্যা লঘিষ্ঠদের

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থ বিপন্ন হবে, কারণ এই প্রথায় কেবল হিন্দুদের মনোনীত মুসলমানগণ নির্বাচিত হবে। সৈয়দ আমীর আলী দাবী করেন যে, ভারতের ৫ কোটি ৫৩ লক্ষ মুসলমান তাদের ধর্ম, ঐতিহ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র জাতি (Nationality) । হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন যে, এক সম্প্রদায়ের লোকের জন্য যা ধর্মের অঙ্গ;অন্য সম্প্রদায়ের লোকের জন্য তা পরিত্যাজ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যের স্পর্শ এবং এমনকি অন্যের ছায়া ধর্মকে কলুষিত করে। উপসংহারে সৈয়দ আমীর আলী আবেদন করেন যে, আমার লোকেরা যে নির্বাচন প্রথায় পর্যাপ্ত ও কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব পাবেনা সেই রূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হবে না।

সৈয়দ আমীর আলীর বিশ্লেষণের ফলে লর্ড মর্লি স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং তিনি আশ্বাস দেন যে শাসন সংস্কার পরিকল্পনায় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকবে।

সৈয়দ আমীর আলী যাতে মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী ব্যবস্থার বিরোধিতা হতে বিরত থাকেন সেজন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি তার দিন পঞ্জিকায় লিখেছিলেন যে, বড়লাট তার শাসন পরিষদের মুসলিম সদস্যদেরকে এই উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁর মত পরিবর্তন করতে সম্মত হননি, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, মিশ্র নির্বাচক মণ্ডলী ব্যবস্থায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে এবং তাদের অস্তিত্বের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার একান্ত প্রয়োজন।[১১৫]

সৈয়দ আমীর আলী মিশ্র নির্বাচন মণ্ডলী ব্যবস্থার বিরোধিতায় অটল থাকায় ১৯০৯ সালের শাসন সংস্কার পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্থান করা হয়। স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা স্বীকৃতি লাভ করে। এতে তাদের রাজনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হয়। ন্যায়তঃ স্বীকার করতে হয় যে, স্বতন্ত্র নির্বাচন ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবীর স্বীকৃতি তাঁর (সৈয়দ আমীর আলীর) প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য রূপে তিনি (সৈয়দ আমীর আলীর) তাঁর সাধ্যমত

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের স্বার্থের জন্য চেষ্টা করেন। ১৮৮৩ সালের ইলবার্ট বিল ও ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব বিল (Bengal Tenancy Bill) প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রজাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। তিনি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী সাময়ীকিতে বাংলার ভূমি সমস্যা (Land Problem of Bengal) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে প্রজাদের দুর্দশার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১১৬] ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিতে নিয়োগের জন্য তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষকে সম্মত করাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি। তাঁর আরব্ধ কাজ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্পন্ন করেন। জিন্নাহ এর চেষ্টায় ১৯১৩ সালে ওয়াকফ বিল পাশ হয় এবং ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের শিক্ষা কার্যে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।[১১৭]

মুসলিম রেণেসাঁ ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের রেণেসাঁ বা পুর্নজাগরণের জন্য সৈয়দ আমীর আলী জীবনব্যাপী সাধনা করেন। মুসলমানদের গৌরবময় অতীতের ইতিহাস,কৃষ্টি ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে তিনি তাদের যে মহা উপকার করেছেন সেইজন্য তারা (মুসলমানগণ) তাঁর নিকট চির ঋণী থাকবে। তিনি বুঝেছিলেন যে, নিজেদের ইতিহাস ও কৃষ্টি সম্বন্ধে না জানার দরুণ মুসলমানগণ অনুন্নত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিজেদের অতীত ঐতিহ্য ভুলে গিয়েছে বলে তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক জীবনে উদাসীন হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের অতীত ইতিহাস ও কৃষ্টির পুনরুদ্ধার করে তিনি তাদের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনজর্ন্ম ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ আনতে চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানগণ তাদের অতীত ইতিহাস ও কীর্তি হতে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা পাবে এবং তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জ্ঞান ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে।[১১৮]

এ কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানদের রেণেসাঁ বা পুর্নজাগরণের জন্য ভারতের অন্যান্য মুসলমান নেতাদের অপেক্ষা সৈয়দ আমীর আলীর অবদান অনেক বেশী মূল্যবান ও ফলপ্রসূ ছিল। ইসলাম যে মণীষা বিকাশের শক্তিরূপে বিরাট ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেছিল, সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তাতে তিনি গৌরব অনুভব করতেন। তাঁর ইসলাম সম্বন্ধে প্রকাশভঙ্গি ছিল চমৎকার, অনুপ্রেরণা-মূলক ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী দুনিয়ার সর্বত্র ও সকল মতের মুসলমানদের প্রশংসা অর্জন করে। সৈয়দ আহমদ খানও ইসলাম সম্বন্ধে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখে মুসলমানদের পুনর্জাগরণের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর ইসলাম সম্বন্ধে প্রকাশভঙ্গি সৈয়দ আমীর আলী হতে পৃথক ছিল। সৈয়দ আহমদ বলেছেন যে, ' ইসলাম প্রগতি বিরোধী নয়'। অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী প্রকাশ করেছেন, 'ইসলাম প্রগতিশীল'। সৈয়দ আহমদ কৈফিয়তের সুরে লিখেছেন যে, ইসলাম সম্মানিত ধর্ম এবং এটাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তিনি তাঁর লেখায় অনাবশ্যক ভাবে ধর্ম শাস্ত্রের আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে পড়ে তিনি ইসলামের ধর্মশাস্ত্র যুক্তিতর্কের দ্বারা সমালোচনা করেছেন এবং শাস্ত্রকারদের যে সকল আইন (Canon Law) যুক্তি ও প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলে মনে করেছেন সেগুলো তিনি বর্জন করেছেন। এইভাবে যুক্তি ও প্রকৃতি প্রয়োগ করে সৈয়দ আহমদ ধর্ম বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কুরআন ব্যতীত অন্য সবকিছু অগ্রাহ্য করেছেন। আলীগড় নেতার এই সকল ভাবধারায় গোড়া মুসলমান সমাজ তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠে এবং তাঁর সমালোচকেরা তাঁকে অবজ্ঞাভরে নেচারী (Naturalist) আখ্যায় অভিহিত করেন, কারণ তিনি আল্লাহর কালামকে আল্লাহর সৃষ্ট দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। সৈয়দ আমীর আলী এইরূপ অনাবশ্যক শাস্ত্র আলোচনা পরিহার করেছেন।

সৈয়দ আহমদ ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেননি, এতে তিনি মুসলমানদের অতীত গৌরবের প্রতি অবহেলা করেছেন।[১১৯] সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাদের কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কীর্তিসমূহ উদঘাটিত করেছেন। মুসলমানদের গৌরবময় অতীতকে তিনি তাদের পুনর্জাগরণের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুসলমান সমাজের জন্য সৈয়দ আমীর আলীর এটা মস্ত বড় দান। তাঁর ইসলাম সম্মন্ধীয় গ্রন্থাবলী ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সর্বত্র সমাদর লাভ করেছিল এবং মুসলমানদের মধ্যে অপূর্ব সাড়া

Dhaka University Institutional Repository

জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁর (সৈয়দ আমীর আলী) লিখিত ইতিহাস বহুবার পূনর্মুদ্রিত হয়ে রাজনৈতিক ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের মুসলমানদের দান সম্পদের কথা প্রচার করে এবং মুসলমানদের মনে ভবিষ্যতের জন্য আত্মবিশ্বাস ও আশার সঞ্চার করে তাদের পুনর্জাগরণের পথ উন্মুক্ত করে।

সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন । তিনিই সর্বপ্রথম এই দাবী উত্থাপন করেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানগণ একটি জাতি এবং তিনিই সর্ব প্রথম তাদেরকে জাতি (Nationality, nation) বলে আখ্যায়িত করেন। ১৮৭৭ সালে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হবার সময় হতে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্রের আন্দোলন শুরু হয় সৈয়দ আমীর আলী তাঁর বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে প্রকাশ করেন যে, গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতের সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমান অধিবাসীগণ একটি জাতি এবং ভারতে তারাই একমাত্র জাতি , যাদের মধ্যে সমতা আছে। সৈয়দ আহমদ ভারতীয় মুসলমানদেরকে 'কওম' বলে আখ্যায়িত করেন, তিনি কওম শব্দ সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহার করেন, সৈয়দ আমীর আলীর মত রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার কনেনি। তিনি (সৈয়দ আমীর আলী) লর্ড মর্লির নিকটে দাবী করেন যে , ভারতীয় মুসলমানগণ একটি রাজনৈতিক জাতি এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার প্রবর্তনে এই দাবী স্বীকৃতি পায়।

সৈয়দ আমীর আলীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইসলাম একটি মহান ধর্ম এবং তিনি পৃথিবীর সমস্ত দেশের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।[১২০] ১৮৮০ সালে পারস্যের সৈদয় জামালউদ্দীন আফগানীর সাথে কলকাতার সৈয়দ আমীর আলী ও নবাব আবদুল লতিফের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরা উভয়েই আফগানীর প্যান-ইসলামী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং এদেশে খিলাফত আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে।[১২১] যদি ও তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, তবুও তিনি খিলাফতকে মুসলমানদের একটি প্রতীক বলে মনে করতেন এবং তিনি ১৯১১-১৩ সালে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অভিসন্ধির বিরুদ্ধে খিলাফতের

Dhaka University Institutional Repository

সংহতি বজায় রাখতে প্রচারকার্য চালিয়ে যান।[১২২] তুর্কীরা যখন ত্রিপোলী এবং বলকান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তখন তিনিই সর্ব প্রথম তাঁদের তরফ থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সহানুভূতির আবেদন পেশ করেন। তাছাড়া মুসলিম সৈনিকদের চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে তিনি রেডক্রস সোসাইটির অনুকরণে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির (হেলাল-এ আহমর) গড়ে তোলেন। তিনি নিজে যদিও শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন বটে, তথাপি তাঁর সারা জীবনের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কাজ কর্মের উদ্দেশ্যই ছিল মাযহাবের কোন বাছ-বিচার না করে সমস্ত মুসলমানদের উন্নতি সাধনের জন্য একনিষ্টভাবে চেষ্টা করে যাওয়া। সুন্নী মতালম্বী তুর্কীদের সমর্থনের এবং খিলাফতের অনুকূলে কলম ধরার ব্যাপারে তাঁর দান অজস্র । ইতিহাস সংক্রান্ত লেখাগুলোতেও তিনি হযরত আলী (রা:) এর তুলনায় হযরত আবুবকর (রা:) ও হযরত ওমর (রা) কে খাটো করে দেখাননি। যখন কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে রাজপদ ও খিলাফত উঠিয়ে দিতে দৃঢ় সংকল্প হন তখন মাননীয় আগাখান এবং সৈয়দ আমীর আলী এ দুজনেই ইসমত পাশার নিকট এক পত্রে তাঁকে অনুরোধ করেন যাতে মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক খিলাফতের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়।[১২৩]

মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রণীরূপে এবং মুসলমানদের ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও তাদের পুনর্জাগরণের জন্য সৈয়দ আমীর আলী যে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তা তাঁকে মুসলমান সমাজে চির স্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি মুসলমানদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে এর ফল সুদূর প্রসারী হয় [১২৪]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ

পেশাগতভাবে অর্থনীতিবিদ না হয়েও ভারতবাসীদের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি ভারতীয়দের উপর অকারণ করভার আরোপ, যুদ্ধকর ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং এগুলোর অযৌক্তিকতা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত উপায়ে

Dhaka University Institutional Repository

সরকারকে অবহিত করেছেন। তাছাড়া ব্যাংকের দেউলিয়া প্রাপ্তি মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি বিষয়েও অনেক উপদেশমূলক বক্তব্য রেখেছেন। ১৮৮৫ সালের প্রজাসত্ব বিল প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি নাইনটিনথ সেঞ্চুরী সাময়িকীতে বাংলার ভূমি সমস্যা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে প্রজাদের দুর্দশার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১২৫]

বিচার ক্ষেত্রে ঃ

ব্রিটিশ ভারতের তখনকার দিনে সবেদার সেনাপতির পদ তো দূরের কথা, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটসটিও ভারতবাসীর জন্য স্বপ্নের বিষয় ছিল। কিন্তু ১৮৯০ সালে স্যার রমেশচন্দ্রের মিত্রের পর সৈয়দ আমীর আলী যখন হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন তখন মুসলমান সমাজ আনন্দে উদ্দেলিত হয়ে উঠে। কারণ সেই সময় তাঁর পূর্বে একজন মাত্র মুসলমান এ ধরণের উচ্চপদে সমাসীন হয়েছেন। আর তিনি ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদের পুত্র জাষ্টিস সৈয়দ মাহমুদ। ব্যারিষ্টারীতে, আইন অধ্যাপনায়, ব্যবস্থা পরিষদে সর্বোপরি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে তিনি যে মণীষার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সত্যিই মুসলমান সমাজের মুখ উজ্জল হয়ে উঠে।

বিচার ক্ষেত্রে তিনি নিরপেক্ষতা, নির্লোভ মনোবৃত্তি, অসামান্য বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আর এমন ভাবে না থাকলে কেউ বিচারক হিসেবে সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এই কারণেই তিনি শত্রু- মিত্র, আসামী-ফরিয়াদী, সাক্ষী-ব্যারিষ্টার সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন। আর মুসলিম আইন সম্পর্কে তাঁর বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। মুসলিম আইন সম্পর্কিত জটিল সমস্যাসমূহ তিনি সহজেই মীমাংসা করে দিয়েছেন। যখনই কোন ব্যাপার নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে তখনই হাইকোর্টের বিচারকগণ তাঁর (সৈয়দ আমীর আলী) শরণাপন্ন হয়েছেন। বিচারক হিসেবে তিনি যে ভদ্র-জনোচিত মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন হাইকোর্টের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

ভারতীয় বিচার বিভাগেও তাঁর লক্ষণীয় সুপারিশ ছিল। ব্রিটিশ ভারতের মত আর কোথাও সুবিচার প্রার্থীকে এত করভার বহন করতে হতো না। তিনি বলেছেন, বিচার

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ গরীবের প্রতি ধনীদের নিপীড়নের যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এই করভার হ্রাস করবার আবেদন জানিয়েছেন। বিচারপতিদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির প্রতিও তাঁর আন্ত রিক প্রচেষ্টা ও সুপারিশ ছিল। তাছাড়া নিম্ন ও উচ্চ আদালতে মুসলিম আইনে বিচার কার্য সম্পাদন করবার জন্য মুসলমানদের মধ্যে থেকে মুসলমান বিজ্ঞ বিচারপতি রাখবার ও দাবী করেন।[১২৬]

এই দেশপ্রেমিক মহান নেতা স্যার সৈয়দ আমীর আলী শেষ জীবন অনাবিল সুখে-শান্তিতে কাটে। পরিবার, পরিজন, পরিবৃত অবস্থায় ১৯২৮ সালের ৩ আগষ্ট লণ্ডনের সাসেক্সের নিজ বাসবভনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এই মহান প্রতিভাবান পুরুষের জীবনাবসান ঘটেছিল (ইন্নালিল্লাহে.....রাজিউন)।[১২৭] ৭ আগস্ট ব্রুকউডের সমাধি ক্ষেত্রে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১২৮] তাঁর জানাজায় শরীক হয়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিগণ। এদের মধ্যে ছিলেন তাঁর পুত্র সৈয়দ ওয়ারেজ আলী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী স্যার আব্বাস আলী বেগ, স্যার দিয়াউদ্দিন আহাম্মদ, লর্ড হেডলী, ডঃ জিয়াউদ্দীন খালেদ, শেলড্রেক প্রমুখ মনীষীগণ। তাঁরা তাঁর (সৈয়দ আমীর আলী) সমাধি পাশে উপস্থিত থেকে পরলোক গত এই মহাপুরুষের জন্য শেষ প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। উকিলের ইমাম মুফ্তী আব্দুল মহী এই জানাজায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১২৯] তাঁরা (স্ত্রী ও পুত্ররা) তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাঁর 'আত্মজীবনী' যা ইসলামিক কালচার এর পাঁচটি সংখ্যার (১৯৩১-১৯৩২) প্রকাশিত হয়, তাঁর পরিবার কর্তৃক সংকলিত হয়।[১৩০]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী, এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দিকী এবং এস. এম. হুমায়ন কবির, বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৬

২. ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, প্রগুপ্ত, ১১৩

৩. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ ইতিহাস ও দর্শন, পৃ.৩৩৭

৪. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী, এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দিকী এবং এস. এম. হুমায়ন কবির, বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, পৃ. ২৬৬

৫. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), পৃ. ১৫৭

৬. ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা। পৃ. ৯৬

৭. ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী, এস. এম. মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দিকী এবং এস. এম. হুমায়ন কবির, বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড, ২৬৬-৬৭

৮. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, সমাজকল্যাণ ইতিহাস ও দর্শন, পৃ.৩৩৭

৯. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), পৃ. ১৫৭-৫৮

১০. আর. সি. মজুমদার, বেঙ্গল ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরী ৮৫-৯০

১১. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), পৃ. ১৫৯

১২. মেময়রস, প্রাগুপ্ত, ৬ খন্ড, পৃ, ১৬১

১৩. মেময়রস, অব আমীর আলী, ইসলামীক কালচার, ৫ম খন্ড, পৃ, ১৩১

১৪. মেময়রস, প্রাগুপ্ত, ৫ খন্ড, পৃ ৫৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ. ৯৬

১৬. মেময়রস, প্রাগুপ্ত, ৬ খন্ড, পৃ. ১৭১

১৭. ডবিৱউ এস ব্লবান্ট, ইন্ডিয়া আন্ডার রিপণ, পৃ. ১৭

১৮. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), পৃ. ১৬০

১৯. Tomas S. Smith Rules and objects of the central National Mahomedan Associations with the Quinquinnial and Annual Reports and list of Member, P 11

২০. শেখ এ রশিদ, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন, পৃ. ৯

২১. শেখ এ রশিদ, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন, পৃ. ২

২২. ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৪৯

২৩. ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ. ১৩১

২৪. Tomas S. Smith Rules and objects of the central National Mahomedan Associations with the Quinquinnial and Annual Reports and list of Member, P iv-ix

২৫. OP. Cit PP. 3-4

২৬. Ibid. PP. 14-15

২৭. OP. Cit PP. 5-6

২৮. The Moslem Chronical, 21 March 1895

২৯. OP. Cit PP. 6-8

Dhaka University Institutional Repository

৩০. Ibid. P. 9

৩১. Ibid. P.10

৩২. K.K. Aziz, Ameer Ali: life and works. PP 23-40

৩৩. ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ. ১৩৬

৩৪. Ram Gopal, Indian Muslims, A Political History (1858-1947), PP. 80-81

৩৫. Ibid. P.81

৩৬. Muslim Community in Bengal, PP. 225-26

৩৭. The Modern Muslim Political Elite in Bengal. P. 300

৩৮. The Moslem Chronicle, 26 December 1896

৩৯. Ibid, 29 February 1896

৪০. Ibid, 3 October 1896

৪১. ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ. ১৩৮

৪২. Indian Under Ripon- A Private Dialy.

৪৩. মীর মশাররফ হোসেন, সৎপ্রসঙ্গ; কোহিনূর, ভাদ্র ১৩৩৫

৪৪. সৈয়দ এমদাদ আলী, 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব' ইসলাম- প্রচারক, চৈত্র- বৈশাখ, ১৩০৯-১০

৪৫. Revision of the List of Associations, P.4

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ. ১৪০

৪৭. Indian Muslim: A Political History, PP. 179-80

৪৮. Muslim Community in Bengal. PP. 179-80

৪৯. Report of the Committee of the Central National Mohomedan Association for the past Five years, 15 April, 1883,P. 41

৫০. The Moslem Chronicle, 9 January 1897

৫১. Revision of the List of Associations, P.41

৫২. Revision of the List of Associations, P. 51-54

৫৩. সুধাকর, ২ চৈত্র ১২৯৬

৫৪. OP. Cit P. 56

৫৫. Revision of the List of Associations, P. 22

৫৬. Hindu- Muslim Relations in Bengal, P. 112

৫৭. The Moslem Chronicle, 30 September 1899

৫৮. Hindu- Muslim Relations in Bengal, P. 124

৫৯. Revision of the List of Associations, P. 26

৬০. The Moslem Chronicle, 14 February 1895

৬১. The Moslem Chronicle, 25 August 1900

৬২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী- প্রবন্ধ বিচিত্রা, পৃ ১৩৬-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. কাজী মোহাম্মদ মিছের- রাজশাহীর ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃ. ২১০-১১

৬৪. The Moslem Chronicle, 22 July 1899

৬৫. Revision of the List of Associations, P. 39

৬৬. The Moslem Chronicle, 25 November 1899

৬৭. Muslim Community in Bengal. PP. 39

৬৮. Khan Bahadur Abdul Majid Choudhury to Government of Bengal. 30 November 1902, Bengal Education Proceedings, September 1903

৬৯. Muslim Community in Bengal. PP. 34

৭০. The Moslem Chronicle, 2 July 1904

৭১. Ibid, 4 April 1495 (Supplementary)

৭২. Revision of the List of Associations, P. 20

৭৩. Hindu- Muslim Relations in Bengal, P. 117

৭৪. The Moslem Chronicle, 4 February 1899

৭৫. Indian Political Associations and Reform of Legislature, P. 229

৭৬. Ibid

৭৭. The Moslem Chronicle, 11 July 1896

৭৮. ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ১৮৯৪ সালের ১৫ জুন তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, লোক- সংখ্যার সমতার ভিত্তিতে শিক্ষা বিভাগের হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করা হবে, ঐ সময় নিয়োগের দায়িত্ব ছিল ডিস্ট্রিক বোর্ডের হাতে।

৭৯. The Moslem Chronicle, 11 July 1899

৮০. Ibid 7 November 1898

৮১. Ibid 19 August 1899

৮২. Ibid 23 December 1899

৮৩. Revision of the List of Associations, P. 42

৮৪. Hindu- Muslim Relations in Bengal, P. 120

৮৫. Revision of the List of Associations, P. 37

৮৬. Report of Native papers in Bengal for the week ending. 6 July 1901. P-430

৮৭. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ- সংক্ষিপ্ত মহম্মদ- চবিত, মথুরানাথ যন্ত্র, পৃ. ১৯১

৮৮. রামগোপাল, ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃ, ৫৩-৫৭, ৮০-৮১

৮৯. কুরেশী, হিস্টরী অব পাকিস্তান ৪র্থ খন্ড, ১৫৫

৯০. রামগোপাল, ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃ, ৮১-৮২

৯১. নাইনটিনথ সেঞ্চুরী, আগষ্ট ১৯০৬, পৃ. ২৫৪-৫৮

৯২-৯৫ এস. আর. ওয়াসতী, মুসলিম লীগ, পাকিস্তান হিস্টরী সোসাইটি জার্নাল, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪৩-৪৮

৯৬. Government Circular No. 588 42 T.G. Darjeeling, 15th September, 1897; The Moslem Chronicle, 16 July 1898.

৯৭. নবনূর, আষাঢ় ১৩১২, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

৯৮. The Statesmen And Friend of India. 25 December 1886

৯৯. Ibid. 19 December 1886

১০০. মুজিবর রহমান (অনূদিত)- স্যার সৈয়দ আহমদ, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ৩০৬-৩৯

১০১. Hindu-Muslim Relations in Bengla, pp. 116

১০২. Ibid., pp. 117, 123

১০৩. আবদুল কাদির- 'মহাম্মদি আখবার', মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পৃ. ২২

১০৪. Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and related Documents, p. 176

১০৫. Op. cit, P. 185 (Appendix).

১০৬. Ibid, p. 177

১০৭. Nirmal Sinha—Freedom Movement in Bengal (1818—1905), Calcutta. 1968,p, 260

১০৮. C.E. Buckland—Bengal under the Lietenant Gorernors, Vol. 11, 1901, p. 661

১০৯. শেখ এ রশিদ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেহান এসোসিয়েশন, ২-৯

১১০. মজুমদার- ১০২

১১১. আই সাইমন্ডস, মেকিং অব পাকিস্তান, ৩৮

১১২. এম,এ খান, মুসলিম মজর্নিজম প্রবন্ধ, ১৫-১৮

১১৩. মান্নান, ২৬৬-৬৯, দানী, ১২১, ১৪২-৪৮।

১১৪. হামিদ, মুসলিম সেপারটজম, ৬৯-৭০,

১১৫. মল্লিক, পার্টিশন অব বেঙ্গল ১৯০৫, হিষ্টরী অব স্ট্রীডম মুভমেন্ট, ৩য় খ: ভা: ১৩ জেড এইচ জায়দী, প্রাগুপ্ত, ১৪৪-৪৬।

১১৬. হামিদ, মুসলিম সেপারাটিজম ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১১৭. মেময়রস, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫ ওয়াসতী, লন্ডন ব্রাঞ্চ মুসলিম লীগ, রিসার্স সোসাইটি জার্নাল, লাহোর, ১৯৬৫, পৃঃ ২৯

১১৮. মেময়রস, প্রাগুপ্ত, ১৬৩,১৬৯, পি,ই রবার্টস, প্রাগুপ্ত, ৪৯৪-৯৯

১১৯. মেময়রস, ১-১৫, ১৩১, ৩৭৫-৭৭। ইমিনেন্ট মুসলমান প্রাগুপ্ত। ১৩১

১২০. স্পিরিট অব ইসলাম (৫ম সংস্করন) ভূমিকা ১, পৃঃ ১১৮-৫৮, ১৬৫, ২৬৫, ২৬৭

১২১. ডব্লিউ সি স্মিথ, প্রাগুপ্ত, ২০, ৪৯-৫১

১২২. কে কে আজিজ পৃঃ ৭১

১২৩. দ্য স্পিরিট অব Islam পৃ,২

১২৪. কে , কে , আজিজ পৃঃ ২৭৯

১২৫. উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, প্রকাশ ১৯৮৫, পৃঃ ১৯

১২৬. কে, কে, আযিজ, পৃঃ ৬৮

১২৭. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, এম, এ রহিম]

১২৮. উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীর ব্যক্তিত্ব ইয়াসমিন আহমেদ পৃঃ ৬৯

১২৯. উন্নত জীবন গ্রন্থমালা-১ এর অনুমোদিত শিরোনাম সৈয়দ আমীর আলী, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ পৃঃ ২৮, ৩১, ৪৮

১৩০. বাংলা পিডিয়া, ১০ম খন্ড বাংলাদেশ এশিয়টিক সোসাইটি পৃঃ ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

সৈয়দ আমীর আলীর গ্রন্থসমুহের পর্যালোচনা;

(ক) লাইফ এন্ড টিচিং অব দি প্রফেট

(খ) দ্য স্পিরিট অব ইসলাম

(গ) এ সর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিনস

(ঘ) ইসলামিক হিস্টরী এন্ড কালচার

(ঙ) খ্রীশ্চীয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামীক সেন্ড পয়েন্ট

(চ) ইসলাম

(ছ) লিগাল স্টেটাস অব ওইমিন ইন ইসলাম

(জ) মোহামেডান ল

(ঝ) পারসোন্যাল ল অব দি মোহামেডান

(ঞ) কমেন্টারী অব দি ইন্ডিয়ান এভিডেন্স

(ট) কমেন্টারী অব দি সিভিল প্রোসেডিউর কোড

(ঠ) আইন-উল-হিয়াদা

(ড) জিহাদ ও

(ণ) কমেন্টারী অব দি বেঙ্গল টেনান্সী এ্যাক্ট

(ত) তথ্য নির্দেশ

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলীর গ্রন্থসমুহের পর্যালোচনা ঃ

সৈয়দ আমীর আলীর শ্রেষ্ঠ অবদান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, বরং তার প্রধান প্রকাশনাবলীর দৃঢ় প্রত্যয়ী ফলাফলে নিহিত ছিল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে ইসলামের স্বর্ণযুগের প্রশংসা করা হয়েছে এবং উপনিবেশবাদ ও পাশ্চাত্যায়নের ফলে উদ্ভূত কতিপয় পরিবর্তনের সাথে মুসলমানদের আপোষ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়েছে। ইসলামের অর্জন সমূহকে চোখের সামনে তুলে ধরা ও অন্যান্য সংস্কৃতি সমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে নিন্দা করা উভয় ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রমাণাদিতে যদি আইনজিবীদের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে এই ধরনের মুসলিম আত্মসম্মানের ভিত্তি অবশ্যই সেই সময়ে প্রয়োজনীয় ছিল। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল মনোভাব তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় অবদান সমূহের অন্যতম।এই সকল ব্যাপারে তাঁর নেতৃত্ব ইসলামী আধুনিকতাবাদীদের প্রশংসা অর্জন করলেও বাঙালি সাধারণ জনগণের বিষয়ে তাঁর উদাসিনতা অন্যান্যদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে ১৮৭০ সালের জটিল সময়ে, যখন মুসলিম মুখপাত্রদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম, তখন ইসলামের ইতিহাস ও সমাজ সর্ম্পকে ত্রুটিপূর্ণ অথবা কুসংস্কারপূর্ণ পশ্চিমা সমালোচনার ব্যাপারে তিনি বলিষ্ঠ ভাবে প্রতিবাদ করেন।[১]

সৈয়দ আমীর আলী শুধু একজন চিন্তাশীল দার্শনিক ও সংস্কারকই ছিলেন না। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং সার্থক লেখকও ছিলেন।[২] তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানগণ তাদের অতীত ইতিহাস ও কীর্তি হতে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবে এবং তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জ্ঞান ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। এই মহান ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকখানি পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন ।[৩] তাই বলা হয় যে, বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলীর চেয়ে লেখক সৈয়দ আমীর আলীর স্থান অনেক উঁচুতে। মহসীন ফাণ্ডের মতোওয়াল্লী কেরামত আলী সাহেবের একটি উর্দু পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁরপর ইংল্যাণ্ডে আইন অধ্যয়নকালে 'A critical Examination of the life Teaching of

Dhaka University Institutional Repository

Mohammad' নামক প্রবন্ধ রচনা করে তিনি সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হয়েছেন।[৪] তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই ইংরেজিতে রচিত। তবে দু একটি উর্দু গ্রন্থ ও রয়েছে।[৫] নিম্নে তাঁর গ্রন্থ গুলোর নাম তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো:-

১। লাইফ এণ্ড টিচিং অব দি প্রফেট (১৮৭৩)

২। দ্য স্পিরিট অব ইসলাম (১৮৯১)

৩। এ সর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিনস (১৮৯৮)

৪। ইসলামিক হিস্টিরী এণ্ড কালচার

৫। খ্রীশ্চীয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামিক স্টেণ্ড পয়েন্ট (১৯০৬)

৬। ইসলাম

৭। লিগাল স্টেটাস অব ওইমিন ইন ইসলাম (১৮৯১)

৮। মোহামেডান ল (১৮৮৪)

৯। পারসোন্যাল ল অব দি মোহামেডান (১৮৮০)

১০। কমেন্টারী অব দি ইণ্ডয়ান এভিডেন্স

১১। কমেন্টারী অব দি সিভিল প্রোসেভিউ কোড

১২। আইন-উল-হিদায়া

১৩। জিহাদ

১৪। কমেন্টারী অব দি বেঙ্গল টেনান্সী এ্যাক্ট (১৮৮৫)

এসব গ্রন্থ রচনা ছাড়াও Nineteenth Century and culture নামক বিখ্যাত বৃটিশ প্রত্রিকায় বহুবার তার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলো ভারতীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের কল্পনা ও চরিত্র গঠনে যথেষ্ঠ সহায়তা করে। পারস্য বিভাগের প্রতিবাদে তিনি ইংল্যাণ্ডের 'টাইমস পত্রিকা'য় যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করে।[৬] তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বাংলায় অনুবাদ করে আবার কোনটির বাংলায় অনুদিত বিবরণ নিন্মরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

লাইফ এন্ড টিচিং অব দি প্রফেটঃ

সৈয়দ আমীর আলীর এই গ্রন্থটি ১৮৭৩ সালে ইডেন বার্গে প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই গ্রন্থে তিনি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আরব মরুভূমির অধিবাসীরা যখন চরম দুর্ভোগে দিন অতিবাহিক করছিল এমনই সংকটময় মুহূর্তে মহান রাব্বুল আলামীন (আল্লাহ) তাদের মাঝে নেতা রূপে ৫৭০ সালে হযরত মুহম্মদ (সা:) কে প্রেরণ করেছিলেন। যিনি মানুষকে এই দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মানুষ তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা:) একজন আদর্শ মানব ও আদর্শ নেতা ছিলেন এবং তিনি সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে একটি গনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর চরিত্র সন্মন্ধে বলা হয়েছে যে, "তাঁর স্বভাব এত পবিত্র, এত নরম এবং তথাপিও এমন বীরত্বব্যঞ্জক ছিল যে, তা কেবল শ্রদ্ধারই উদ্রেক করে না, ভালবাসারও অনুপ্রেরণা দেয়" হযরত মুহম্মদ (সা:) একটি বিশ্ব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, এই ধর্মের মধ্যে সার্বজনীন আবেদন আছে; তিনি সার্বজনীন মানবতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তণ করেন।[৭]

দ্য স্পিরিট অব ইসলাম ঃ

এই গ্রন্থটি ১৮৯৮ সালে ইংল্যান্ডের লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।[৮] এই গ্রন্থটি রচনা করে সৈয়দ আমীর আলী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এটি তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি শ্রেষ্ট গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থটিতে ইসলাম ধর্মের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। এটি ইসলাম ধর্ম ও ঐতিহ্যের একখানি প্রামান্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রায় ষাট পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায় লেখক ধর্মীয় চেতনার বিবর্তনের ধারা নির্দেশ করেছেন। ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে যখন শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তখনি ধর্মের মূলমন্ত্রে- স্রষ্টার একত্ব মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও ঐক্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবসমাজের কল্যাণধর্মী প্রয়াসের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছে, মানব সমাজের চরম দুর্দিনে আবার সত্যের শিক্ষা বেজে উঠেছে তিনি মানুষকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের দিকে আহবান জানিয়েছেন। এভাবে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ধীরে ধীরে

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশ লাভ করেছে। ধর্মের বিকৃত ঘটতে দেখা গিয়েছে সত্য কিন্তু ধর্মীয় চেতনার নিরবচ্ছিন্নতা কখনও নষ্ট হয়নি। ধর্মীয় বিবর্তনের ধারায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি লেখক ঐতিহাসিকের কঠোর সত্য নিষ্ঠার সাথে আলোচনা করেছেন । কোথাও লেখকের সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়নি। একটি অধ্যায়ের মধ্যে যে ভাবে বিরাট ধর্মীয় চেতনার রূপরেখা অঙ্কন করেছেন তাতে লেখকের বিরল প্রকাশ দক্ষতার পরিচয় ফেলে।

এটা দুইটি পর্বে বিভক্ত। অত:পর লেখক ৯টি অধ্যায় হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জীবনী, কর্মধারা ও সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। হযরত (দঃ) এর মাক্কী ও মাদানী জীবনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি যে সত্য দ্রষ্টার নিরপেক্ষতা, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিকতা ও মানব মনের গভীর ব্যবচ্ছেদের পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। জ্ঞানের গভীরতা ও প্রকাশ ভঙ্গির অর্পূব দক্ষতাই লেখকের সাফল্যের মূলমন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথম পর্বে হযরত মুহাম্মদ (স:) এর জীবন কথা ও নবুয়্যতের কার্যকাল এবং দ্বিতীয় পর্বে ইসলামের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রথম পর্বঃ এই পর্বে সৈয়দ আমীর আলী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর মাক্কী ও মাদানী জীবনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর (হযরত মুহাম্মদ (স:)) জীবন ও নবুয়্যতের কার্যকাল, হিযরত বা স্বদেশ ত্যাগ, মদীনায় রাসুল মুহাম্মদ (স:), কোরাইশ ও ইহুদীদের শত্রুতা, কোরাইশদের মদীনা অভিযান, হযরত মুহাম্মদ (স:) এর ক্ষমাশীলতা, ইসলামের ব্যাপক প্রসার, প্রতিনিধি প্রেরণের বর্ষ, হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নবুয়্যতের কার্যভার সুসম্পন্ন এবং খিলাফতের উত্তরাধিকার বা মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ এই পর্বে সৈয়দ আমীর আলী ইসলামের মর্ম কথা বিশ্লেষিত করেছেন। এখানে ইসলামের আদর্শ, ইসলামের মর্মবাণী, ইসলামে পরকালের ধারনা বা পারলৌকিক জীবন বোধ, ইসলামের সমর বৈশিষ্ট্য, ইসলামের অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এতে নারীর মর্যাদা, দাস প্রথার নির্মূলকরণে ইসলামের রাজনৈতিক বিভেদ-দল-উপদল

Dhaka University Institutional Repository

সমূহ ইসলামের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মর্মবাণী, বুদ্ধিবাদী ও দার্শনিক মর্মবাণী এবং ভাববাদী ও মরমীবাদী মর্মবাণীর মাধ্যমে লেখক ইসলামের প্রাণ-শক্তি সুস্পষ্ট রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করেছেন। এতে ইসলামের প্রাণধর্মের পরিচয়টা মানুষের চিন্তার ইতিহাসের আলোকে প্রতিফলিত হয়েছে।[৯]

এ গ্রন্থ রচনা করে পাশ্চত্য বিশ্ব মানবের কাছে ইসলামের সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরা যেমন লেখকের উদ্দেশ্য ছিল, তেমনি মুসলমানদের পশ্চাদমুখিতার কারণ নিরূপণ করে আত্মসমীক্ষার পথে তাদের উদ্বুদ্ধ করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এটা যেন অতীত দিনের স্মৃতি মন্থনের ভেতর দিয়ে আমাদেরকে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখায়। মহাকবি ইকবালের ভাষায় তাই বলতে ইচ্ছা হয়

"বিশ্বজোড়া খ্যাতি ভরা অতীত আমার সামনে রাখি।
গতকালের আর্শিতে মোর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখি"[১০]

এ শর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিনসঃ

এই গ্রন্থটি ১৮৯৮ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এটি আরব মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ও জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস।[১১] এ গ্রন্থটির অনুবাদক ডঃ ওসমান গণি, সৈয়দ আমীর আলীর এ গ্রন্থটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন (ডঃ ওসমান গণি) অনুবাদক অধ্যায় গুলো ঠিক রেখে যথাযথ ভাবে অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছেন। এই সাতটি অধ্যায়ে যে যে বিষয় আছে আমি তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি যেমন প্রথম অধ্যায়ে আছে- আরব দেশ এ দেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিবরণ প্রাচীন আরব বাসীদের বিবরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে- আরবদের গোড়ার ইতিহাস অর্থাৎ কুসাই- আবদুল মুত্তালিব-অব্বসিনীর আক্রমণ-মুহম্মদ (সঃ) এর জন্ম তাঁর নবুয়ত লাভ এবং হিজরী সন সম্পর্কিত আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়ে সৈয়দ আমীর আলী তুলে ধরেছেন- মদিনার হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মদিনায় বিভিন্ন দল ও গোত্র-সনদ প্রবর্তন এবং রাসূলে করীম (সঃ) এর তিরোধান

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক : হযরত আবু বকর বিদ্রোহ-পারস্য ও রোমকদের সাথে যুদ্ধ আবু বকরের মৃত্যু- উমর কালদীয়া ও মেসোপটেনিয়া বিজয়-পারস্য- রোমকদের পরাজয়- সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর বিজয়- উমরের মৃত্যু।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে-হযরত উসমান- তাঁর স্বজন পোষণ- উসমানের মৃত্যু- হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার বিদ্রোহ- সিফফিনের যুদ্ধ- খারিজী সম্প্রদায়- হযরত আলীর হত্যা এবং প্রজাতন্ত্রের অবসান।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ আছে-পশ্চাৎপট সরকার- শাসন প্রণালী প্রশাসন- সৈন্যবাহিনী ও সামাজিক জীবনের বিবরণ।

সপ্তম অধ্যায়ে আছে উমাইয়া বংশ হযরত হাসান (রাঃ)- তার পদত্যাগ মুয়াবিয়া- জবর দখল এবং গোত্র বিবাদ- মুদ্রার বংশ- হিময়ার বা ইয়মেনী বংশ- ইসলামের উপর গোত্র বিবাদের ফল এবং সমাজের বিস্তার।[১২] এতে সৈয়দ আমীর আলী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর আর্বিভাব, তৎকালীন আরব তথা বিশ্ব পরিস্থিতি, তাঁর নবয়্যত লাভ ও দায়িত্ব পালন এবং হিজরত গমন, মদীনায় রাষ্ট্রগঠন, প্রতিরক্ষামুলক যুদ্ধ মক্কা বিজয় দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন কায়েমের মাধ্যমে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সর্ম্পকে বিস্ত ারিত তুলে ধরেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, উমাইয়া শাসিন ব্যবস্থা, আব্বাসীয়াদের শাসন ব্যবস্থা ও জ্ঞান চর্চা এবং ফাতেমীয় বংশ- স্পেনের আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম জাতির সামনে তাদের অতীতের গৌরবোজ্জল মহান ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্য জাতির নিজস্ব ত্যাগ তিতিক্ষা্ সাধনা সাফল্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং অতীতের আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নতুন করে রচনা করা। সত্যি অতীত গোপনে গোপনে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে কাজ করে যায়।[১৩] মোট কথা, এই গ্রন্থে তিনি আরব জাতির উত্থান পতনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আর তাদের আদব-কায়দা, সমাজ-সংস্কৃতি, শাসন-প্রশাসন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা দিয়েছেন। মুসলমানদের এই মধ্যযুগীয় সভ্যতা কিভাবে ইউরোপিয় (আসুরিক) সভ্যতাকে আলো দান করেছে তার পরিচয় আমরা এই গ্রন্হে পাই।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামীক হিস্টিরী এন্ড কালচারঃ

সৈয়দ আমীর আলীর ১৮৯১ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পযর্ন্ত লেখাগুলোর মধ্যে থেকে সকল লক্ষ্যণীয় অনুচ্ছেদগুলো এই গ্রন্থটিতে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- ইসলামে নারীদের প্রকৃত মযার্দা (১৮৯১), ইসলাম এবং এর সমালোচনা (১৮৯৫ সেপ্টেম্বর), ইসলাম এবং সংক্ষিপ্ত আইন (১৮৯৫ নভেম্বর), ইসলামে নারীদের উৎসাহ১৮৯৯ মে), খ্রীষ্ট ধর্ম হতে অন্যান্য ধর্মের উদ্দেশের বর্ণনা (১৯০৬); স্পেন জাতির ইতিহাস (১৯০৬ জুন), আফগানিস্তান এবং এর শাসন (১৯০৭ জানু:), খিলাফত এর ঐতিহাসিক এবং বিচার সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৯১৫ জুন), ইসলামের সম্মিলিত সংগঠনের পরিচয় (১৯১৯), খিলাফত এবং ইসলামিক নবযুগের সূচনা (১৯২৩ জানু:), ইসলামের আধুনিকতা (১৯২৭ জানু:), ভারতের ইসলামিক সংস্কৃতি (১৯২৭ জুলাই), মূঘল আমলে ইসলামিক সংস্কৃতি (১৯২৭ অক্টো:) ও ইসলামিক মানবিক আইনের বিজ্ঞান ও আদর্শ এবং এর সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা। ৫৫৪৪৪৭

তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন পশ্চিমাদের থেকে ইসলামী ইতিহাসের নিরাপত্তা বিধান করার। এছাড়াও ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতাকে খ্রিষ্টান সভ্যতার বিতর্কের বিরুদ্ধে একটি আদর্শ ও আধুনিক ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তুলে ধরা। এভাবে 'আরব জাতির ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৯ সালে। আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের চার খলিফার মধ্যে প্রথম দুই খলিফার আইনগুলো অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তাঁর লেখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হল জনগণের ধারণা অমূলক বলে প্রতিপন্ন করা যে, ইসলাম নারীদের মর্যাদাহানী করে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এটা করেছেন। তিনি এই গ্রন্থটিতে দুটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদাহানী থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু আদিম যুগের অসভ্যতা মুসলিম সংস্কৃতির উন্নতি তুষারস্তুপ ধ্বংসের ন্যায় ধ্বংস করেছিল, তখন পিছিয়ে পড়া মুসলিম নারীদের ছিল না কোন কুরআনিক শিক্ষা। ফলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বারা সমগ্র পশ্চিমা এশিয়া ধ্বংস ও নির্জনতায় আচ্ছন্ন হয়েছিল। মুসলিম নারীদের সামাজিক মর্যাদা পরিবর্তনের গোড়া মুসলমানরা একটা সাধারণ যুক্তি দেখিয়ে পাল্টা দাবী জানিয়েছিলেন। সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

আমীর আলী ঐকান্তিক চেষ্টায় ইসলামে নারীদের মর্যদার উপর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন এবং সে সূত্র ধরে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোতেও বিতর্ক চলছে। কিন্তু এই বিতর্কে অবশ্যই মুসলিম নারীদের বিদ্যমান দুর্দশা তুলে ধরা হয়। পরিশেষে তিনি অবশ্যই মুসলিম নারীদের মর্যদার উন্নতির পথ এবং উপায় খুঁজে বের করেন। এই বিবেচনায় আমরা ইসলামের সমতার ধারণা এবং আমাদের বর্তমান দিনে অভিজ্ঞতা আমরা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারি।

মুসলমানদের হারানো গৌরবের অনুশোচনায় একটা দৃষ্টান্ত "স্পেন জাতির ইতিহাস" (Spain under the Saracens) এর লেখা থেকে জানা যায়। সৈয়দ আমীর আলী স্পেনের মুর জাতির পরাজয়ের সমালোচনা দু:খের সাথে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন স্পেনদের সাহস, বিচৰনতা, সভ্যতা সত্ত্বেও পর্তুগাল ও স্পেনদের জীবনে অধপতন নেমে এসেছিল। যা গোথস জাতির গর্ব ও আত্মমর্যাদকেও ম্লান করে দিয়েছেন। তখন সাম্প্রদায়িক এবং সাতন্ত্র্য হিসেবে অতীতের হারানো ঐতিহ্য মুসলমানরা ফিরে পেতে শুরু করে। যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন আন্দালুসিয়াকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাধ্যমে জ্ঞানের শীর্ষে তুলে এনেছিল তারাই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইউরোপের প্রতিষ্ঠাতা।

সৈয়দ আমীর আলীর সমসাময়িক অনেকেই একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। হালি, শিবলী, খুদা বকশ, ইকবাল প্রমুখদের মত সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক গুনাবলী আব্বাসীয় জাতির এবং অটোমান সম্রাজ্যের গঠন কাঠামো মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগের অলঙ্কার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়ান ক্ষমতার কাছে যখন ইসলামের মূল ভূমির স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িক গৌবর হিসেবে অতীত ঐতিহ্য হুমকির সম্মুখীন হয় তখন মুসলমানরা ভারতের মুঘল, স্পেনের অঙ্গরাজ্য সমূহ বাগদাদের আব্বাসীয় ক্ষমতায় অতীত সভ্যতা খুঁজতে শুরু করে। ১৯১৫ সালে ইসলামের বিশ্বজয়ের উপর (The caliphate) "খিলাফত" ঐতিহাসিক এবং

Dhaka University Institutional Repository

আইনের নকসা নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কেও তিনি এ গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন।[১৪]

খ্রীশ্চায়ানিটি ফ্রম দি ইসলামিক ষ্টেণ্ডপয়েন্টঃ

এটি ১৯০৬ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে খ্রীস্ট ও ইসলামের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে।[১৫]

ইসলাম ঃ

এটি ১৯০৬ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এতে ইসলামের সাম্য ও ন্যায় নীতির পর্যালোচনা করা হইয়াছে।[১৬]

লিগ্যাল স্টেটাস অব ওইমিন ইন ইসলাম ঃ

এটি ১৮৯১ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মুসলমান নারীদের সম্মানজনক সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।[১৭]

মোহামেডান ল ঃ

এটি ১৮৮৪ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। এটি মুসলিম আইনের গবেষণামূলক গ্রন্থ।[১৮]

পারসোন্যাল ল অব দি মোহামেডান্সঃ

এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে। তাঁর এ গ্রন্থটি ও ইংরেজিতে লেখা। তিনি এই গ্রন্থটি আরবি থেকে সংকলন করেছেন। এ গ্রন্থে সৈয়দ আমীর আলী জুডিশিয়াল কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের জন্য মুসলিম আইন বিশেষ করে উত্তরাধিকার ও স্টেইটাস আইন পড়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন।

মুসলিম আইন পাঁচটি শাখায় বিভক্ত। শিয়া এবং সুন্নী আইনের নীতি ও ব্যাখ্যায় পার্থক্য রয়েছে। ৪টি সুন্নী শাখা যদিও নীতিগতভাবে এক। তবে তাদের মধ্যেও বাহ্যিকভাবে বেশ পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্য শাসন আইন বুঝতে বাড়তি জটিলতার সৃষ্টি করে। এ গ্রন্থে এসব জটিলতাকে যথাসম্ভব স্বচ্ছ ও সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। যারা মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেননি বা মুসলিম সমাজের পরিমণ্ডলে প্রতিপালিত হননি তাদের জন্য মুসলিম আইন বোঝা বেশ কঠিন ব্যাপার। তখন

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজীতে মুসলিম আইনের উপর যেমন বই প্রকাশিত ছিল তার সংখ্যা অতি সীমিত। এমনকি ভারতেও মুসলিম আইনের উপর শিক্ষিত যুবকদের দখলও খুব কম ছিল। যারা এর উপর লেখাপড়া করেন তাদের উপকারার্থে তিনি এই তথ্যবহুল গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। এই গ্রন্থে যেসব বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে নিম্নে সংক্ষেপে তার বর্ণনা করা হলো- যেমন-উত্তরাধিকার আইন, হানাফী উত্তরাধিকার আইন, উত্তরাধিকার সূত্রে বহিস্কৃতদের মামলা, মালেকী এবং শাফেঈ উত্তরাধিকার আইন, শিয়া উত্তরাধিকার আইন, বায়তুল মাল, আইন সম্পর্কিত মর্যদা, আইনের দ্বন্দ্ব, বৈধতার মর্যাদা কোন বিশিষ্ট তত্ত্ব স্বীকার, বিবাহের জন্য অবিভাবকদের অধিকার, বিবাহে আইনের সীমাবদ্ধতা, বিবাহের সম্মতি, বিবাহের শর্ত, প্রমাণ, ধর্মের পরিবর্তনের ফলে বিবাহের মর্যাদা, শিয়া আইনের অধীনে বিবাহ। সাময়িক বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য, মোহর-যৌতুকে পার্থক্যে, লীয়ান, বিবাহের শর্ত ভঙ্গের মামলা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এটি আমাদের মুসলিম সমাজের জন্য অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আইনই গ্রন্থ।[১৯]

কমেণ্ডারী অব দি ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাক্ট ঃ

এটি ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। এটি বৃটিশ ভারতের সাক্ষ্য সংক্রান্ত আইনের গ্রন্থ। আমীর আলী ও জন জর্জ উডরোফ যুক্তভাবে এই গ্রন্থ রচনা করেন।[২০]

কমেন্টারী অব দি সিভিল প্রোসেডুর কোড ঃ

এটি আইন সংক্রান্ত একখানি প্রামান্য গ্রন্থ। জন জর্জ উডরোফর সহায়তায় আমীর আলী এটি রচনা করেন।[২১]

আইন-উল-হিদায়া ঃ

এটি হানাফী আইনের হিদায়া গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ।[২২]

জিহাদ ঃ

কোন কোন অবস্থায় ধর্মযুদ্ধ সঙ্গত এই গ্রন্থে তাহা আলোচনা করা হয়েছে। [২৩]

এ কমেন্টারী অব দি বেঙ্গল টেনান্সী এ্যাক্টঃ

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলী একজন প্রখ্যাত আইনবিদ ছিলেন। আর এই জন্য তিনি আইনের উপর অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করে আইন বিষয়ক জটিরতা দূর করতে চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থটিও তাঁর রচিত আইন গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে।[২৪]

এ গন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো আছে তা নিম্নে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি, যেমন- প্রজাদের শ্রেণী বিভাগ ভোগ দখল ক্ষমতা এবং দাঙ্গা, ভোগ দখল ক্ষমতার সময়, একমাত্র নিদিষ্ট মকদ্দমার মাধ্যমে স্থায়ী নিস্পত্তির মাধ্যমে ভূমি দখল ক্ষমতার বৃদ্ধি করা যায়, ভোগ দখল কারীদের ভাড়া বৃদ্ধি সীমিত করা হয়, জমির ভাড়া একবার ইজারা দেওয়া হলে তার পরিবর্তন হবে না। স্থায়ী ভাবে ভূমি ভোগ দখল কারীরা আইনত বহিস্কার হবে না। নির্দিষ্ট হারে জমি ভোগ দখল কারীদের ঘটনা সমূহ, ভোগ-দখলের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ভাঙ্গার বিভিন্ন শর্ত সমূহ, অপেশাদারীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জমির মালিক ও ভোগদখল কারীদের বিভিন্ন শর্ত সমূহ, দাঙ্গা- হাঙ্গামার ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

এখানে আমি তাঁর এ গ্রন্থের মূল বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নিয়ম-নীতি তথা বাংলার প্রজাসত্ত্ব আইনে সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য পূর্ববর্তী আইন সভার অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য দরকারী মনে হতে পারে। সেখানে আমাদের পূর্বাক্ত সরকার সমূহের ব্রিটিশ নিয়ম প্রাদেশিক আইনের অধীনে ভূমি আইন-সভার ইতিহাসের রাজস্ব পদ্ধতিতে বিরাজমান সুযোগ-সুবিধা এবং সূচনার উল্লেখ রয়েছে। এই আইনের প্রত্যেক ধারার ব্যাবহারে সরকারের নীতিকেই প্রথম নির্দেশ করেছে।

তারপর তিনি অগ্রসর হয়েছেন বিভিন্ন নিয়ম কানুনের ফলাফল দিতে যাতে আইনের ধারা অথবা ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। পুরাতন আইনের ঘটনা সমূহ তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান আইনে লিপিবদ্ধ নিয়ম কানুনের সঙ্গে তুলনা ও ব্যাখ্যা করার জন্য। তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হল আইন অধ্যায়নকারীদেরকে বাংলার প্রজাসত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

আইন সম্পর্কে অবজ্ঞাত করানো। যাতে এই বিষয়ে উদ্ভুত সমস্যার সহজ সমাধান দিতে পারে।[২৫]

The Law Relating to Gifts, Trusts, And Testamentary Dispositions: স্যার সৈদয় আমীর টগোর ল লেকচারস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। মুসলিম আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন, দান তহবিল এবং উইল বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিষয়কে সম্পর্কে এই গ্রন্থে তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের পরিবারের আর্থিক দিক অবহেলিত হয়। এমন কি তিনি বৃটিশ ভারতের আদালদতে এ বিষয়টি পায়ই অবলোকন করতেন। অবশ্যক বিবেচনার ভিত্তি হিসেবে এখনও পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় যে কোন গবেষণামূলক গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জরুরী প্রয়োজনে এই বইয়ের অধ্যায় গুলোতে এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলোকে সমন্বিত কোর্স হিসেবে লেকচার রুম থেকে সংগ্রহ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তার সীমিত সময়ের মধ্যে তিনি অন্যান্য বিষয়ের কাজ বিন্যাস্ত করেছেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে জমি বিক্রয় বন্ধক ও জমিদারী ইত্যাদি আইন সম্পর্কিত বিষয় এই গবেষণা মূলক গ্রন্থের খন্ডে সংযোজন করতে চেষ্টা করেছেন।

তার প্রস্তুত পাঠগুলোর মধ্যে থেকে অনেক জটিল নীতিগুলো ছাত্র এবং পেশাদার আইনজীবীদের প্রয়োজনে তুলে ধরেছেন, যে ঘটনা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি সাময়িক প্রশ্নের প্রকাশ করেছেন তথাপি ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষা করে পেশাগত আইনবিদরা সন্তোষজনক ভাবে গ্রহণ করেছেন।

নিম্নে এই গ্রন্থের আলোচিত শিরোনাম গুলো তুলে ধরা হলো ঃ

দান সম্পর্কিত আইন, তহবিল সম্পর্কিত আইন, উইল সম্পর্কিত আইন তুলে ধরা হয়েছে। দানের আনুষ্ঠানিকতা শর্ত, প্রত্যাহার গুরুত্ব ইত্যাদি, শিক্ষা নীতি অনুসারে দানের আইন আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য অধ্যায়ে ওয়াকফের আইন, এবং উদ্দেশ্য, ক্ষমতা, হানাফী আইনের অধীনে ওয়াকফের নীতি এবং এই আইনের অধীনে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি স্ত্রী এবং পুত্রের মধ্যে হস্তান্তর করার বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে,

এখানে ওয়াকফ সম্পর্কিত শি'য়া আইন সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ওয়াকফের সংবিধান, গঠন, আনুষ্ঠানিকতা এবং এর আইনগত ফল ইত্যাদি। শাস্ত্রের নীতি অনুসারে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য একটি অধ্যায়ে মুসলমান আইনের অধীনে তহবিলের কার্যপ্রণালীর বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর আরেকটি অধ্যায়ে আছে সম্পত্তির উইল সম্পর্কিত আইন। এখানে উইলের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে, আর আলোচনা করা হয়েছে উইল সর্ম্পকিত হানাফী, শাস্ত্রেই এবং মালেকী নীতি সমূহ। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ওসিরত সম্পর্কিত আইন সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- ওসিয়তের সংজ্ঞা এবং শাস্ত্রেই নীতি অনুসারে ও সিয়ত সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[২৬]

Law of Evidence :

সৈয়দ আমীর আলীর এই গ্রন্থটি ১৯০২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি এই গ্রন্থটিতে আইনের বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ উস্থাপন করেছেন। যা থেকে পেশাদার আইন বিদ এবং আইন বিভাগের ছাত্ররা উপকৃত হচ্ছে। কারণ এ ধরনের গ্রন্থের সংখ্যা খুবই সীমিত। তাই তৎকালীন সময়ে লেখক এর প্রয়োজন অনুভব করে গ্রন্থেটি প্রনয়ন করে ছিলেন। এই গ্রন্থটিকে তিনি তিনটি অংশ এবং এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে সেই অধ্যায়ের শিরোনাম গুলো এখানে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি যেমন- ভারতের সামঞ্জস্য ঘটনাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষদর্শী নয় তার কোন বিবৃতি গ্রহণ করা যাবে না। যেসব ক্ষেত্রে ঘটনা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই সে সব বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রামান্য চিত্র হিসেবে সাক্ষ্য গ্রহণ করার বিষয় উল্লেখ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। জনগণ এবং ব্যক্তির প্রমাণ, অনুমান সিদ্ধ দলিল পত্র প্রমাণ, গ্রহণের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু মৌখিক সাক্ষী বর্জন, করতে বলা হয়েছে। সবশেষে সৃষ্ট ঘটনার সাক্ষ্যের ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে, [২৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. বাংলা পিডিয়া, ১০ খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ২৬৮

২. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদক ড. রশীদুল আলম, পৃ. ৩।

৩. ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)। পৃষ্ঠা ১৭০

৪. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, অনু হাবিব আহসান, পৃষ্টা vi

৫. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, পৃ. ৯৮

৬. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস্, অনু- হাবিব আহসান, এম, এ, পৃষ্ঠা vi

৭. স্যার সৈয়দ আমীর আলী. লাইফ এন্ড টিচিং অব দি প্রফেট, পৃ. vi

৮. ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৪৩

৯. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, ড. রশীদুল আলম, পৃ. ৬৪৪

১০. দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, সৈদয় আমীর আলী, অনূবাদক. মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান, পৃ. ১১

১১. এ শর্ট হিস্টরী অব স্যারাসিনস, সৈদয় আমীর আলী, অনূবাদক. ড. ওসমান গণি, পৃ

১২. ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৪৩

১৩. ইসলামিক হিস্টিরী এন্ড কালচার সৈয়দ আমীর আলী পৃষ্টা ারর, াররর

১৪. পারসোন্যাল অবদি মহোমেডানস্ সৈয়দ আমীর আলী, পৃষ্ঠা ার, ix, x, xi, xii, xiii

১৫. A commentary on the Bengla Tenancy act, ১৮৮৫ সৈয়দ আমীর

Dhaka University Institutional Repository

আলী, প্রকাশ ১৯০৪, পৃষ্ঠা iii, v, vi, vii

১৬. খ্রীশ্চীয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামিক ষ্ট্যাণ্ডপয়েন্ট, সৈয়দ আমীর আলী, পৃ. xii

১৭. ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৪৩

১৮. সৈয়দ আমীর আলী, লিগ্যাল স্টেটাস অব ওইমিন ইসলাম, পৃ. viii

১৯. ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৪৩

২০. মোহামেডান ল সৈয়দ আমীর আলী, xxii

২১. ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৪৩

২২. কমেন্টরী অব দি ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাক্ট, সৈয়দ আমীর আলী, পৃ. viii

২৩. ডঃ মুহম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৪৩

২৪. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, ডঃ বশীদুল আলম, প্রকাশ ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ৬৪৪

ইসলামিক হিস্ট্রী এণ্ড কালচারম, সৈয়দ আমীর আলী, পৃ. xxi

২৫. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭) এম, এ, রহিম, পৃষ্টা ১৪২

২৬. The Law Realting to Gifts, Trusts, and The Testamentary Dispositions, Syed Ameer Ali, p. v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii.

২৭. The Law of Evidence, Syed Ameer Ali, c„ôv iv, xiii-xix

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

(ক) শিক্ষা বিস্তারে সৈয়দ আমীর আলীর অবদান

(খ) বৃটিশ শাসন কালে মুসলমানদের শিক্ষা

(গ) আরবী-ফার্সী শিক্ষা

(ঘ) বাংলা পাঠশালা ও মিশনারী বিদ্যালয়

(ঙ) ইংরেজী শিক্ষা ঃ সরকারের নীতি

(চ) কলকাতা মাদ্রাসা

(ছ) শিক্ষা বিতর্ক

(জ) ১৮৫৪ সালের শিক্ষার পরিকল্পনা

(ঝ) শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবনতি

(ঞ) শিক্ষা-পদ্ধতির গলদ

(ট) ১৮৮২ সালের প্রস্তাব

(ঠ) ১৮৮৫ সালের প্রস্তাব

(ড) তথ্যনির্দেশ

(ঢ) মূল্যায়ন

(ন) সমাপনী বক্তব্য

(প) গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাবিস্তারে সৈয়দ আমীর আলীর অবদান

আলোচ্য যুগে বাংলার মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসঙ্গটি জটিল রূপ ধারন করেছিল। অথচ শিক্ষাই হল জাতির জীবন-মরন কাঠি। একটি সমাজের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ ও বর্জনের উপর।[১] উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চা জাতির উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। বাংলার মুসলমান সমাজে এ শিক্ষা নিয়ে সংশয়, দ্বন্দ্ব ও মত বিরোধ দেখা দিয়েছিল। বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আবশ্যক হলেও ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য আরবি-ফার্সী ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান অপরিহার্য ছিল। কারণ ইংরেজ আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। টোল- চতুস্পাঠী, মক্তব- মাদ্রাসার যুগ পেরিয়ে পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ আসে। ইংরেজগণ ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রর্বতন করেন। ইংরেজী ভাষা, পাশ্চাত্য বিদ্যা, পাশ্চাত্য পদ্ধতি আমদানী হয়। মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে শিক্ষক- অধ্যাপক- শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন কাজ চালাবার জন্য কর্মচারীও দরকার হয়। একটি বিপুল আকার শিক্ষা বিভাগ গড়ে উঠল যার প্রধান কেন্দ্র হল কলকাতা। শিক্ষা ব্যবস্থা তদারক করার জন্য প্রথমে 'জেনেরাল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' (১৮২৩) , পরে কাউন্সিল অব এডুকেশন' (১৮৪৩) এবং তৎপর 'ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' (১৮৫৪) গঠিত হয়। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী হিসেবে বহু লোক চাকুরিজীবী হলেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, মুদ্রণশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে পেশাদার- অপেশাদার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়।[২]

১৮৩৭ সালে সরকার আইন পাশ করে অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজী প্রবর্তন করেন । স্কুল-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করে ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

করেন বিচার ও রাজস্ব বিভাগে যোগ্য কর্মচারী তৈরী করার জন্য।[৩] মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, "----- to promote the study of the Arabic and Persian Languages and of Muhammadan Law, with a view more especially to the production of qualified officers for the Courts of Justice."[৪] ফোর্ট উইলিয়াম কলেজেও ১৮০০ সালে ইংরেজী-বাংলার সাথে উর্দু-ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যতদিন এ ব্যবস্থা চালু ছিল, ততদিন মুসলমান সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়নি; সমস্যার আকার ধারণ করে তখন, যখন ফারসি রহিত করে ইংরেজীর প্রচলন হয়। কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন উঠলে ১৮২৩ সালে আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার মৌলিক আদর্শ ক্ষুন্ন হবে এরূপ অজুহাত দেখিয়ে মাদ্রাসার পরিচালক মণ্ডলী প্রথমে প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পরে ঐ মাদ্রাসার অঙ্গনে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয় ১৮২৬ সালে। ১৮৩০ সালে মাদ্রাসায় ৮৭ জন ছাত্র প্রাথমিকভাবে ইংরেজী শিখতো। ১৮২৬ সালে ঢাকার মুসলমানগণ শহরে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য হেবসের নিকট আবেদন করেন; কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে সরকার তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করে করেন। ১৮২৪ সালে মুর্শিদাবাদে নবাব পরিবারের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি প্রাথমিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এছাড়া খ্রিস্টান মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতেও কিছু কিছু ছাত্র শিক্ষা লাভ করত। সুতরাং ইংরেজী ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার প্রতি ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানদের বিরূপ মনোভাব ছিল না।[৫] যখন ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দিল, তখন মুসলমান সমাজে নানাবিধ সংকট সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ শাসন কালে মুসলমানদের শিক্ষা

মুসলমান আমলে ভারতীয় মুসলমানগণ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ছিল। তাহারা শিক্ষাকে ধর্মের অঙ্গ-স্বরূপ মনে করত। তারা বিশ্বাস করত যে, বিদ্যাশিক্ষা করলে আল্লাহর আরাধনা করা হয়। প্রত্যেকে মসজিদ, ইমাম বারা, খানকাহ এবং আলেম ও অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। শাসক, ওমরাহ ও রাজকর্মচারীগণ শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষিত লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ও মাদ্রাসা স্থাপন করতেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্কর জমি দান করা হত। মোগল সাম্রাজ্যে শিক্ষার উন্নতির বিষয় উল্লেখ করে আবুল ফজল বলেছেন, "যুবকদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু হিন্দুস্থানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে।"[৬] সম্রাট আকবরের শিক্ষা বিষয়ক আইন হতে সে যুগের শিক্ষার উন্নত মান সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। এই আইনে বলা হয়, "প্রত্যেক বালকের পক্ষে নীতিজ্ঞান, অংক, কৃষি, পরিমাপ-বিদ্যা শরীরবৃত্ত জ্যোতিষ, গার্হস্থ্যবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, চিকিৎসা, যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইতিহাসে জ্ঞান অর্জন করা উচিত। এই সকল বিষয়ে জ্ঞান ক্রমশ আয়ত্ত করা,যেতে পারে।" আবুল ফজল লিখেছেন, "এই আইনের ফলে বিদ্যালয়গুলো নতুনভাবে আলোকিত হয় এবং মাদ্রাসাগুলো উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।[৭]

জেনারেল শ্লীমান মোগল যুগের শিক্ষার উচ্চ মানের প্রশংসা করে লিখেছেন, "ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার যেরূপ ব্যাপক প্রসার হয়েছে পৃথিবীর খুব কম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেরূপ হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুড়িটাকা মাইনায় চাকুরী করে সে তার পুত্রের জন্য সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর পত্রের সমান শিক্ষার ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশের যুবকগণ ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি যে সকল বিষয় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা করে সেইগুলো তারা আরবী ও ফার্সী ভাষায় আয়ত্ত করে। অক্সফোর্ড হতে যুবকগণ সদ্য যে জ্ঞান লয়ে বের হয়ে আসে মুসলমান যুবক সাত বৎসরে সে জ্ঞান আহরণ করে মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। সে অনর্গল সক্রেটিস,

Dhaka University Institutional Repository

এরিস্টোটল, প্লেটো, হিপোক্রেটিস গেলেন ও ইবনে সিনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে।" শ্লীমান মন্তব্য করেছেন, "যখন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা ব্যতীত বাইরের কোন বিষয় আমাদেরকে কোন পদস্থ ও শিক্ষিত মুসলমানের সাথে আলোচনা করতে হয় তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ উইরোপীয় ব্যক্তিগণও নিজেদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা উপলব্ধি করি। টলেমির জ্যোতিবিদ্যা ও এরিষ্টাটলের ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলমান ভদ্রলোকের মোটামুটি জ্ঞান আছে। ইবনে সিনার মাধমে হিপোক্রেটিস ও গেলেনের ভাবধারার সাথে তাদের পরিচয় আছে। তারা দশর্ন, সহিত্য, বিজ্ঞান ও কলা প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে এবং বর্তমান যুগে এইসব বিষয়ে যে উন্নতি হয়েছে তাও জানবার জন্য তাদের আগ্রহ আছে।"[৮]

মুসলমান আমলে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে উইলিয়ম হান্টার লিখেছেন, "ভারতীয় রাজকর্মচারী ই,পি, বেইলী মুসলমানদের বিষয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন। তিনি বলেন যে, মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতি যদিও আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি হতে নিকৃষ্টতর ছিল, তবুও তা অবহেলার যোগ্য ছিল না; উচ্চস্তরের বুদ্ধিবৃত্তি ও সুরুচির বিকাশ করবার সামর্থ তার ছিল; যদিও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরাতন ধারায় চলত তবু এটা মোটামুটি সুষ্ঠু নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এটা সেই যুগে ভারতে প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষা পদ্ধতি হতে বহুলাংশে উৎকৃষ্টতর ছিল। এই শিক্ষা-পদ্ধতির ফল তারা জ্ঞান ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করতে পেরেছিল এবং এর মাধ্যমে হিন্দুগণ তাদের দেশের শাসন কাজে ক্ষুদ্রতম অংশ পাবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করার আশা করত।"[৯]

আরবী-ফার্সী শিক্ষা ঃ রাজ্যহারা হবার পর বাংলাদেশের মুসলমানদিগকে চাকুরী, জমিদারী, জায়গীর প্রভৃতি ও হারাতে হয় এবং এতে তাদের আর্থিক ঐশ্বর্য নষ্ট হয়ে যায়। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন তাদের শিক্ষার গুরুতর ক্ষতি হয়। মক্তব, মাদ্রাসা, খানকাহ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করে চলত। এদের জন্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। নিষ্কর জমি বাযয়াফত করায়

Dhaka University Institutional Repository

বিত্তহীন মুসলমানদের পক্ষে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৮০৭-১৪ সালের বুকানন হেমিলটন ও ১৮৩৫-৩৮ সালে উইলিয়ম এডাম বাংলাদেশের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তাঁরা এটা আলোচনা করেছেন।[৩৬] আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাদের শিক্ষার ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা কিছুটা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কোম্পানীর শাসনকালে এডাম প্রত্যেক মসজিদ ও ইমামবারায় আরবী ও ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা দেখতে পান। তিনি বলেছেন যে, তখন বাংলা ও বিহারের ৪০,০০০,০০০ অধিবাসীর জন্য ১০০,০০০ প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল। এটা হতে বুঝা যে, প্রতি গ্রামে একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ৫ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক তিনশত বালক শিক্ষা পেতে পারত। এডাম মন্তব্য করেছেন যে, মুসলমানদের শাসনকালে প্রাইমারী শিক্ষা আরও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[১০]

কোম্পানী আমলে ফার্সী বহু বৎসর সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। বিচারকার্যের জন্য মুসলমানদের আইন পদ্ধতি বজায় রাখা হয়। এই জন্য মুসলমানগণ তাদের আরবী ও ফার্সী শিক্ষার ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলছিল। ১৮৩৫ সালে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এডামকে বাংলা-বিহারের গ্রামগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা তদন্তের জন্য নিয়োগ করেন। এডাম কয়েকটি জেলার শিক্ষার অবস্থা তদন্ত করে তিনটি রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রথম রিপোর্ট তিনি দেশীয়, মিশনারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো সম্বন্ধে বিবরণ দেন। দ্বিতীয় রিপোর্টে তিনি রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমায় শিক্ষার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। নাটোরের শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক ছিল। ১৮৩৮ সালে এডাম তৃতীয় রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্ট কয়েকটি জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা দেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এডাম মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অব্যবস্থা ও অবনতি লক্ষ্য করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের মুসলমানগণ বহু বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল এবং শিক্ষাকে তারা কেবল জীবনের পেশা ও জীবিকা নির্বাহের উপায় বলে গ্রহণ করেনি, তারা একে ন্যায় ও পুণ্যের কাজ বলে বিশ্বাস করত। ছাত্রগণ শিক্ষকের বাড়ীতে থাকত। পাঞ্জনামা, গুলিস্থান এবং আরও কয়েকখানি ফার্সী ও আরবীর বই পড়ত। শিক্ষা শেষ করে তারা মুনশী আখ্যা লাভ করত।[১১] এডাম লিখেছেন, "হুগলী জেলার পান্ডুয়ার যথেষ্ট সুনাম ছিল। এখানকার মুসলমান ভূস্বামীগণ দরিদ্র প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষক রাখবার ব্যবস্থা করত এবং সেখানে এমন কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল না যার বাড়ীতে শিক্ষক রাখা হত না। এই শ্রেণীর মুসলমান ও এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা এখন নেই বললেই চলে।"[১২] পাণ্ডুয়ার তিনটি মাদ্রসা মুসলমান আমল হতে নিষ্কর ভূমির উপর নির্ভর করে চলে আসছিল । কোম্পানীর শাসনকালে এদের অস্তিত্ব মাত্র বজায় ছিল। হুগলী জেলায় আরবী-ফার্সীর আর ও কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল। এদের একটির জন্য হাজী মুহম্মদ মহসিনের দানের ব্যবস্থা ছিল সীতাপুরে একটি মাদ্রসা ছিল। এর জন্য ১৭৭২ সালে গভর্ণর কার্টিয়ার সাড়েপাঁচ টাকা দান করেন।[১৩]

বর্ধমান জেলার বোহার ও চাঙ্গারিয়ার মাদ্রসাগুলোর জন্য নিষ্কর জমি ছিল।[১৪] এডামের সময় এই জেলায় ৯৩টি ফার্সি ও ৮টি আরবী বিদ্যালয় ছিল। অনেক শিক্ষকের নিষ্কর জমি ছিল এবং ছাত্রদেরকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হত।[১৫] বীরভূম জেলায় ৭১টি ফার্সী ও ২টি আরবী বিদ্যালয় ছিল। অনেক শিক্ষকের নিষ্কর জমি ছিল।[১৬] মেদেনীপুরে একটি মাদ্রসা ও ৪৮টি ফার্সী বিদ্যায়ল ছিল।[১৭] মুর্শিদাবাদে একটি মাদাসা এবং ১৭টি ফার্সী ও ২টি আরবী বিদ্যালয় ছিল।[৪৫] রাজশাহী জেলার বাঘায় একটি প্রাচীন মাদ্রাসা ছিল। বাঘা মাদ্রাসার জন্য ৪২টি গ্রামের নিষ্কর জমি মুসলামন শাসনকালে দান করা হয়েছিল।[১৮] এডাম লিখেছেন যে, এই নিষ্কর জমির অধিকাংশ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতার বংশধরগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল। আরবী ও ফার্সী শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসায় মাত্র দুইজন শিক্ষক ছিল। মাদ্রাসায় আরবী ও ফার্সী সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হত। ধর্মশাস্ত্র, আইন, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।[১৯] এডাম তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্টে চট্টগ্রামের একটি মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করেন। এই মাদ্রাসার জন্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন এটা ভগ্নদশায় পতিত হয়। শ্রীহট্টে শাহ জালালের দরগাহে সাথে সংশ্লিষ্ট একটি মাদ্রাসা ছিল এবং এর জন্য নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল।[২০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের পিছনে পড়ে যায়। ১৮০১ সালে মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের ২০টি সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল এবং মুসলমানদের মাত্র একটি আরবী-ফার্সী বিদ্যালয় অস্তিত্ব বহন করছিল। ১৮২৩ সালে রংপুর জেলায় ২টি ফার্সী বিদ্যালয় ছিল। দিনাজপুর জেলায় মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য ফার্সী বিদ্যালয় ছিল না; হিন্দুদের অনেকগুলি বিদ্যালয় ছিল। হেমিলটন ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বাকরগঞ্জ, নদীয়া, প্রভৃতি জেলায় উল্লেখযোগ্য আরবী-ফার্সী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখতে পাননি। তিনি ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় হিন্দুদের অনেকগুলো বিদ্যালয় দেখতে পান।[২১]

এডাম মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতির ও মুসলমান শিক্ষকের প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে, হিন্দু বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা অপেক্ষা আরবী ফার্সী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা বেশি ফলপ্রদ ও সাধারণ জ্ঞানের উপযোগী ছিল এবং শিক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে হিন্দু শিক্ষকগণ অপেক্ষা মুসলমান শিক্ষকগণ যোগ্যতর ছিল। এডাম মন্তব্য করেছেন, "যদি বাঘা, বোহার, চাঙ্গারিয়া ও মুর্শিদাবাদের মাদ্রাসাগুলো ভালভাবে পরিচালিত হত তাহলে এটা উচ্চমানের শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নীত হত।"[২২] আর্থিক সাহায্যের অভাবে মাদ্রসা ও আরবী- ফার্সী বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। মক্তব বা প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলোতে ও শিক্ষার অব্যবস্থা দেখা দেয়। এদের শিক্ষার ভার অর্ধ শিক্ষিত শিক্ষকদের হাতে পড়ে। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির উল্লেখ করে এডাম লিখেছেন, "এই আরবী বিদ্যালয়গুলো এরূপ হীনদশায় পৌঁছেছে যে, এরা লক্ষ্যের ও অযোগ্য হয়ে পড়েছে।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা পাঠশালা ও মিশনারী বিদ্যালয় ঃ বিভিন্ন জেলায় হিন্দুদের অনেকগুলো টোল ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এগুলো ছাড়াও প্রত্যেক জেলায় তাদের অনেক পাঠশালা বা বাংলা বিদ্যালয় ছিল। এডাম কয়েকটি জেলার পাঠশালার সংখ্যা দিয়েছেন; মেদেনীপুরে ৫৪৮ টি, মুর্শিদাবাদে ৬২টি, বীরভূমে ৪০৭টি, বর্ধমানে ৬২৯টি, এবং দিনাজপুরে ১১৯টি পাঠশালা ছিল।[২৪] বাংলা শিক্ষায় মুসলমানগণ হিন্দুদের বহু পিছনে পড়েছিল। কয়েকটি জেলার বাংলা বিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমেঃ মুর্শিদাবাদ- ৯৯৮ ও ৬২, বর্ধমান ১২, ৪০৮ ও ৭৬৯, এবং বীরভূম-৬১২৫ ও ২৩২।[২৫] বাংলা বিদ্যালয়ে সংস্কৃত উদ্ভুত বাংলা শিক্ষা দেওয়া হত এবং প্রায় সকল শিক্ষকই হিন্দু ছিল। এডাম এদের পাঠ্যতালিকার উল্লেখ করে বলেছেন যে, ছাত্রদেরকে প্রতিদিন সকালে হাটু গেড়ে নত মস্তকে সরস্বতী- বন্দনা আবৃত্তি করতে হবে। তারা শুভঙ্করের গণিতের নিয়মগুলোও সমস্বরে আবৃত্তি করে শিক্ষা করত। তাদেরকে কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠা কিয়া, শতকিয়া, যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ এবং কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক হিসেবের নিয়মগুলো মুখস্থ করতে হত। পত্রলেখা, মনসামঙ্গল প্রভৃতি তাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল।[২৬]

কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার সাথে মিল রেখে বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এগুলো বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ সংস্কৃত উদ্ভূত বাংলার সাথে পরিচিত ছিল না। এটা ব্যতীত এই পাঠ্যপুস্তকগুলো হিন্দুধর্ম ও উপকথা সম্বন্ধীয় ছিল।[২৭] এজন্য মুসলমানগণ সাধারণত পাঠশালাগুলোতে শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণ করতে উৎসাহ পেত না।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য মিশনারীগণ বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ১৭৯৩ সালে উইলিয়ম কেরী নামক খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। ১৭৯৪ সালে তিনি মালদহ জেলার সদনহাটি নীলকুঠিতে একটি বাংলা বিদ্যালয় শুরু করেন। ১৮০০ সালে কেরী শ্রীরামপুর মিশসনারী সোসাইটির

Dhaka University Institutional Repository

কাজে যোগ দেন এবং সেখানে ছাপা খানা স্থাপন করেন ও সমাচার দর্পন নামে বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকা বের করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইলার্টন নামক একজন নীলকর মালদহ জেলায় কয়েকটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং ছাত্রদের জন্য বাংলা ভাষায় কয়েকটি পাঠ্য বই লিখেন। ১৮১৪ সালে মে নামক একজন মিশানারী ওলন্দাজদের উপনিবেশ চিনসুরায় একটি বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি ১৬টি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার উদ্যোগে কয়েক বৎসরের মধ্যে চিনসুরায় ২৬টি ও ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানে ১০ টি বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৫ সালে লর্ড হেষ্টিংস এই বিদ্যালয়গুলোর জন্য মাসিক ৬০০ টাকা সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। ১৮১৮ সালে এই বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৩০০০ জন ছাত্র লেখাপড়া শিখত। মের মৃত্যুর পর পিয়ারসন বিদ্যালয়গুলো তত্ত্বাবধানের কাজ গ্রহণ করেন। পিয়ারসন ও হার্লি চন্দরনগর ও কালনা অঞ্চলে কয়েকটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কোম্পানীর সরকার এই বিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থ সাহায্য করে। মিশনারীগণ ছাত্রদের ব্যবহারোপযোগী কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। স্টুয়ার্টের অধীনে চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমান বাংলা বিদ্যালয় শুরু করেন। ১৮১৮ সালের মধ্যে বর্ধমানে ১০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এদের ছাত্রসংখ্যা ১০০০ ছিল।[২৮]

কোম্পানীর শাসনের আরম্ভ হতে কলকাতা একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কেন্দ্রে উন্নীত হয়। বেপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি এবং চার্চ মিশনারী এসোসিয়েশন কলকাতাও এর উপকণ্ঠে অনেকগুলো বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করে।[২৯] এদের উদ্যোগে ১৮১৭ সালে 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। সস্তা দামের বই প্রকাশ করা এর উদ্দেশ্য ছিল। কয়েকজন ইংরেজ হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নিয়ে এর কার্য নির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। ১৮২১ সালে সরকার এর জন্য এককালীন ৭০০০ টাকা দান করে এবং মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই বৎসর পর্যন্ত সোসাইটি প্রধানতঃ প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে ১২৬,৪৪৬ কপি বই প্রকাশ করে। ১৮১৮ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়গুলোর উন্নতির ব্যবস্থা করাও নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা কলকাতা স্কুল সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

১৮২১ সালে এর অধীনে ১১৫টি বাংলা বিদ্যালয় ছিল এবং এইগুলোতে মোট ৩৮২৮ জন ছাত্র ছিল। ১৮২৩ সালে সরকার এই সোসাইটির জন্য মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করে।[৩০] ১৮২১ সালে চার্চ মিশানারী সোসাইটির সহযোগিতায় মিসকুক কলকাতায় কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দুই বৎসরে কলকাতা ও এর উপকণ্ঠে ২২টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪ সালে কলকাতায় সেন্টাল স্কুল স্থাপিত হয়।[৩১] এই সময় শ্রীরামপুর মিশনারীদের চেষ্টায় বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩২]

শ্রীরামপুর মিশনারীগণ ঢাকায় কয়েকটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২৩ সালে ঢাকা ও এর উপকণ্ঠের বিদ্যালয়গুলোর তত্ত্বাবধানের জন্য একটি বেসরকারী সোসাইটি গঠিত হয়। ১৮২৬ সালে এই সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ২৫টি বিদ্যালয় ছিল এবং এদের ছাত্র সংখ্যা ১৪১৪ ছিল। এডামের তদন্তের সময় ঢাকায় ৮টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল এবংএই গুলোতে ২৪৯ জন ছাত্রী ছিল।[৩৩] এডাম মিশনারীতে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন জেলার বাংলা বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা দিয়েছেন। ঃ চব্বিশ পরগণা ৩৬, যশোহর ৪, নদীয়া ১, বাকরগঞ্জ১, চট্টগ্রাম ২, ত্রিপুরা ১, রাজশাহী ১, দিনাজপুর ১, মুর্শিদাবাদ ২, বীরভূম ২।[৩৪] মিশানারী বাংলা বিদ্যালয় খ্রীষ্টধর্মীয় বই তালিকায় অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। এই কারণে মুসলমান ছাত্রগণ এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।

ইংরাজী শিক্ষা ঃ সরকারের নীতি

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় প্রথম হতেই বৃটিশ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে। কলকাতার বিত্তশালী হিন্দুদের উদ্যোগে ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়। তারা ১৮০০ সালে কলকাতার ভবানীপুরে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করে। চিনসুরার ম্যাজিস্ট্রেট ফর্বিসের পৃষ্টপোষকতায় ১৮১৪ সালে সেখানে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৫] রাজা রামহোমন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং আর ও কয়েকজন হিন্দু নেতার প্রচেষ্টার ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ডেভিড হেয়ার ও সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইর্ড ইস্ট হিন্দু কলেজের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। এই

Dhaka University Institutional Repository

কলেজে শুধু হিন্দু ছাত্র ভর্তি করা হত।[৩৬] হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে কলকাতা ও পাশ্ববর্তী জেলাগুলোতে কয়েকটি ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কয়েকটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৮৩৫-৩৬ সালে কলকাতাও এর নিকটবর্তী এলাকায় ২০টি ইংরোজি বিদ্যালয় ছিল এবং এগুলোতে ৬০০০ ছাত্র শিক্ষালাভ করত।[৩৭]

খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য খ্রীস্টান মিশনারীগণ বাংলাদেশে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে উদ্যোগী হয়। ১৭৩১ সালে সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব দি খ্রীস্টান নলেজ (Society for the promotion of the Christian Knowledge) নামক ধর্মপ্রচাকদের একটি দল কলকাতায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে । এই বিদ্যালয়ে বিনা খরচে শিক্ষা দেওয়া হত। ১৭৫৮ সালে সুইডেনের ধর্মপ্রচারক জাকারিয়া কিয়ারনাণ্ডার কলকাতায় অন্য একটি ইংরেজী বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিমানারীগণ কয়েকটি প্রাথমিক ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাদের প্রধান ইংরেজী বিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হয়।[৩৮] মিশনারীগণ মনে করত যে, ইংরেজী জ্ঞান লাভ করলে হিন্দুগণ মূর্তি পূজার অসারতা বুঝতে পারবে এবং তাদেরকে খ্রীস্ট ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা যাবে।[৩৯]

যখন হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভ করে তখন তারা ফার্সীর স্থলে ইংরেজী ভাষাকে সরকারী করার জন্য দাবী করে। ১৮২৮ সালের ২৬ শে জানুয়ারী একটি বাংলা সাপ্তাহিক লিখেছে, "ফার্সী বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়। এটা বিচারক, উকিল, বাদী বিবাদী অথবা সাক্ষী কারই ভাষা নয়। অমরা মনে করি, যদি কোন বিদেশী ভাষাকে আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহার করা হয় তাহলে ইংরাজি ভাষাই গ্রহণ করা উচিত। এতদিন ইংরাজিকে সরকারী ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, বাঙালী জাতি ইংরেজি জানেন না। কিন্তু এখন সে আপত্তি টিকিতে পারে না। এখন হিন্দু কলেজে ৪০০ ছাত্র ইংরেজী শিখছে। কলকাতার অন্যান্য স্কুলগুলোতে কমপক্ষে এক হাজার ছাত্র ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছে ইংরেজী ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

তাদের যে জ্ঞান হয়েছে তাতে তাদের পক্ষে এই ভাষায় আদালতের কাজ চালান কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। সরকার যাতে ফার্সীর জায়গায় ইংরেজীকে আদালতে ভাষারূপে প্রচলন করে সেজন্য কলকাতাবাসীদের আবেদন করা উচিত। যদি এই আবেদন গ্রাহ্য করা হয় তাহলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার হবে।" ১৮৩৪ সালের ১৯ মার্চ এই সাপ্তাহিকী সরকারের নিকট দাবী করে যে, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি জ্ঞান যোগ্যতার প্রধান গুণ বলে গ্রহণ করা উচিত।[৪০]

অর্ধ শতাব্দী কাল কোম্পানীর সরকার বাংলা-বিহারের অধিবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন ছিল। শিক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণকে নিজেদের উপর নির্ভর করতে হত। ইংরেজ শাসকগণ দেশীয় লোকদের জন্য প্রাচ্য শিক্ষা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ দিয়েছেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের উদ্যোগে ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। বেনারসের রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকানের উৎসাহে ১৭৯১ সালে সেখানে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ বিচারকদের সাহায্যের জন্য পণ্ডিতদেরকে শিক্ষা দেওয়া এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলী কলকাতায় ফোর্ট উউলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। ইংরেজ কর্মচারীদেরকে বাংলা সংস্কৃত, ফার্সী , হিন্দুস্থানী, মারঠী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই কলেজ স্থাপিত হয়।[৪১]

কলকাতা মাদ্রাসা ঃ ফার্সী আদালতের ভাষা ছিল। দারোগা, কাজী, মৌলবী, মুনশী, উকিল ও আদালতের সংশ্লিষ্ট লোকের জন্য ফার্সী ভাষা ও মুসলিম আইনে জ্ঞান অপরিহার্য ছিল। এদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস একটি উচ্চমানের ফার্সী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ১৭৮০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতার শিক্ষিত ও বিশিষ্ট মুসলমানগণ কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য তার নিকট আবেদন করেন। তাদের আবেদন ক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংস অক্টোবর মাসে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং আরবী ও ফার্সী বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন মজিদউদ্দিনকে এর প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি ব্যক্তিগত তহবিল হতে মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। ১৭৮১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কাউন্সিলে প্রস্তাব করেন যে, মাদ্রাসার ব্যয়ভার সরকারের বহন করা উচিত। কাউন্সিল এই প্রস্তাবের সুপারিশ করে ডাইরেক্টর বোর্ডের নিকট পাঠান। এই সময় কলকাতা মাদ্রাসায় ৪০ জন আবাসিক ছাত্র ছিল। অনাবাসিক ছাত্রদেরকে বিনা বেতনে পড়ানো হত। ১৭৮২ সালের ৩রা জুন কোম্পানীর সরকার মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য চব্বিশ পরগনা জেলার কয়েকটি গ্রামের রাজস্ব দান করে। মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য এই আয় অপ্রতুল হওয়ার ১৭৮৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপারিশ ক্রমে সরকার অতিরিক্ত দানের ব্যবস্থা করে। এর ফলে মাদ্রাসার জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৎসরে ২৯, ০০০০ টাকা হয়।[৪২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কোম্পানীর শাসকগণ বুঝতে পারেন যে, সরকার সাম্রজ্যের প্রজাদের শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভাবে উদাসীন থাকতে পারে না, শিক্ষার কিছুটা দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা উচিত। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে ব্যবস্থা হয় যে, ভারতের প্রজাদের শিক্ষার জন্য কোম্পানীর বাজেটে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকবে। ডাইরেক্টর বোর্ড এই টাকা সংস্কৃত শিক্ষায় ব্যয় করবার জন্য সুপারিশ করেন। আরবী ফার্সী শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের কোন উল্লেখ করা হয়নি।[৪৩] শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার ১৮২৩ সালে জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি (General Committee of public Instruction) গঠন করে। এইচ, উইলসন সংস্কৃত শিক্ষার ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের জন্য প্রচুর সাহায্যের ব্যবস্থা করেন; মাদ্রাসার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেননি ।[৪৪] ১৮২৫ সালে জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি কলকাতায় একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করে এবং হিন্দু কলেজের উন্নতির জন্য সুপারিশ করে। এর ফলে হিন্দু কলেজে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজী ক্লাশ খোলা হয়। কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বিলম্ব করা হয়। ১৮২৯ সালে মাদ্রাসায় ইংরাজি ক্লাশ শিক্ষা-ব্যবস্থা কলকাতা ও এর উপকণ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এতে হিন্দুগণ এই ব্যবস্থা হতে

Dhaka University Institutional Repository

উপকৃত হয়। পূর্ব বাংলা ও উত্তর বাংলার শিক্ষার প্রতি সরকারের দৃষ্টি ছিল না। মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সেখানে ১৮২৪ সালে সরকার একটি প্রাথমিক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করে। সরকার তাদের দাবী আগ্রহ্য করে। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশে কেবল কলকাতা মাদ্রাসায় অল্প কয়েকজন মুসলমান ছাত্র সামান্য ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পায়। ১৮৩০ সালে এই মাদ্রাসায় মাত্র ৮৭ জন ছাত্র প্রাথমিক ইংরেজী শেখে। অন্য দিকে বিভিন্ন ইংরেজি বিদ্যালয়ে ও হিন্দু কলেজে প্রতি বৎসর কয়েক হাজার হিন্দু যুবক ইংরেজী জ্ঞান অর্জন করে বের হয়ে আসে।

শিক্ষা বিতর্ক ঃ শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হবে, বিশেষত শিক্ষার মাধ্যম কি হবে সে বিষয়ে জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি কোনো নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেনরি। সমিতির কয়েকজন সদস্য প্রাচ্য ভাষাকে উৎসাহ দানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তারা বিশ্বাস করতেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রাচ্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। আবার কয়েকজন সদস্য ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৮৩৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় আরবীর সাথে ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামুলক করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে ১৯৩৫ সালে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে জনশিক্ষা সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তুমল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সদস্যগণ দুই দলে বিভিক্ত হয়ে যায়, একদল প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থক ও অন্যদল পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থকগণ মনে করেন যে, ভারতীয়দের জন্য তাদের প্রাচীন শিক্ষা বজায় রখা উচিত এবং এই শিক্ষার সাথে তাদের নিজেদের ভাষায় কিছুটা ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তারা উপকৃত হবে। পাশ্চাত্যপন্থীগণ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই সময় লর্ড মেকলে জনশিক্ষা সাধারণ সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার একজন বড় সমর্থক ছিলেন। প্রাচ্য শিক্ষার প্রতি তার সংকীর্ণ ধারণা ছিল। তিনি বলেছেন, একটি ভাল ইউরোপীয় লাইব্রেরীর এক সেলফোন বইরের মূল্য ভারতীয় ও আরবী সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থের

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যের সমান।[৪৫] ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে বৃটিশ শাসনের পক্ষে যে সকল রাজনৈতিক সুবিধার সৃষ্টি হবে সেগুলোর প্রতিও তিনি সরকারের দৃষ্টি আকষর্ণ করেন। তিনি বলেন যে, ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতে এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হবে যারা রক্ত ও রঙ্গে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, চিন্তাধারা, নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হয়ে পড়বে।[৪৬]

কোন কোন ইংরেজ মনে করতেন যে, ইরেজী শিক্ষা প্রচলিত হলে ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রসারের সুবিধা হবে। চার্লস গ্রান্টকে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার জনক বলে গণ্য করা হয়, কারণ তিনি ভারতের ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে খুব উৎসাহী ছিলেন। ১৭৯২ সালে তিনি পার্লামেন্টে বলেন, "প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যিকার জ্ঞান বিচ্ছুরিত হলে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিধ্বসে পড়বে যান্ত্রিক আবিষ্কারের স্থলে খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। লর্ড মেকলেও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতেন। তিনি তার মাতাকে লিখেছেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা এই শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করি তা হলে ত্রিশ বৎসর পরের বাংলাদেশে কোন পৌত্তলিক থাকবে না।[৪৭]

বড় লাই লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক মেকলে ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শিক্ষাপন্থীদের সাথে একমত হন। ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারত সরকার ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দান করবে এবং শিক্ষাখাতে বরাদ্ধকৃত অর্থ শুধু ইংরেজী শিক্ষায় ব্যয় করবে।[৪৮] এর দুই বৎসর পর ১৯৩৭ সালে সরকার ফার্সীর স্থলে ইংরেজীকে সরকারী ভাষারূপে প্রচলন করে। সরকারী ভাষা পরিবর্তনের ব্যাপারে পূর্বে কোন আভাস দেওয়া হয়নি। মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহন করেনি। এর ফলে চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের খুব ক্ষতি হয়। জনশিক্ষা গ্রহণ করেনি। এর ফলে চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের খুব ক্ষতি হয়। জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করে। মুসলমান ও হিন্দুদের আবেদনের ফলে এদের অস্তিত্ব বজায় থাকে। কিন্তু এদের ছাত্রদেরকে যে বৃত্তি দেওয়া হতো তা বন্ধ হওয়ার দরুন তারা অসুবধায় পড়ে। লর্ড অকল্যাণ্ড মেধাবী ছাত্রদের জন্য সাধারণ প্রতিযোগিতার বিত্তিতে কয়েকটি বৃত্তির ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

করেন মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজী জ্ঞান খুব সামান্য ছিল, ইংরেজী বিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় তাদের পক্ষে বৃত্তি লাভ করা সম্ভব ছিল না।[৪৯]

১৮৩৬ সালে সরকার কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে। এই কলেজে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৮ সালে মেডিকেল কলেজ সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজে আইন ক্লাস আরম্ভ হয়। সরকার ১৮৩৬ সালে মহসিন ফান্ডে টাকায় হুগলী কলেজ স্থাপন করে। ১৮৪২ সালে শিক্ষার তত্ত্বধানের জন্য জনশিক্ষা সাধারণ সমিতির স্থালে (Education Council) শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। ১৮৪৪ সালে ভারতীয়দেরকে নিম্নতর সরকারী পদে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৮) ইংরেজী শিক্ষা প্রসার লাভ করে। এই সময় কৃষ্ণনগর কলেজ এবং বর্ধমান, বাকুড়া, বারাসত ও বগুড়ায় জেলা স্কুল স্থাপিত হয়।

স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে কলকাতায় কয়েকটি কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মতিলাল শীল একটি অবৈতনিক কলেজ ও স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৫৩ সালে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপিত হয়। পরে এটা ফ্রি কলেজ ও ডেভিড হেয়ার একাডেমীর সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি কলেজে পরিণত হয়। শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ১৮৪৯ সালে কলকাতায় একটি মহিলা স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৫০] ১৮৩৫ সালে ঢাকায় প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্থানীয় সমিতি এটা কলেজে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৮৪১ সালে কলকাতার বিশপ এই কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৪৬ সালে এই কলেজে ক্লাশ শুরু হয়।

১৮৪৪ সালে সরকার প্রতি জেলায় বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলা বিহার উড়িষ্যার ৩৬টি জেলায় মোট ১০১টি বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা হয়। প্রতি জেলায় দুই তিনটি শহরে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এদেরকে রেভেনিউ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। বিদ্যালগুলোকে বোর্ড স্কুল বলা হত।[৫১] বোর্ড স্কুলগুলোতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এই সময় শহরের লোকদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ছাত্র সংখ্যা কম হওয়ায় বোর্ড স্কুলগুলো বন্ধ করে দিতে হয়। এর পর কয়েকটি জেলায় আদর্শ বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।[৫২]

১৮৫৪ সালের শিক্ষার পরিকল্পনা ঃ

ভারতে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ১৮৫৪ সালের পরিকল্পনা কয়েকটি সুপারিশ করা হয়। প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ গঠন, কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয় শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য নর্মাল স্কুলের ব্যবস্থা, মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় অন্তভুক্ত ছিল। উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংরেজী এবং নিম্ন পর্যায়ে শিক্ষার জন্য বাংলাভাষা মাধ্যম রূপে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে বলা হয়।[৫৩]

১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ হতে এর স্কুল বিভাগ পৃথক করা হয় এবং একে প্রেসিডেন্সি কলেজ নাম দেওয়া হয়। স্কুল বিভাগ হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদেরকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এই কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচ্য সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য সরকার প্রত্যেক প্রদেশে জনশিক্ষা ডাইরেক্টর নিয়োগ করে। সরকারী কলেজেগুলোতে আইন ক্লাস খোলা হয়। ১৮৫৮ সালে কলকাতায় প্রকৌশল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা ও হুগলীতে নর্মাল স্কুল ও এদের সংশ্লিষ্ট আদর্শ বিদ্যালয় খোলা হয়। নর্মাল স্কুলে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে। জ্ঞান অত্যাবশ্যক ছিল। এজন্য সেখানে মুসলমান শিক্ষার্থীদের প্রবেশ দু:সাধ্য ছিল। ৪৬ শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৪]

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবনতি

কোম্পানীর আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানগণ খুব পিছনে পড়েছে যায়। এডামের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিহুত ও দক্ষিণ বিহারের আরবী ফার্সী বিদ্যালয়গুলোতে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা ২০৯৬ এবং মুসলমান ছাত্রদের

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা ১৫৫৮ ছিল। বাংলা বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা আরও কম ছিল : মুর্শিদাবাদ জেলায় ৯৯৮ জন হিন্দু ও ৬২ মুসলমান, বর্ধনমান জেলায় ১২৪০৮ জন হিন্দু ও ৭৬৯ জন মুসলমান এবং বীরভুম জেলায় ৬১২৫ জন হিন্দু ও ২৩২ জন মুসলমান ছাত্র ছিল।[৫৫] বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোতে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। মুসলমানদের অধিকাংশ গ্রামে বাস করত এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। এডাম উপলব্ধি করেন যে, গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সরকার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার প্রতি উদসীন ছিল। তাছাড়া কোম্পানীর শাসকগণ নিস্কর জমি বযয়াফত করেন এবং মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলোর দান-সম্পত্তি অন্য কাজে ব্যবহার করেন। এডাম সরকারের এই নীতির সমালোচনা করেন। যদি সরকার এগুলো এদের আসল উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ব্যবস্থা করত, তাহলে মুসলমানদের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হত এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজ সহজ হত।[৫৬]

সরকার হাজী মুহম্মদ মহসিনের ওয়াকফ সম্পত্তি আসল উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে অন্যভাবে ব্যবহার করছিল। ১৮০৬ সালে ধর্মপ্রাণ মহসিন তাঁর বিরাট সম্পত্তি উইল করে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য দান করে যান।[৫৭] মহসিন ওয়াকফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য দুইজন মুতাওয়াল্লী ছিল। এই মুতাওয়াল্লীদের মদ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায়, ১৮১৭ সালে সরকার এই ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে। সরকার একজন মুতাওয়াল্লীর স্থান গ্রহণ করে এবং অন্য একজন মুতাওয়াল্লী মানোনীত করে। ১৮৩১ সালে মহসিন ওয়াকফ সম্পত্তির তহবিলে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ছিল্ সরকার ইমামবারা ও একজন মুতাওয়াল্লীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ করে অবশিষ্ট অর্থ ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করে এবং এর সুদ হতে যা আয় হত তা শিক্ষা কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করে। জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি এই ফান্ডের টাকায় হুগলীতে একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করে। প্রস্তাব করা হয় যে, কলেজের দুইটি বিভাগ থাকবে, ইংরেজী বিভাগ ও আরবী-ফার্সী বিভাগ; কলেজে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র ভর্তি হতে পারবে এবং ছাত্রদের নিকট হতে বেতন নেয়া হবে।[৫৮] কলেজ স্থাপনের কাজে ১,৪০,০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এর বাৎসরিক ব্যয়ের জন্য ৫৪,০০০ টাকা বরাদ্দ হয়। ১৮৩৬ সাল হুগলী কলেজে ক্লাস আরম্ভ হয়। দুই বৎসর পর কলেজের সাথে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। হুগলী কলেজ, ইংরেজী স্কুল ও প্রাইমারী স্কুলে প্রথম হতেই হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা বেশী হয়। কলেজে ও স্কুলের ইংরেজী শিক্ষা মুসলমানদের উপযোগী ছিল না। তাছাড়া গরীর মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে বেতন দেওয়া কষ্টসাদ্য ছিল। এতে মুসলমানগণ মহসিনের দান-সম্পত্তি হতে উপকার পাইনি। সরকার কর্তৃক মহসিন ফাণ্ডের অপব্যবহারের সমালোচনা করে হান্টার লিখেছেন "এই আত্মাসাতের অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা বড়ই কষ্টদায়ক, কারন এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।"[৫৯]

১৮৩৪ সালে সরকার এই সম্পত্তি বাযয়াফত করে এবং এজন্য বার্ষিক ১৪১৭ টাকা ধার্য করে। এর কয়েক বৎসরের রাজস্বের আয় সরকারের তহবিলে জমা হয়। ১৮৪০ সালে সরকার এই ফাণ্ডের টাকা এবং দান সম্পত্তির বাৎসরিক আয় একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ করে। এই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষক হিন্দু ছিল। যদিও ভুসম্পত্তি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য করা হয়, তবু এই বিদ্যালয়ে দরিদ্র মুসলমান ছাত্রগণ শিক্ষার ব্যাপারে কোনরূপ আর্থিক সুবিধা পাইনি।[৬০]

সরকার মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইংরেজী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেনি। ১৮২৯ সালে যখন কলকাতা মাদ্রাসায় আরবী-ফার্সী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হয় তখন মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এর প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। প্রতি বৎসর ইংরেজী ক্লাসে ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মাদ্রাসায় যোগ্য ইংরেজী শিক্ষকের অভাব ছিল। এর ফলে ইংরেজীর মান খুবই প্রাথমিক স্তরের হয়। ১৮৫০-৫১ সালের একটি তদন্ত রির্পোট হতে জানা যায় যে, কলকাতা মাদ্রাসার ৯০ জন ইংরেজীর ছাত্রের জন্য মাত্র একজন ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি বর্ণমালা হতে আরম্ভ করে গোলডস্মিথ, ওয়াটস, ইউক্লিড প্রভৃতি বিষয় পড়াতেন। ইউড্রো লিখেছেন, "মাদ্রাসার ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা যেটুকু উন্নতি করেছে তা তাদের আগ্রহ ও অধ্যবসায় এবং শিক্ষকের দৈর্য্য ও পরিশ্রমের ফলে সম্ভব হয়েছে।" এর পরেও মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়নি । সরকারী জেলাস্কুলগুলোতে আরবী-ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

ছিলনা। শিক্ষাপরিষদ উপলব্ধি করে যে, ইংরেজী শিক্ষার সাথে আরবী-ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে তা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এই বিষয়ে বহুদিন পর্যন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।[৬১]

১৮৫৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা পুনগর্ঠিত হয়। ইংরেজী আরবী ক্লাসের স্থলে একটি ইংরেজী-ফার্সী বিভাগ খোলা হয়। ইংরেজী ও ফার্সী ছাড়াও মাদ্রাসায় উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। নিম্নমান পর্যন্ত ইংরেজী বাধ্যতামুলক করা হয়। এরপর যারা ইংরেজী শিক্ষা পেতে ইচ্ছুক তাদেরকে মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি করার এবং যারা আরবী শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় শিক্ষা পরিষদ কলকাতার মুসলমান অধ্যুষিত কলিঙ্গা অঞ্চলে একটি শাখা বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই ব্যবস্থার ফলে কলকাতার মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে কিছুটা সুবিধা হয়।[৬২] কিন্তু কলেজ ও স্কুলগুলোতে আরবী ও ফার্সীর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ক্রমাগত দাবীর ফলে ১৮৫৫ সালে ঢাকায় ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। মিশনারী স্কুল ও কলেজের পাঠ্যতালিকা মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। হিন্দুদের পরিচালিত স্কুল ও কলেজে মুসলমানদের ভর্তির সুযোগ খুব কম ছিল। বাংলা বিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যতালিকা মুসলমানদের শিক্ষার উপযোগী না হওয়ায় তারা সেখানে ভর্তি হতে উৎসাহ পেত না। বিদ্যালয়গুলোতে যে সংস্কৃত উদ্ভূত বাংলা শিক্ষা দেওয়া হত তা মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়ত, কারন তারা কথ্য ভাষা ব্যবহার করত। তাছাড়া বাংলা পাঠ্যপুস্তক দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনীতে পূর্ণ ছিল।[৬৩]

শিক্ষা-পদ্ধতির গলদঃ

বৃটিশ সরকার বাংলাদেশে যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করে তা মুসলামানদের প্রয়োজনীয় উপযোগী হয়নি। এই সম্বন্ধে ই.সি বেইলী বলেছেন, "শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ ছিল। এটা প্রবর্তন করার সময় তাদের সংস্কার সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা কর হয়নি এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। এজন্য শিক্ষাপদ্ধতি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতিকূল হয়ে পড়ে।"[৬৪] বেইলী মন্তব্য করেছেন, "সত্য কথা বলতে কি গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের জনশিক্ষা পদ্ধতি তিনটি বিষয়ে মুসলমানদের প্রবল মানসিক বৃত্তি উপক্ষো করেছে।" তিনি বলেছেন যে, প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা মুসলমানদের মনঃপূত হয়নি এবং হিন্দু শিক্ষক ও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাছাড়া গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষা দেওয়া হত তা মুসলমান ছাত্রদেরকে সামাজিক জীবনে শ্রদ্ধার আসন পেতে ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে সাহায্য করত না। জেলা স্কুলগুলোতেও আরবী-ফার্সী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। জনশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান ছিল না। মুসলমানগণ সাধারণ শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষা অত্যাবশ্যক বলে মনে করত।[৬৫]

ছাত্রদের নিকট হতে কড়াকড়িভাবে বেতন আদায় করা হত। পাঠ্য পুস্তক ব্যয়সাধ্য ছিল। আর্থিক অসঙ্গতির দরুন মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে বিদ্যালয়ে পড়ার খরচ বহন করা কঠিন ছিল। সরকারের পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল অবস্থাপন্ন লোকগণই লেখাপড়া করতে পারত। ইন্সপেক্টর লজের মন্তব্য হতে এই নীতি প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন, যদি কোন দেশীয় লোক এরূপ দরিদ্র যে, সে মাসে চার আনা বেতন দিতে পারে না, তাহলে তার পক্ষে মজুরী করে জীবন ধারণ করা ও তার পিতার পেশা বজায় রাখা উচিত। তার পক্ষে জীবন ব্যাপী অন্যের উপর নির্ভর করে থাকা এবং অন্যের সাহায্যে অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করা উচিত হবে না। কোন বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির ছাত্র বেতন কমাতে দিয়েছিল। এর সমালোচনা করে সরকারী মন্তব্যে লেখা হয়, "নিঃস্ব লোকের ও মজুরদের উপকারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। যে সকল লোক তাদের অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা হতে উপকার পেতে পারে তাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেবল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের শিক্ষা নীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য।"[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার ব্যাপারে সরকার যে আর্থিক সাহায্য করত তাতে মুসলমানদের উপকার হতো না। স্কুলের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। এর জন্য একটি শর্ত ছিল। স্থানীয় লোকগণ নিজেদের সামর্থে স্কুল স্থাপন করতে পারলে এর জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হত।[৬৭] সঙ্গতিহীন মুসলমানদের পক্ষে এই শর্ত পূরণ করা সম্ভব ছিল না। অবস্থাপন্ন হিন্দুগণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সরকারী সাহায্যের সুবিধা লাভ করে। বৃত্তির ব্যাপারেও মুসলমানগণ ভাল ইংরেজী জ্ঞানের অভাবে হিন্দু ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারত না এবং বৃত্তি লাভ করতে সমর্থ হত না। তাছাড়া বৃটিশ সরকারের শিক্ষা নীতি মতবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার শিক্ষার প্রতি সরকার উদাসীন ছিল। এজন্য অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ শিক্ষার সুযোগ পায়নি।[৬৮]

নানা কারণে মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে পিছনে পড়ে যায়। ১৮৪১ সালে বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজে মোট ৪০৩৪ জন ছাত্র ছিল এদের মধ্যে ৩১৮৮ জন হিন্দু ও ৭৫১ জন মুসলমান ছিল। মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশ কলকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। ১৮৫০-৫১ সালে ৪৬৭৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৮১৪ জন হিন্দু ও ৭৯৬ জন মুসলামন ছাত্র ছিল। মুসলমান ছাত্রদের ৪৩৩ জন কলকাতা মাদ্রাসা ও ১৪৫ জন হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। হুগলী কলেজে ৩৮৯ জন হিন্দু ও ৬ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। ঢাকা কলেজ ও স্কুলের মোট ৩৮৩ জন ছাত্রের মধ্যে ২৯ জন মুসলমান ছিল। ১৮৫৫-৫৬ সালে মোট ৭২১৬ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৩১ জন মুসলমান ছিল। এদের ১৮৫ জন কলকাতার মাদ্রাসায়, ১৭৫ জন হুগলী মাদ্রাসায় ও ৭ জন হুগলী কলেজে ছিল। ঢাকা কলেজ ও স্কুলের মোট ৭৫৫ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্রা ২৪ জন মুসলমান ছিল। ১৮৬৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে হিন্দুদের ৯ জন এম.এ ৪১ জন বি.এ ও ১৭ জন আইন ডিগ্রী লাভ করে। এই বৎসর মাত্র ১ জন মুসলমান বি.এ ডিগ্রী পায়। যে সকল ছাত্র মেডিকেল ডিগ্রী পায় তাদের সকলেই হিন্দু ছিল। ১৮৬৭ সালে মোট ৮৮ জন হিন্দু ছাত্র. বি.এ ও এম.এ ডিগ্রী লাভ করে। কোন মুসলমান এই বৎসর বি.এ বা এম. এ ডিগ্রী পাইনি।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৮ হতে ১৮৭৭ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রকৌশল শিক্ষায় ৩১৫৫ জন হিন্দু ও ৫৭ জন মুসলমান ডিগ্রী পায়। ডিগ্রীধারী মুসলমানদের ৩০ জন বি.এ ও ৫ জন এম.এ ডিগ্রীধারী ছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৮৯৩ পর্যন্ত যে সকল মুসলমান ডিগ্রী পায় তাদের সংখ্যা ছিল কলকাতা ২৯০, মাদ্রাজ ২৯, বোম্বাই ৩০, পাঞ্জাব ১০২ ও এলাহাবাদ ১০২। ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদ শ্বিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আলীগড় কলেজ হতে ১০ জন ডিগ্রী লাভ করে। ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৩ সালের মধ্যে আলীগড় কলেজ হতে খুব কম সংখ্যক ছাত্র ডিগ্রী পায়।[৭০]

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের কারণেই মূলতঃ মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষা বর্জন করে। কারণ তারা নানাভাবে অত্যাচারিত হতো। এই জন্য সুযোগ পেলেই মুসলমানরা আক্রমণ করে বসত (দৃষ্টান্ত স্বরূপ সিপাহী বিদ্রোহ)।

আর তাই ইংরেজ শাসকদের প্রতি তাদের যে ক্ষোভ ও আক্রোশ আছে, এটা তারা বুঝতে পারেন। মুসলমানরা সামাজিক ও আর্থিক দুর্গতির জন্য ইংরেজদের দায়ী করতেন। সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, বিদ্রোহ দমন করতে খরচ হয় চার কোটি টাকা। সুতরাং ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করে তারা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগের প্রতি নজর দেন।[৭১] কিন্তু শিক্ষার অভাবই মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ ছিল। এজন্য তারা; কিভাবে শিক্ষা বিস্তার করা যায়, সেদিকে প্রথম মনোনিবেশ করেন। সে সময় মোটামুটি আলোকপ্রাপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ, কর্মপটু ও উদ্দোমী পুরুষ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে আব্দুল লতিফ ও উত্তর প্রদেশ থেকে সৈয়দ আহমেদকে নির্বাচন করা হয়। আব্দুল লতিফের অব্যবহিত পরেই সৈয়দ আলীর আবির্ভাব হয়। তাঁদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনে কোন দ্বিমত ছিল না। আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী ব্যক্তিগত ভাবেও সমিতির মাধ্যমে যৌথভাবে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন।[৭২]

এজন্য তারা এ সময় শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন। তারা ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন সাধান করে সেগুলোতে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করে কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসায় এ্যাংলো-আরবি ও এ্যাংলো-ফারসি বিভাগ পূর্ব থেকে চালু ছিল। ১৮৭৪ সালে মহসীন ফাণ্ডের টাকায় রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা খোলা হয়। মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল। মহসীন ফাণ্ডের টাকা থেকে ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয় ৯টি জেলা-স্কুলে ফারসি শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং স্কুল ও কলেজের মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ ঐ ফাণ্ড থেকে প্রদান করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[৭৩] ১৮৮৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগে এফ.এ ক্লাস পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৮৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের সাথে ঐ বিভাগ যুক্ত করা হয় যার ফলে মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রেসিডেন্সীতে ক্লাস করার সুযোগ পায়।[৭৪] মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন হয় এবং একটি পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিভাবে শিক্ষার হার বাড়ানো যায় তার জন্য সরকার নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তির করা হয় এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রের পড়ার সুযোগ হয়। পূর্বে হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্র ভর্তি হতে পারত না। ১৮৭১ সালে বড়লাট লর্ড মেয়োর (১৮৬৯-৭২) সাথে এক সাক্ষাতের সুযোগে আবদুল লতিফ ভারতের মুসলমানের শোচনীয় দুরবস্থা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কথা বলেন। তিনি মহসীন ফাণ্ডের অপব্যবহারের প্রতিও বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট ঐ বছর মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবি-ফারসি পড়ার ব্যবস্থা গ্রহণের এবং বিদ্যালগুলোতে মুসলামন শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৭৫] স্পষ্টতঃই পস্তাবটিতে উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতির প্রতিফলন ঘটেছে। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার অবস্থা তদন্ত করার জন্য ১৮৮২ সালে হান্টারকে সভাপতি করে 'এডুকেশন কমিশন' গঠিত হয়। হান্টার মুসলমান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আবদুল লতিফ কমিশনে সাক্ষ্য দেন এবং একটি লিখিত 'স্মারকলিপি' প্রদান করেন। সৈয়দ আমীর আলীও সাক্ষ্য দেন। তিনি 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোনিয়েশনে'র পক্ষ থেকে বড়লাট লর্ড রিপনকে (১৮৮০-৮৪) যে 'স্মারকলিপি' দিয়েছেন, সেটিও কমিশনের কাছে প্রেরিত হয়। এসব সাক্ষ্য, স্মারকলিপি ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা কমিশন মুসলিম শিক্ষা শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে (১৫শ অধ্যায়) প্রস্তাবাকারে ১৮টি সুপারিশ পেশ করেন।[৭৬] ১৮৮৫ সালে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ, এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ব্যক্তিগত বিভিন্ন আবেদনপত্র একত্রে বিবেচনা করে বড়লার্ট ডাফরিন (১৮৮৪-৮৪) কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে শিক্ষা কমিশনের যথাক্রমে ৮, ১১, ১৪ ও ১৬ সংখ্যক সুপারিশ গৃহীত হয়। শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের সরকারি চাকুরীতে পৃথক ভাবে সুবিধা দানের প্রস্তাবটি (১৭-সংখ্যক

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ) পক্ষপাতিত্বের কারণে সরকার নাকচ করে দেন।[৭৭] স্যার আজিজুল হক হান্টারের ১৭ দফা সুপারিশসমূহকে বাংলার মুসলমানের শিক্ষা-অধিকারের সনদ বলে উল্লেখ করেন।[৭৮] সৈয়দ আমীর আলী ডাফরিনের গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে মুসলিম অধিকারের 'ম্যাগনা কার্টা' হিসেবে অভিনন্দিত করেন।[৭৯]

মুসলমান নেতৃবৃন্দের শিক্ষা আন্দোলন, সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি সমাজ মানসের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে মুসলমান সমাজে পূর্বে যে অচল অবস্থায় উদ্ভব হয়েছিল, তা ক্রমশ অপসারিত হয় এবং প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষার হার পরিমিতি না হলেও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্যার আজিজুল হক 'হিস্টরি এণ্ড প্রবলেমস অব মুসলিমস এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯১৭) গ্রন্থে ১৮৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে মুসলমান ছাত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন, তালিকাটি এরূপ.[৮০]

সারণি-১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোটছাত্র সংখ্যা	মুসলমান ছাত্র সংখ্যা	হার
ইংরেজি কলেজ	২৭৩৮	১০৬	৩.৮
প্রাচ্য কলেজ	১০৮৯	১০৮৮	৯৯.১
উচ্চ বিদ্যালয়	৪৩৭৪৭	৩৮৩১	৮.৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৭৯৫৯	৫০৩২	১৩.২
দেশীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৬৪৪১	৭৭৩৫	১৩.৭
দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৮০৯৩৭	২১৭২১৬	২৪.৬
উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	-	-
মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.১

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৪৫২	১৫৭০	৮.৯
শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র (নর্মাল স্কুল)	১০০৭	৫৫	৫.৫
শিক্ষয়িত্রী শিক্ষক কেন্দ্র	৪১	-	-
অপরিদর্শিত বেসরকারি বিদ্যালয়	৫৭৩০৫	২৫২৪৪	৪৪.০

তিনি আরো বলেছেন যে, ১৮৭১ সালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ২৮১৪৮ (১৪.৪%) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮২ সালে ২৬১১০৮ (২৩%) জনে দাঁড়ায়।[৮১] সহকারি স্কুল ইন্সপেক্টর আবদুল করিম বিএ তাঁর 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে ১৮৯০-৯১ সালে বাংলার মুসলমান বিদ্যার্থীর কিরূপ অবস্থা ছিল তার একটি তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটি এরূপ :[৮২]

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্র সংখ্যা	মুসলমান ছাত্র	সংখ্যার হার
আর্টস কলেজ	৫২৩২	২৯৩	৫.৬
উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়	৭৮৭২৭	৮২৬৫	১০.৫
মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়	৬১০০০	৮৮৮৪	১৪.৫
মধ্য বাংলা বিদ্যালয়	৬৭৭৪১	১০৩২৯	১৫.২
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৮৯৫০	২৬৬৮৮	১৯.৩
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭৭৬৩২	২৭১২২২	২৭.৭
প্রফেশনাল কলেজ	১৪৯৩	৫২	৩.৫
ট্রেনিং স্কুল	১৯৮৩	২২০	১১.১
মাদ্রাসা	২৪২৬	২২৭৯	৯৭.৯
সর্বমোট	১৩৩৬৮৮৬	৩২৮৬৪৯	২৪.৫

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তা নিচের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে নির্ণয় করা যায়:[৮৩]

সারণী-৩

বৎসর	এমএ	বিএ (অনার্স)	বিএ (পাশ)	বি এল	এফএ/আই ই এ	এন্ট্রাস
১৮৮৫	১	১	৯	৩	১২	৪৪
১৮৮৬	২	১৩	২৬	৯	-	-

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৭	৩	১১	২১	৪	৩১	৫১
১৮৮৮	২	৫	১৬	৬	১৯	১১৩
১৮৮৯	৩	৭	২৩	৩	-	৫৪
১৮৯০	২	৬	২২	৮	৫৭	১২৫
১৮৯১	২	৬	১২	১২	১৬	১১০
১৮৯২	৪	৭	১৫	৮	৪৭	৮৫
১৮৯৩	-	৬	২৪	৩	৩৫	১৭২
১৮৯৪	৪	৮	২৭	৩	৩১	১৩৪
১৮৯৫	৪	৫	২৩	২	৫৯	১৫৩
১৮৯৬	২	৫	২১	১৫	৫৩	১৪১
১৯৯৭	৩	৪	১২	১২	৫২	২৪১
১৮৯৮	৩	৮	২২	৬	৬৬	১৭৮
১৮৯৯	৩	৮	২৮	৭	৬৮	২০৩
১৯০০	৫	৯	৩১	৬	৫৯	২৫৩
১৯০১	৩	৬	২১	৮	৫২	২০৯
১৯০২	৩	৪	২৩	১০	৭৯	২৫৮
১৯০৩	৫	৪	২১	৬	৬৫	১৭৬
১৯০৪	৫	৬	১৬	১৬	৭০	১৩৩
১৯০৫	২	৬	২৮	৭	৪৬	১৮০

প্রথম এম.এ (ইতিহাস) পাশ করেন সৈয়দ আমীর আলী ১৮৬৮ সালে হুগলী কলেজ থেকে। ১৮৭১ সালে আলী রেজা খান (আরবি) আগ্রা কলেজ, ১৮৭৭ সালে আমজাদ আলী (আরবি), আশরাফ আলী (আরবি), রাজা হোসেন (ফারসি) যথাক্রমে বেনারস ও মুইর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮২ সালে হাসমতুল্লাহ (আরবি) মুইর সেন্টাল কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন। ১৮৮৫ সালের আগে আর কোন মুসলমান ছাত্র এমএ পাশ করেননি। প্রথম বিএ পাশ করেন হুগলীর আহমদ (পরে দেলওয়ার হোসেন আহমদ নাম গ্রহণ করেন) প্রেসিডেনসী কলেজ থেকে ১৮৬১ সালে। ১৮৫৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট হন। ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয় মুসলমান গ্রাজুয়েট শ্রীহট্টের মোহাম্মদ দায়েম। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করেন। ১৮৬৬ সালে তৃতীয় গ্রাজুয়েট আবদুল আজিজ। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পাশ করেন। এরূপে ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ৫৫ জন। ১৮৬৯ সালে প্রথম বিএল গ্রাজুয়েট হন আমীর আলী ও ওবায়দুর রহমান। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত মোট ল গ্রাজুয়েট হন ১৬ জন। ১৮৭৮ সালে সৈয়দ হোসেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি পাশ করেন। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত আর কেউ ঐ ডিগ্রী পাননি। লাইসেন্সিয়েট ইন ল ডিগ্রী পান ১৮৬৯ সালে ১ জন এবং ১৮৭৩ সালে ৪ জন। ১৮৭১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত এম এল এস ডিগ্রী পান ১৭ জন। ১৯০০ সালে তোফায়েল আহমদ ও ১৯০৩ সালে এস.এম আবদুল আজিজ বি ই ডিগ্রী এবং ১৮৯০ সালে আবদুর রহমান এল. ই ডিগ্রী পান। উক্ত তিন জন কলকাতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করেন। ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যাতত্ত্বটি ডিগ্রী অনুযায়ী সাজালে এরূপ দাঁড়ায়ঃ[৮৪]

সারণী-৪

এম এ	৬৭
বিএ (অনার্স)	১৩৬
বিএ (পাশ)	৫০২
বি এল	১৬৮
লাইসেন্সিয়েট ইন ল	৫
এম বি	১

Dhaka University Institutional Repository

এম এল এস	১৭
বি.ই	২
এল.ই	১
সর্বমোট	৮৯৯

এর সঙ্গে ধরতে হয় বিলেত-ফেরত কয়েকজন ব্যারিস্টারকে। এই সংখ্যায় বাঙালি অবাঙালির মিশ্রণ আছে, দুদশজন রাজ পরিবার ও ধনী পরিবারের সন্তানও আছে, তবে এর অধিকাংশই যে মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান, তাতে সন্দেহ নেই।[৮৫] এন্ট্রান্স থেকে ব্যারিস্টার-এই নব্য শিক্ষিতদের সমন্বয়েই আধুনিক মুসলমান মধ্যবিত্তের গঠন ও বিকাশ হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে ধর্মীয় শিক্ষার একটি ধারা মোল্লা-মুনশীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল। এসব শিক্ষিত ব্যক্তি সরকারি-সওদাগরি অফিসে চাকুরি করেছেন, কোর্ট-কাচারিতে আইন ব্যবসায় করেছেন, স্কুল-কলেজ- ম্রাদাসায় শিক্ষকতা করেছেন, বই-পুস্তক লিখেছেন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, সভা-সমিতি গঠন করেছেন, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ও অন্যান্য আন্দোলন করেছেন। এভাবেই সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা এসেছে। ১৮৮২ সালে মুসলমানগণ সরকারি চাকরিতে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তার একটি তালিকা নিম্নরূপে দেওয়া যায়ঃ[৮৬]

সারণী-৫

কলকাতা

পদ	মুসলমান	হিন্দু	খ্রিষ্টান	মোট
পররাষ্ট্র বিভাগ	১	১৪	৩৯	৫৪
স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ	১	২৩	৩৯	৬৩
আইন, রাজনীতি ও চাকুরী নিয়োগকারী বিভাগ	২	৬৪	১৬	৮২

Dhaka University Institutional Repository

রেভিনিউ বোর্ড	১	৮৮	২৪	১১৩
কম্পট্রলার জেনেরাল অফিস	৫	২২৬	৩৪	২৬৫
পোস্টা-মাস্টার জেনেরাল অফিস	৩৭	২৩৪	৬৫	৩৩৬
ডাক বিভাগ (বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জন্য)	২২	৭৬৩	৭	৭৯২
ডাক বিভাগ (বাংলার পূর্বাঞ্চলের জন্য)	৯	১৫১	৩	১৬৩
ডাক বিভাগ (বিহার ও উড়িষ্যা)	৩৭	৩৫৩	১৯	৪০৯
জেনেরাল রেজিষ্ট্রেশন	১	৬	৩	১০
শিক্ষা বিভাগ	৩৮	৪২১	১১৪	৫৭৩
হাইকোর্ট	৯২	১৩১	২০	২৪৩
লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার অফিস	১	১১	১	১৩
ছোট আদালত	১	১৮	৮	২৭
সার্ভেয়র জেনেরাল অফিস	১০	১৮	৫৫	৮৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	২২	১৫৩	৪১	২১৬
ছোট আদালতের জজ ও সাবঅর্ডিনেট জজ	৩	৪৪	৯	৫৬
মুন্সেফ	১৪	২৪৭	-	২৬১
পুলিশ বিভাগ	৯	৩৮	১১৮	১৬৫
জনকল্যাণ বিভাগ	১৭	২১৭	১৬৭	৪০১
চিকিৎসা বিভাগ	৩	২৪	৯৮	১২৫
জনশিক্ষা বিভাগ	৬	৯৮	৫৩	১৫৭
রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ	৩	১৮	৪	২৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৬

মফস্বল (বিবিধ পদ)

	মুসলমান	হিন্দু	মোট
বগুড়া	৩৩	৯১	১২৪
বর্ধমান	১৪	১১৭	১৩১
ফরিদপুর	৩০	৩৩৬	৩৬৬
হাওড়া	৮	২০৬	২১৪
মুর্শিদাবাদ	৩৯	৩৪৩	৩৮২
ময়মনসিংহ	২০	৩২৪	৩৪৪
মেদিনীপুর	৩৯	৪৬০	৪৯৯
পাবনা	২৬	১৭৯	২০৫
রাজশাহী	৫৭	২৮৭	৩৪৪
বরিশাল	৩৪	৩৮৯	৪২৩

তালিকায় বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা বেশী, অন্যান্য বিভাগে সংখ্যা খুবই নগণ্য। তালিকার অপর বৈশিষ্ট্য, শহর অপেক্ষা মফস্বলে নিয়োগের সংখ্যা বেশী। হিন্দু কর্মচারীর ক্ষেত্রে সেরূপটি হয়নি। তাঁদের সদর-মফস্বল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সংখ্যা-সাম্য আছে। মুসলমান শিক্ষিতগণ কর্মব্যপদেশে কর্মস্থলে বিক্ষিপ্ত ভাবে চড়িয়ে ছিলেন, শহরে কেন্দ্রীভূত হতে পারেননি। মুসলমানের সংগঠনগুলো যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী না হওয়ার পেছনে এটা একটা প্রধান কারণ ছিল। অর্থাৎ আধুনিক প্রগতিশীল আন্দোলনগুলোর মূল শক্তিকেন্দ্র যে নগরের শ্রেণী-সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, সেটি দানা বাঁধবার সুযোগ পায়নি।[৮৭] এর থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে মুসলমানরা ইংরেজী এবং উচ্চ শিক্ষা থেকে কতটা পিছিয়ে ছিল।[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

শাসক মুসলমানরা রাজ্য হারিয়ে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হারিয়ে, রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা হারিয়ে অভিমানবশত শাসক ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইংরেজী ভাষা উপেক্ষা করেন। এককথায় পাক্ ভারত-বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের মুসলমানেরা পাশ্চত্য শিক্ষা বর্জন করেন। পক্ষান্তরে এই উপমহাদেশের অমুসলিমরা পাশ্চত্য শিক্ষা গ্রহণ করে বিজেতা ইংরেজদের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠে এবং তাদের নিকট হতে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকে। ইংরেজদেরকে সম্পূর্ণ বয়কট করায় মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দ আহামদ , নবাব আব্দুল লতিফ প্রমুখ সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের জন্য এগিয়ে আসেন। আলীগড় আন্দোলন এই প্রয়াসের প্রথম সার্থক ফসল। বাংলার মুসলমানদের এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার বরেণ্য সন্তান সৈয়দ আমীর আলীও অনুভব করেন যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে একদিকে যেমন অজ্ঞনতার অন্ধকার দূরীভূত হবে, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজদের সংগে মুসলমানদের সুসম্পর্কও স্থাপিত হবে।

মুসলমানদের আধুনিকীকরণ ছিল সৈয়দ আমীর আলীর স্বপ্ন। মুসলিম সংহতির চিন্তায় সর্বদা তাঁর প্রাণ কাঁদত। নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আহমেদের মতো তিনিও উপলব্ধি করেন যে, ভারতে আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকতে হলে ইংরেজী শিক্ষা ছাড়া মুসলমান সমাজের অন্য কোন উপায় নেই। তিনি স্যার সৈয়দের উদারনৈতিক মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হন। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্যে সৈয়দ আমীর আলী আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমাজ যখন অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল এবং পাশ্চত্য শিক্ষার প্রতি তাদের বিরাগ ছিল প্রবলতার ঠিক তখনই সৈয়দ আমীর আলী পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৮৯] তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন যে, স্বজাতির বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতি এবং রাষ্ট্রীয় দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য তাদের ইংরেজী শিক্ষা অপরিহার্য । এ শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার নিরিখেই তিনি মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার চেয়েছেন। কারণ তিনি ইংরেজী শিক্ষার পুরোপুরি সর্মথক ছিলেন।[৯০] তাই তিনি ১৮৭৭ সালের ১২ মে প্রতিষ্ঠা করেন "ন্যাশনাল মোহামেডান

Dhaka University Institutional Repository

এসোসিয়েসন" পরে এই সমিতির নামকরণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ প্রতিষ্ঠানটি মুসলমানদের অন্যান্য দাবী-দাওয়ার সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী- দাওয়া গুলো বৃটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরেন।[৯১]

সৈয়দ আমীর আলীর প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।[৯২] এ সমিতির মাধ্যমে বৃটিশ সরকার থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তি আদায় করা হত। সমিতি নিজে ১৫,০০০ টাকার একটি তহবিল গঠন করে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে তাকে কলেজ মানে নিয়ে আসার কৃতিত্ব এ সমিতির। এ সমিতি নারী শিক্ষার অচলাবস্থার দূরীকরণেও চিন্তা ভাবনা করে। তাছাড়াও সমিতিটি শহরের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে। নিম্নে এ সমিতির ব্যাপক কার্যাবলী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হলো।[৯৩]

সৈয়দ আমীর আলীর এসোসিয়েশন ১৮৮১ সালে এক পুস্তিকার মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করে। চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলীর মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্র সংখ্যা খুব কম ছিল। এতে এসোসিয়েশন মনে করে যে, এদের জন্য মহসিন ফাণ্ডের টাকা অনর্থক খরচ করা হচ্ছে এবং প্রস্তাব করে যে, এ টাকায় কলকাতায় একটি কলেজ ও একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করলে মুসলমান ছাত্রদের উপকার হবে।[৯৪] তাছাড়া এ ফাণ্ডের অধিকাংশ টাকা হিন্দু ছাত্রদের পিছনে ব্যয় হয়ে যেত। সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশনের নিকট ব্যক্ত করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি পূর্বের ন্যায় বিদ্বেষ নেই। দারিদ্র্য তাদের শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়; তারা শিক্ষায় অত্যধিক টাকা ব্যয় করতে অপারগ। তাছাড়া শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের উপযোগী হয়নি এবং বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান শিক্ষক নেই। তিনি স্কুলের বেতন হ্রাস, মুসলমান এলাকার স্কুল গুলোতে মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ এবং আরবী ও ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব করেন। ওয়াক্ফ

Dhaka University Institutional Repository

কৃত সম্পত্তিগুলো মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োগের জন্য তিনি সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহসিন ফাণ্ড থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা এবং কলকাতা মাদ্রাসাকে কলেজে উন্নীত করার জন্যে তিনি দাবী করেন।[৯৫]

সৈয়দ আমীর আলীর প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়। ১৮৮৪ সালে গভর্নমেন্ট কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ এসোসিয়েসন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের জন্যে ৪টি বৃত্তির ব্যবস্থা করে। সৈয়দ আমীর আলী কার্যোপলক্ষ্যে ১৮৮৪ সালে করাচী যান। তিনি করাচী মুসলমানদেরকে একটি কলেজ স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন। তার সহকারী হাসান আলী কিছুদিন পর করাচীতে একটি মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[৯৬]

শাসক মুসলমানরা রাজ্য হারিয়ে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হারিয়ে, রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা হারিয়ে অভিমানবশত শাসক ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইংরেজী ভাষা উপেক্ষা করেন। এককথায় পাক্ ভারত-বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের মুসলমানেরা পাশ্চত্য শিক্ষা বর্জন করেন। পক্ষান্তরে এই উপমহাদেশের অমুসলিমরা পাশ্চত্য শিক্ষা গ্রহণ করে বিজেতা ইংরেজদের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠে এবং তাদের নিকট হতে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকে। ইংরেজদেরকে সম্পূর্ণ বয়কট করায় মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দ আহামদ , নবাব আব্দুল লতিফ প্রমুখ সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের জন্য এগিয়ে আসেন। আলীগড় আন্দোলন এই প্রয়াসের প্রথম সার্থক ফসল। বাংলার মুসলমানদের এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার বরেণ্য সন্তান সৈয়দ আমীর আলীও অনুভব করেন যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে একদিকে যেমন অজ্ঞনতার অন্ধকার দূরীভূত হবে, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজদের সংগে মুসলমানদের সুসর্ম্পকও স্থাপিত হবে।

এজন্যই মুসলমানদের আধুনিকীকরণ ছিল সৈয়দ আমীর আলীর স্বপ্ন। তাইতো মুসলিম সংহতির চিন্তায় সর্বদা তাঁর প্রাণ কাঁদত। নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আহমেদের মতো তিনিও উপলব্ধি করেন যে, ভারতে আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকতে হলে ইংরেজী শিক্ষা ছাড়া মুসলমান সমাজের অন্য কোন উপায় নেই। ১৮৭১ সালে

Dhaka University Institutional Repository

বিলেতে স্যার সৈয়দ আহমদের সঙ্গে সৈয়দ আমীর আলী সাক্ষাত ঘটে। তিনি স্যার সৈয়দ আহমদের উদারনৈতিক মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হন। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্যে সৈয়দ আমীর আলী আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমাজ যখন অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল এবং পাশ্চত্য শিক্ষার প্রতি তাদের বিরাগ ছিল প্রবলতার ঠিক তখনই সৈয়দ আমীর আলী পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৯৭] তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন যে, স্বজাতির বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতি এবং রাষ্ট্রীয় দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য তাদের ইংরেজী শিক্ষা অপরিহার্য । এ শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার নিরিখেই তিনি মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার চেয়েছেন। কারণ তিনি ইংরেজী শিক্ষার পুরোপুরি সর্মথক ছিলেন।[৯৮] তাই তিনি ১৮৭৭ সালের ১২ মে প্রতিষ্ঠা করেন "ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েসন" পরে এই সমিতির নামকরণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ প্রতিষ্ঠানটি মুসলমানদের অন্যান্য দাবী-দাওয়ার সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী- দাওয়া গুলোও বৃটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরেন।[৯৯]

সৈয়দ আমীর আলীর প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে।[১০০] এ সমিতির মাধ্যমে বৃটিশ সরকার থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তি আদায় করা হত। সমিতি নিজে ১৫,০০০ টাকার একটি তহবিল গঠন করে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে। কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষা অন্তভুক্ত করে তাকে কলেজ মানে নিয়ে আসার কৃতিত্ব এ সমিতির। এ সমিতি নারী শিক্ষার অচলাবস্থার দূরীকরণেও চিন্তা ভাবনা করে। তাছাড়াও সমিতিটি শহরের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে। নিম্নে এ সমিতির ব্যাপক কার্যাবলী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হলো।[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আমীর আলীর এসোসিয়েশন ১৮৮১ সালে এক পুস্তিকার মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করে। চট্রগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলীর মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্র সংখ্যা খুব কম ছিল। এতে এসোসিয়েশন মনে করে যে, এদের জন্য মহসিন ফাণ্ডের টাকা অনর্থক খরচ করা হচ্ছে এবং প্রস্তাব করে যে, এ টাকায় কলকাতায় একটি কলেজ ও একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করলে মুসলমান ছাত্রদের উপকার হবে।[১০২] তাছাড়া এ ফাণ্ডের অধিকাংশ টাকা হিন্দু ছাত্রদের পিছনে ব্যয় হয়ে যেত। সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮২ সালে হাণ্টার কমিশনের নিকট ব্যক্ত করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি পূর্বের ন্যায় বিদ্বেষ নেই। দারিদ্র্য তাদের শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়; তারা শিক্ষায় অত্যধিক টাকা ব্যয় করতে অপারগ। তাছাড়া শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের উপযোগী হয়নি এবং বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান শিক্ষক নেই। তিনি স্কুলের বেতন হ্রাস, মুসলমান এলাকার স্কুল গুলোতে মুসলমান শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগ এবং আরবী ও ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাব করেন। ওয়াক্ফ কৃত সম্পত্তিগুলো মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োগের জন্য তিনি সরকারকে পরামর্শ দেন। মহসিন ফাণ্ড থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা এবং কলকাতা মাদ্রাসাকে কলেজে উন্নীত করার জন্যে তিনি দাবী করেন।[১০৩]

সৈয়দ আমীর আলীর প্রচেষ্টা কিছুটা সফল হয়। ১৮৮৪ সালে গভর্নমেণ্ট কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এ এসোসিয়েসন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের জন্যে ৪টি বৃত্তির ব্যবস্থা করে। সৈয়দ আমীর আলী কার্যোপলক্ষ্যে ১৮৮৪ সালে করাচী যান। তিনি করাচী মুসলমানদেরকে একটি কলেজ স্থাপন করতে উৎসাহিত করেন। তার সহকারী হাসান আলী কিছুদিন পর করাচীতে একটি মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮২সালের প্রস্তাব:

১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এসোসিয়েশনের পক্ষ হতে লর্ড রিপনের নিকট স্মারকলিপি (Memorial) পেশ করা হয়। সৈয়দ আমীর আলী এই স্মারকলিপির বিষয়বস্তু ভারতীয় মুসলমানদের অভিযোগ (A cry from the Indian Mahommedans) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে নাইনটিনথ সেঞ্চুরী নামক বিলেতের এক সাময়িকীতে প্রকাশ করেন। হিন্দু সংবাদপত্রে এর তীব্র সমালোচনা হয়।[১০৫] বস্তুত: এসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আমীর আলীর সুচিন্তিত অনুধাবনের ফল ১৮৮২ সালের এই স্মারকপত্র । তিনি স্বয়ং রাজনৈতিক ভাবে সচেতন ছিলেন বলে যুগের স্পন্দনটি অনুধাবন করতে পারেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সাহিত্য, সভা- সমিতি, ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, পত্র-পত্রিকা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির সহায়তার যে জাতীয়তাবাদ ও পূণর্জাগরণের জোয়ার এসেছে তিনি তার অন্তলীর্ন মর্মসুর উপলব্দি করেন। স্ব-সমাজের মৃতপ্রায় অবস্থার প্রেক্ষাপট ও তাঁর জানা ছিল। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বর্তমান নমনীয় ও সহানুভূতিপূর্ণ নীতি সম্পর্কে ও তিনি অবহিত ছিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সমাজ -স্বার্থে হাল ও পাল কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তারই পূর্ণ রূপ এই স্মারকপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা শিক্ষায় পশ্চাদবর্তিতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার একটি ইতিহাসভিত্তিক তথ্যপূর্ণ পটভূমি রচনা করে প্রতিবন্ধক স্বরূপ এগুলোর অবসান কামনা করেন এবং তৎসঙ্গে সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র দাবী উত্থাপন করেন। একজন উদ্দীপ্ত বুদ্ধিজীবী হিসেবে যে আইনানুগ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়নের আদর্শে এসোসিয়েশনের লক্ষ্য নিরূপিত করেন এই স্মারকপত্রে অনেক কিছুর সীমাবদ্ধতার মধ্যে সে ভাবটি স্পন্দিত হয়।[১০৬] স্মারক লিপিতে বলা হয় যে, মুসলমানগণ বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত, কিন্তু তারা নিজেদের অনুন্নত অবস্থার জন্য অসুখী। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আঘাতের ফলে সমৃদ্ধ ও উন্নত মুসলমান সম্প্রদায় দরিদ্র ও অনুন্নত অবস্থায় পতিত হয়েছে।[১০৭] আর তাই বর্তমান এই দুর্গতির জন্য তাদের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষোভ আছে, কারণ ইংরেজ শাসকদের গৃহীত নীতির জন্য মুসলমানদের এই দুরাবস্থা ।[১০৮] তারা চাকুরী হারা হয়েছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের একচেটিয়া স্বার্থ বজায় রাখার জন্য চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। মুফতী ও কাজী-উল-কুজ্জাতের পদ রহিত করার দরুন বিচার বিভাগের চাকুরীতে মুসলমানদের খুব ক্ষতি হয়েছে।[১০৯]

সুতরাং তাদের অবস্থার উন্নতি শাসকশ্রেণীর সহানুভূতির দ্বারাই সম্ভব-স্মারক পত্রের এটাই ছিল মূল সুর। তিনি প্রধানত শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সুযোগ সুবিধা চেয়েছেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের দারিদ্র হেতুতার কারণে ব্যয়বহুল ইংরেজি স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য একাধারে মাদ্রাসাগুলোতে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা, মুসলমান অঞ্চলে মুসলমান শিক্ষক ও ইনস্পেক্টর নিয়োগ করার কথা বলেন, অন্যধারে মহসিন ফাণ্ডের ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির টাকা কেবলমাত্র মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করেন। শিক্ষা-বিভাগ, বিচার-বিভাগ, প্রশাসন-বিভাগ, পররাষ্ট্র-বিভাগ সর্বত্র মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম। সৈয়দ আমীর আলী সমাজের মানুষের আর্থিক বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির জন্য শিক্ষার বিস্তার চেয়েছেন। সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের অধিক নিয়োগ কামনা করেছেন। ১৮৮২ সালে স্মারক পত্রে এবং ১৮৮৪ সালে ১০ মার্চ বড় লার্টের ব্যক্তিগত সচিবকে লিখিত পত্রে সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের জন্য চাকুরীর সংরক্ষিত সুবিধা চেয়েছেন। বড় লাটের ব্যক্তিগত সচিবকে তিনি জানান-'The unequal distribution of state patronage is the most important of all ; it has given rise to the greatest discontent and bitterness of feeling and will continue to do so unless Govt. emphatically lay down the principle that in Bangal at least one- third of state employment should be reserved for Mahommedans.[১১০]

Dhaka University Institutional Repository

স্মারকলিপিতে, অভিযোগ করা হয় যে, যদিও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার মুসলমানদেরকে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তবুও নিয়োগের বেলায় বহু ক্ষেত্রে যোগ্য মুসলমান নিয়োগ প্রার্থীদের দাবী অগ্রাহ্য করা হয়। মুসলমানদেরকে নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থার দাবী করা হয়। বিচারালয়গুলোতে মুসলমান বিচারক নিয়োগের জন্য আবেদন করা হয়।[১১১] মুসলমানদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ কর্তার বঞ্চনার জন্য চাকুরী পাচ্ছে না, এ অভিযোগ স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়। কেউ চাকুরী পেলেও অনেক সময় তাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র হতো। কলকাতা ও মফস্বলে সরকারী উচ্চ চাকুরীতে হিন্দু , মুসলমান, খ্রীস্টানের সংখ্যা কিরূপ ছিল তার একটা তালিকা দিতে বলা হয়, মুসলমান না-জনসংখ্যার অনুপাতে না শিক্ষার অনুপাতে ঐ সব চাকুরীতে স্থান পায়। ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানরা পশ্চাদপদ, সুতরাং প্রতিযোগিতায় তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। এ ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের জন্য চাকুরীতে নিয়োগ পদ্ধতির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না হলে অধিক পরিমাণ চাকুরী পাওয়া সম্ভব হবে না। দেশের খয়রাতি সম্পত্তিগুলোর সুষ্ঠু তদারকির ব্যবস্থা করে সে গুলোর অর্থ শিক্ষা খাতে নিয়োজিত করার জন্য একটি কমিশন এবং মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে চাকুরীর ক্ষেত্রে নিয়োগের বাস্ত ব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অপর একটি কমিশন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ ঐ স্মারকপত্রে করা হয়। স্মারকপত্রে বিহারে নাগরির পরিবর্তে আরবি লিপি রাখা এবং আদালতের ভাষা রূপে উর্দু চালু রাখার পক্ষে ওকালতি করা হয়। মুসলমানদের দুরাবস্থা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতি জনক নয়, বৃটিশ সমাজের স্বার্থেরও পরিপন্থী হবে বলে উপসংহারে মন্তব্য করা হয়।[১১২]

কেন্দ্রীয় এসোসিয়শনের এই স্মারকপত্র ব্যর্থ হয়নি, ভারত সরকার এর নকল; প্রাদেশিক সরকার ও শিক্ষা-বিভাগ, সভা-সমিতি ও হাণ্টার কমিশনের কাছে পাঠিয়েদেন। এদের মতামতের ভিত্তিতে এবং হাণ্টার কমিশনের সুপারিশে ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই বড়লার্ড ডাফারিণের এক শিক্ষা প্রস্তাবে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।[১১৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫ সালের প্রস্তাবঃ

কেন্দ্রীয় সরকার স্মারকলিপির নকল; প্রাদেশিক সরকার উচ্চ বিচারালয়, শিক্ষা-বিভাগ ও বিভিন্ন সমিতিগুলোকে প্রেরণ করেন এবং এদের মতামত আহবান করেন। স্মারকলিপির নকল হাণ্টার কমিশনকে দেওয়া হয়। স্মারকলিপি এবং হাণ্টার কমিশনের সুপারিশেরর উপর ভিত্তি করে ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই বড় লাট ডাফারিণের সময় ভারত সরকার মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে এক প্রস্তাব পাশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, জনশিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রির্পোটে মুসলমানদের শিক্ষা বিষয়ে পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে এবং এটা হতে ভারত সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং সময়োচিত কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার জন্য মুসলমান পরিদর্শক নিয়োগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করা হয়।

চাকুরীতে মুসলমানদের নিয়োগের সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রতিযোগিতার মান রক্ষা করা দরকার। তবে এটা প্রাদেশিক সরকার, হাইকোর্ট ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয় যে, চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতার প্রতিকারের জন্য সুযোগ মত যেন তাদেরকে নিয়োগ করা হয়। প্রাদেশিক সরকারের বার্ষিক রিপোর্টে চাকুরী ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থার পর্যালোচনা থাকবে। প্রস্তাবে স্মারকলিপির প্রশংসা করা হয় এবং আশা প্রকাশ করা হয় যে, এখন হতে মুসলমানদের উত্তরোত্তর উন্নতি হবে।[১১৩]

বিচারপতি মাহমুদ মন্তব্য করেন যে, ১৮৮৫ সালের প্রস্তাব ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষার ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। সৈয়দ আমীর আলী এটাকে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সনদ (Manga Carta) বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রস্তাবের পর বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব সরকার মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনেকগুলো বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।[১১৪]

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েসন' এর পক্ষ হতে সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিপনের কাছে মুসলমানদের ২৮টি দাবী-দাওয়া ও তাদের প্রতিকার পন্থা সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এর ৯৫ নং পরিচ্ছেদে ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় : "বৃটিশ গর্ভমেন্ট কর্তৃক ভারতের কোট ভাষা রূপে ইংরেজীর প্রবর্তন করার সাথে সাথে তাঁদের উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়েছে এবং তা হলো মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার সুবিধার জন্য যথোপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন ও বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ১৭৫৬ সালের সন্ধি অনুযায়ী তারা বিশেষ বিবেচনা ও অধিকতর উদার-নীতি লাভের অধিকারী। এই স্মারকলিপি রচিয়তাগণ বিশ্বাস করতেন যে, ঐ উদার নীতির প্রয়োগ মুসলমানদের কে তাদের বর্তমান দুরাবস্থা থেকে টেনে তুলবে।"[১১৫]

মুসলমান সমাজের কিছু কিছু লোক ফারসিকে পুনরায় রাজ ভাষা ঘোষনা করার প্রত্যাশা ও ধ্যান ধারণা পোষণ করতো। সৈয়দ আমীর আলী ঐরূপ মনোভাবকে তাঁর স্মারকলিপির ২৫ নং অনুচ্ছেদে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে আখ্যায়িত করেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করাও তিনি অযৌতিক বলে মনে করতেন। ভাইসরয়কে লক্ষ্য করে স্মারকলিপি হস্তান্তরকারিগণ বলেন :

এই স্মারকলিপি নির্মাতাগণ মনে করেন যে, ফারসিকে ভারতের কোটভাষা রূপে পুনঃ প্রবর্তন করা হবে নৈরাশ্য জনক। এরূপ কিছু করার চেষ্টা করা বা মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সমার্থক। ১৮৩৭ সাালে কোর্টভাষা সম্পর্কে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, সেই প্রগতিশীল নীতিকে কার্যকর রাখা গভর্নমেন্টের উচিত। বর্তমানে ভারতের যে-কোন উন্নতির প্রত্যাশা নির্ভর করে ইংরেজী শিক্ষা প্রদানের উপর। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই আমাদের সমাজে পাশ্চত্য চিন্ত া ধারার বিস্তৃতি সাধন করা সম্ভব। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে স্বচ্ছ জ্ঞান রাখাই হলো বর্তমানে সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র চাবিকাঠি। এটা নীতিগতভাবে স্বীকৃত যে, দেশের সরকার পরিচালনায় দেশীয়দের অংশগ্রহণ অবশ্যই থাকতে হবে। কায়মনোবাক্যে শাসক জাতির ভাষা, ভাবধারা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা করা হিন্দু-

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য। মুসলমানগণ যাতে তাদের নৈরাশ্যজনক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং ভারতীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে তারা তাঁদের যথাযোগ্য স্থান করে নিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই স্মারকলিপি প্রণেতাগণ তাদের প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহকে বাস্তবায়িত করার জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেন।[১১৬]

স্মারক লিপির উক্ত ধারায় আরও বলা হয়: প্রার্থনাকারিগণ বিনীত ভাবে এই আবেদন করেছেন যে, এমন একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হোক, যাতে থাকবেন প্রত্যেক প্রদেশের একজন শিক্ষা পরিচালক, দু-একজন ইউরোপীয় কর্মকর্তা এবং মুসলমান সম্প্রদায় থেকে কয়েকজন চিন্তাবিদ ও সংস্কারক। তাঁরা মুসলিম শিক্ষার গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে একটা বাস্তব পন্থা উদ্ভাবন করবেন। আবেদকগণ এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র কমিশন নিয়োগ করা হোক, কারণ তাঁদের মতে সদ্য-গঠিত কমিশনে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়নি।[১১৭]

সৈয়দ আমীর আলী আরো লক্ষ্য করেন যে, মুসলমান কৃত দানপত্র সমূহের অর্থ মুসলমানদের শিক্ষার জন্য যথোপযুক্তভাবে ব্যয় করা হচ্ছে না। সুতরাং উক্ত স্মারকলিপিতে ঐ বিষয়ের প্রতি বড় লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় :

"আপনার সরকারের কাছে আবেদনকারীদের আরজ হলো-মুসলমান কৃত দানপত্র সমূহের অর্থ তাদের শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত রেখে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা হোক। মুহসিন ফাণ্ডের বিশাল অর্থ অনেকটা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এই আবেদকবৃন্দ দানপত্র সমূহের হালহকিকত বিবেচনা এবং সেগুলোর অর্থ মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হচ্ছে কি-না তা খতিয়ে দেখার লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠনের জন্য আপনাকে অনুরোধ করেছেন।"[১১৮]

স্মারকলিপিটি ভারত সরকারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই স্মারকলিপিটির মর্মানুসারে ভাইসরয় ১৮৮৫ সালের মার্চের একটি প্রস্তাবে স্মারকলিপি রচয়িতাদের অনেক দাবী মেনে নেন। এই স্বীকৃতি ছিল মুসলিম ভারতের ইতিহাসের

Dhaka University Institutional Repository

একটি মাইল ফলক স্বরূপ। ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠার পেছনেও ঐ স্মারকলিপির ভূমিকা ছিল।

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮২ সালের আগস্টে "The Nineteenth century পত্রিকায় 'A cry from the Indian mahommedan' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মুসলমানদের আবেগ-আবেশ ও অভাব-অভিযোগ তুলে ধরেন। এখানেও তিনি মহসিন তহবিলের অপব্যবহারের প্রসঙ্গ টেনেছেন। তিনি বলেন, মহসিন ফাণ্ডের বিশাল অর্থের ট্রাস্টী হলেন ব্রিটিশ সরকার। এর বেশীর ভাগই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এর একটি অংশ মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় কেন ব্যয় করা হচ্ছে না? স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল মহসিন ফাণ্ডের অর্থ দিয়ে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য যে স্কীম গ্রহণ করেন, বস্তুত তা অকৃতকার্য হয়েছিল। প্রাথমিক প্রাচ্য শিক্ষার (মক্তব শিক্ষার) প্রতি বিশেষ উৎসাহদানের প্রয়োজন নেই ; বরং এখন উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন রয়েছে। ভারতে রেণেসাঁর যে-কোন প্রত্যাশা ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের উপর নির্ভরশীল। ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চত্য ধ্যান-ধারণা প্রসারের মধ্যেই তাদের উন্নতি নিহিত। ইংরেজী ভাষার উপর আধিপত্য অর্জন করাই হলো সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র অবলম্বন। সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায় বলতে গেলে " Every hope for the regeneration of India now depends on the spread of English education and the diffusion of western ideas through the medium of the English Language. A thorough knowledge of the English language and Literature is not the only avenue to preferment and honour. "[১১৯]

উক্ত প্রবন্ধে সৈয়দ আমীর আলী আরো বলেন, ইংরেজীর অধ্যয়ন মুসলমানদের জন্য একটি গূঢ় প্রশ্ন। এর মানে-মুসলমানগণ তাদের নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে নিস্তার লাভ করে ভারতীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে নিজেদের জন্য উপযুক্ত স্থান করে নেবে, না-কি পার্থিব সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদেরকে আরো তলিয়ে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে-এ ব্যাপারটি নির্ভর করবে তাদের ইংরেজী শিক্ষা করা বা না করার উপর। এবার সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

আমীর আলীর ভাষায় শোনা যাক। "The Study of English is a vital questionn for the Mahommedans, it means whether the Mussulmans are to be enabled to emerge from the desperate condition into which they have fallen and take their proper place among the Indian nationalities, or whether they are to be allowed to sink still lower in material prosperity. "[১২০]

ঐ প্রবন্ধে সৈয়দ আমীর আলী গভর্নমেন্টের নিকট এই প্রস্তাব করেন যে, নিছক ভার্নাকিউলার স্কুলসমূহকে বিলুপ্ত করা উচিত এবং ঐ শিক্ষা খাতে বরাদ্ধকৃত অর্থ উচ্চশিকষা তথা ইংরেজি শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার কাজে লাগানো উচিত। অমিশ্র প্রাচ্য শিক্ষার (মাদ্রাসা শিক্ষা) জন্য কতকগুলো প্রতিষ্ঠান জিইয়ে রাখা হবে গভর্নমেন্টের অবিবেচনা প্রসূত কাজ। কারণ এই শিক্ষা লোকদের মধ্যে একঘরে হয়ে বসে থাকার সেই প্রাচীন ধ্যান-ধারণা জন্মায়, যা প্রগতিশীল বৃটিশ শাসনের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান।

এবার সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায় দেখা যাক I would propose that the purely vernacular schools should be abolished and that the funds allotted to their support should be applied to promote high English as well as technical education. It seems unwise of the Government to maintain institutions for imparting a purely oriental education as this fosters in the people the old ideas of exclusiveness which are inconsistent with the exigencies of British rule.[১২১]

স্যার সৈয়দ আহমদ ও নওয়াব আব্দুল লতিফের মত সৈয়দ আমীর আলী ও ১৮৮২ সালে গঠিত হাণ্টার শিক্ষা কমিশনে সাক্ষ্য দেন। ঐ সাক্ষ্যদানের সময় সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার উপর জোর দেন। তিনি বলেছিলেন, যে একটি অহেতুক ভারি চাপ মুসলমান সম্প্রদায়কে চেপে রেখেছে। একমাত্র ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়েই মুসলমান সম্প্রদায় ৫০ বছরের হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে পারে। ১৮৭২ সালের শিক্ষা সার্কুলারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজীকে

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্যতামূলক না করা ছিল সরকারের একটি ভুল পদক্ষেপ। ১৮৭২ সালে জর্জ ক্যাম্পবেল মুসলমানদের নিছক প্রাচ্যশিক্ষার (মাদ্রাসা শিক্ষা) উন্নতি কল্পে যে স্কীম প্রণয়ন করেন, তা ব্যার্থ প্রমাণিত হয়েছে। এবার সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায় উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল-

"A dead weight, however, seems still to press down the Moslem community. The mistake which was committed in 1872 was not to make English compulsory on all students who sought middle class and high education. The consequence is that the only kind of education which is necessary to enable them to retrieve the ground they had lost within the last 50 (fifty) Years, is in a most unsatisfactory condition. I think, it has been satisfactorily proved that the scheme devised by sir George campbell in 1872 to promote a purely oriental education among the Moslems, has proved a practical failure."[১২৩]

১৮৮৪ সালের আগস্ট মাসে আমীর আলী করাচীতে সেশন-কোর্টের এক মামলায় মুসলিম বিবাদির পক্ষ অবলম্বন করেন। ঐ সময় তিনি করাচীর গণ্যমান্য মুসলমান-আয়োজিত এক সভায় "সিন্ধুতে মুসলমান শিক্ষা" - এ বিষয়ের উপর একটি বক্তৃতা করেন। ঐ সভায় বিশাল জনসমাগম হয়। ঐ বক্তৃতার ফলশ্রুতিতে করাচীতে একটি ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।[১২৪]

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় সৈয়দ আমীর আলীর সভাপতিত্বে স্যার সৈয়দ প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৬) "সর্ব ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি" এর ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উর্দুতে সভাপতির ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি ইংরেজী শিক্ষা ও স্ত্রী শিক্ষার উপর গুরুত্বরোপ করেন।

ইংরেজী শিক্ষা সর্ম্পকে তিনি বলেন " As to the necessity of English Education, I need not dwell on its importance at any length. It is coming to be recognised on all hands as am aximatic truth."

Dhaka University Institutional Repository

এই ভাষণে তিনি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং আলীগড় কলেজকে মুসলিম ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যায়িত করেন।[১২৫]

সৈয়দ আমীর আলী এভাবে বিভিন্ন লেখায় ও রিপোর্টে, আলোচনায় ও বক্তৃতায় মুসলিম সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। 'সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েসন' রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ক সমস্যার ও মোকাবেলা করে। ১৮৮২ সালে মার্কুইস অব রিপনকে প্রদত্ত "স্মারকপত্রে" সৈয়দ আমীর আলী বলেন যে, ১৮৩৭ সালের ফারসি শিক্ষার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে, এর পুন:প্রবর্তনের প্রচেষ্টা এখন অচল, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি বা উর্দুতে পরীক্ষা নেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। ইংরেজী ভাষা ও প্রাশ্চত্য বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জাতির পুনজাগরণ সম্ভব বলে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। পাশ্চত্য সাহিত্য সংস্কৃতি রপ্ত করার মধ্যে তিনি সম্মান ও মর্যাদার চিহ্ন দেখেন। এজন্য দেশবাসীকে শাসকের ভাষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য গ্রহণ করার পক্ষে রায় দেন।[১২৬] ১৮৯৯ সালে ডিসেম্বর মাসে 'কলকাতার মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স' এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি মাদ্রাসাগুলো তুলে দিয়ে আলিগড় কলেজের আদর্শে স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন।[১২৭] এসোসিয়েশনের মাধ্যমে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সংস্কৃতিক চর্চায় উৎসায়িত করেন। ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা করে গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন। শাখা এসোসিয়েশনগুলো নিজ নিজ এলাকায় কোথাও ইংরেজি বিদ্যালয়, কোথাও বাংলা বিদ্যলয় কোথাও বা মাদ্রাসা স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী গ্রহণ করে।[১২৮]

সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য অনেক বিষয়ের মতো নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ও প্রগতিশীল ছিল। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি অতীতকালের কয়েকজনের মুসলমান মহীয়সীর অবদান বর্ণনা করেন ।[১২৯] তিনি ১৮৯৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স সভাপতির ভাষণে নারী শিক্ষার প্রসঙ্গে বলেন যে, মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরালে চলা উচিত। তাতেই সমাজের ভারসাম্য রক্ষিত হবে, পুরুষ নারী একত্রে সমান উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত সুফল পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

যাবে না ; বরং এক অংশকে শিক্ষিত ও অপর অংশকে নিরক্ষর করে রাখলে ফল মারাত্বকই হবে। শিক্ষিত অংশ আনন্দ লাভের জন্য অসামাজিক আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়বে। কাজেই পুরুষের সমমাত্রায় নারীকে শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌছাতে সক্ষম হবে।[১৩০]

সৈয়দ আমীর আলী বাংলার মাদ্রাসাগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ সংশোধনের জন্য একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। সৈয়দ আমীর আলী মনে করতেন যারা এখন ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা ঐসব মুসলমানদের চেয়ে অধিকতর ধর্মপ্রাণ মুসলমান, যারা ঐ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কেবল ধার্মিকতার রূপ ধারণ করলেই ধার্মিক বা সাধু হওয়া যায় না । তার ভাষায় শোনা যাক, "I Belive that those who receive English education are more storngly attached to Islam in the persent age than those who have not had that previledge. More profession of a piety do not constitute a man as religious or pious."[১৩১]

তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ধর্মের গোড়ামীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদার পন্থীদের একজন। তাই বলে তিনি ধর্মকে উপেক্ষা করেননি। তার প্রমাণ মেলে তাঁর রচিত ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আহবান জানিয়েছেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে মুসলমান জাতির উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। আর এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তার। এ ছাড়া মুসলমানদের মুক্তির আর অন্য কোন উপায় নেই। আজ শুধু ভারতবর্ষই নয় গোটা বিশ্বপানে দৃষ্টি দিলে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও অত্যাচারের ছবি আর মুসলিম দেশগুলোতে পরাশক্তিরা মোড়লগিরি করছে। অজ্ঞতার কারণেই তারা তাদের ধর্মের সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। যদি মুসলমানরা একতাবদ্ধ হয়ে দীপ্ত কণ্ঠে শপথ নিয়ে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে গোটা জাতিকে শিক্ষা , কৃষ্টি ও বিজ্ঞানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাহলে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে, মোড়লগিরি করতে কেউ সাহস করবে না। আর অর্ধশতাব্দীর অধিককাল আগে এই ছিল সৈয়দ আমীর আলীর প্রত্যাশা।[১৩২]

১৯০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী সৈয়দ আমীর আলীর সভাপতিত্বে কলকাতায় 'ক্যালকাটা মোহামেডান ইউনিয়ন' এর এক বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় "নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি" গঠিত হয়।[১৩৩]

তিনি (সৈয়দ আমীর আলী) মুসলিম সমাজে অবিমিশ্র ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার চেয়েছিলেন। শিক্ষার সকল স্তরে অবিমিশ্র ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হোক-এটা ছিল তাঁর চরম ও পরম লক্ষ্য। তিনি ছিলেন শিক্ষার ঐকান্তিক আগ্রহী। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বোধ হয় আর কোন নেতা এত বেশী আসক্তি প্রকাশ করেননি। ইংলিশ লেডি বিয়ে করেন এবং শেষ জীবন ইংল্যাণ্ডেই যাপন করেন। আর চালচলনের দিক থেকেও তিনি ইংলিশম্যানের ন্যায়ই ছিলেন। এছাড়া ইংরেজী শিক্ষার অভাবে মুসলমানরা যে দুর্গতি পোহাচ্ছিল, তাদের সেই করুণ অবস্থাও তাঁর মনে কঠোর ভাবে পীড়া দিয়ে থাকবে। মনে হয় এসব কারণেই তিনি আরবী-ফারসি শিক্ষার প্রতি অনাসক্ত এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

নওয়াব আব্দুল লতিফ ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হলেও তিনি তদানীন্তন মুসলিম সমাজের বিশেষত অভিজাত শ্রেণীর মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য করে ইংরেজী ও আরবি শিক্ষার সমন্বয় চান। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার সাধন করে এর মধ্য দিয়ে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার সাধন করতে চান। আমীর আলীও কর্মজীবনের শেষের দিকে ১৮৯৯ সালে কলকাতায় "নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি" এর সভাপতিত্ব করতে গিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি অ্যাংলো-পার্সিয়ান বা অ্যাংলো অ্যারাবিক শিক্ষার ন্যায় কোন শিক্ষা পদ্ধতির চিন্তা করেননি। আমির আলীর উপর ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় কৃষ্টির প্রভাব থাকলেও ও মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নটি তাঁর রক্ত-মাংসের সাথে একাকার হয়ে যায়। তাই তিনি শেষ জীবনে ইংলাণ্ডে বাস করলেও উপমহাদেশীয় মুসলমানদের স্বার্থে কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করে গিয়েছেন। তিনি তাঁর ইতিহাসভিত্তিক রচনাবলীর মধ্য দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন, ইসলামের জয়গান গেয়ে শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন।[১৩৪]

তাইতো বলতে হয় যে, সৈয়দ আমীর আলী শুধু ভারতবর্ষই নয়, গোটা মুসলিম বিশ্বের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য চেয়েছেন শিক্ষাবিস্তার । কারণ সকলেই জানে "No nation cannot without education" তাই তিনি মুসলমানদের জাগিয়ে তুলবার জন্য বারবার আহবান জানিয়েছেন, কেননা তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় যদি শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যায় তাহলে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে তারা সমানভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে। তিনি বিভিন্ন সভা- সমিতি সংগঠন স্মারকলিপির মাধ্যমে ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন ক্ষুধা পেটে চেপে আর অভিমান করে বসে থাকলে চলবে না। নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। আর এ জন্য শুধু প্রাচ্য শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত উচ্চ শিক্ষা। তবেই মুসলমান জাতি তাদের পুরানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে। নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আহমদসহ অন্যান্য মহান ব্যক্তিদের চেয়ে আরও অনেক উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য আজীবন যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তা সত্যিই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। তাঁর প্রচেষ্টা অনেকখানি সফল হলেও গোটা মুসলমান জাতি এখনও ঐক্য এবং যথাযথ শিক্ষার অভাবে নির্যাতিত হচ্ছে আর বঞ্চিত হচ্ছে ন্যায্য অধিকার থেকে।[১৩৫]

ঊনিশ শতকের মুসলিম জগতে একাধিক মনীষী তাঁদের রচনা ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে সংকল্পবদ্ধ হন। বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী তাঁদের অন্যতম। ভারতীয় মুসলীম সমাজের শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা নির্ণয়ের আমরা চেষ্টা করব। আমার লক্ষ্য ইসলাম সম্পর্কে আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা। এ ব্যাপারে আমি আমার অভিমত দিতে চাই না; বরং তাঁর ব্যাখ্যা ভারতের মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নে কি অবদান রাখে, তা নির্ণয়েরই প্রয়াস চালানো।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চত্য প্রযুক্তি উন্নয়ন ও দার্শনিক চিন্তাধারার মাপকাঠিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঊনিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে আনে আধুনিকতার ঢেউ।[১৩৬] খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতাও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।[১৩৭] অবশ্য ভারতীয় মুসলমানরা পাশ্চাত্য বস্তুবাদী উন্নতির প্রতি খ্রিস্টান মিশনারী মানসিকতার সাথে খ্রিস্টবাদকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন যা মুসলিম মনীষীদের রচনায় প্রতিফলিত হয়। তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিল আধুনিকতার শক্তির সাথে তাঁদের বিশ্বাসকে শোষণ, পরিবর্তন, প্রত্যাখ্যান বা খাপ খাওয়ানোর। একজন মার্কিন মনীষীর অনুপ্রেরণায় ইসলাম সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন সৈয়দ আমীর আলী।[১৩৮] পরবর্তীকালে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, পাশ্চাত্য ইসলামী জ্ঞান যথেষ্ঠ পরিমাণে বিদ্বেষপ্রসূত।[১৩৯] বিশেষত স্যার উইলিয়াম মূলের Life of Mahomet পড়ার পর আলী অনুভব কররেন যে, বইটির 'প্রত্যেক মিথ্যা তত্ত্বের প্রতিবাদ প্রয়োজন।'[১৪০]

আধুনিক যুগের ঊষালগ্নে পাশ্চাত্যে ইসলাম চর্চায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ শুরু হয়।[১৪১] এই উদ্যোগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এককালীন গভর্নর স্যার উইলিয়াম মূরের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি সম্ভবত ইসলামের নবীর প্রথম জীবনীকার যিনি এ বিষয়ের মূল সূত্র অনুধাবন করেছেন। মূল সূত্র অনুধাবন ও এসব সূত্রের সমালোচনা-ধারা প্রবর্তনের জন্য তাঁকে পাশ্চাত্যে ইসলামের সমালোচনা-ধারার পিতা মনে করা হয়। এমন কি অনেক আধুনিক মুসলিম পণ্ডিত তাঁকে নবীর জীবন ও অবদানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশারদ মনে করেন।[১৪২] কিন্তু একজন মুসলিম 'সর্বদা এক হাতে তলোয়ার আরেক হাতে কুরআন'[১৪৩] - এ ধরনের মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় প্রচারণা[১৪৪] থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। ইসলামী পাণ্ডিত্যে মূরের অবদান ও তাঁর পূর্ব-ধারণাকে লিওনার্দ বাইণ্ডারের ভাষায় তুলে ধরা যায়- 'তাঁর রচনায় ইসলাম-বিরোধী গোঁড়ামিকে বাদ দিলে মধ্যপ্রাচ্যের সব ছাত্র মূরের কাছে গভীরভাবে ঋণী।'[১৪৫] মূরের অবদান সম্পর্কে A History of Missions in India গ্রন্থের রচয়িতা জে. রিখটার বলেছেন : 'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলোর শিক্ষিত ও ধামির্ক শাসক এবং পরবর্তীকালে

Dhaka University Institutional Repository

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সার উইলিয়াম মূর ইসলামের সাথে কঠিন আধ্যাত্মিক যুদ্ধের মোকাবেলায় মিশনারীদের হাতে অস্ত্রস্বরূপ তুলে ধরলেন চার খণ্ডে সমাপ্ত Life of Mahomet।'[১৪৬]

ইসলাম সম্পর্কে মূরের লেখার ঝোঁক হবার পিছনে কারণ যা-ই হোক না কেন, ইসলামের গঠনমূলক সমালোচনা গড়ে তুলতে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

মূর কতিপয় বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন যেমন, নবীজীর পারিবারিক জীবন, মদীনার জীবন, মদীনায় ইহুদীদের সাথে তাঁর ব্যবহার, ইসলামে নারীদের মর্যাদা, অনারব দেশে ইসলামের বিস্তার ও প্রসার, ইসলাম ও দাস প্রথা এবং ইসলামে যুক্তির ব্যবহার। সৈয়দ আমীর আলী দেখলেন এসব ব্যাপারে মূরের আলোচনা মুসলিম-বিরোধী চেতনায় আপ্লুত। ফলে, তিনি তাঁর নিজের রচনায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে সৈয়দ আমীর আলী কিছু বৃটিশ লেখকের সাথে ইসলামের কতিপয় বিষয়ে সরাসরি বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন, কিন্তু ঐসব বিষয়ে আগাগোড়া তাঁর চিন্তাধারা বজায় রইল।[১৪৭]

মূরের কতিপয় তত্ত্বকে আমীর আলী মিথ্যা বলে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন। মদীনায় নবীজীর চরিত্রকে মূর আক্রমন করেছেন, 'যুদ্ধ হল, প্রাণদণ্ড দেয়া হল ; আর সর্বশক্তিমানের দোহাই দিয়ে সীমানা নির্ধারন করা হল।'[১৪৮] এ ব্যাপারে তিনি বলেন :

'তাদের (ইহুদীদের) উচ্চতর শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা, মুনাফিকদের দলের সাথে তাদের ঐক্য এবং ঐক্যমত্যের কারণে ইসলামের শিক্ষকের অধীনে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রে ইহুদীরা ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক গোষ্ঠী।'[১৪৯]

মদীনায় ইহুদীদের সাথে নবীজীর ব্যবহার সম্পর্কে মূরকে মনে হয় সূত্র নির্বাচনে একদেশদর্শী। তিনি মুসলিম ও ইহুদীদের সম্পর্ক বর্ণনায় বহি:শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের পারস্পরিক প্রতিজ্ঞার কথা এড়িয়ে গেছেন। মূর বলেন : '---- বদর থেকে (নবীজীর) ফেরার অল্পকাল পর, গোত্র-প্রধানদের একত্রিত করে তাঁকে তাদের নবী হিসাবে স্বীকার করার আহবান জানান। 'আল্লাহর কসম', তিনি বলেন, 'তোমরা বেশ ভালভাবেই জান

Dhaka University Institutional Repository

যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। সুতরাং বিশ্বাস কর কুরায়শদের মতো পরিণতি হবার আগে।' তারা অস্বীকার করল এবং তাঁর তুমুল বিরোধিতা করল।'[১৫০]

ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য নয়। ইহুদী ও মুসলিম সম্পর্ক মূরের ব্যবহৃত সূত্রে ভালভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং সৈয়দ আমীর আলী মোটামুটি একই সূত্র ব্যবহার করে কাহিনীর মুসলিম ভাষ্য দিয়েছেন। তিনি বদরে মুসলিম বিজয়ের পর ইহুদীদের আচরণ এবং মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের পক্ষে লোকজনকে উস্কানি দিতে একজন ইহুদী কবির কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর (আমীর আলীর) মতে, এই চরম অবস্থায় মুহাম্মদ (স:) কঠোর ব্যবস্থা নেন। নবীজীর কঠোরতাকে আমীর আলী যথার্থ বলতে চেষ্টা করেছেন অন্যান্য জাতির ইতিহাস থেকে সমান্তরাল উদাহরণ উদ্ধৃত করে। তিনি আর্নলডের [ইসরাইলদের যুদ্ধ পৃ. ৩৫-৩৬] থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন: 'দুষ্টদের ধংস করা তাদের দলে নিরপরাধ লোকদের যোগ দেয়ানোর প্ররোচণা অপেক্ষা একশত গুণে ভাল।'

তিনি Grote রচিত গ্রীসের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, নবীজী ইহুদীদের যে শাস্তি দেন তা ঐ যুগের যুদ্ধ আইনের পরিপন্থী নয়। আমীর আলী ইহুদীদের সাথে নবীজীর ব্যবহারকে সমর্থন করতে দিয়ে লেনপুলের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি কাহিনীর পক্ষপাতদুষ্ট বর্ণনার জন্য মূর, স্প্রেঙ্গার, ওয়াইল ও অসবর্নকে আক্রমণ করেন। সাথে সাথে তিনি বলেন, 'আমি ইউরোপীয়দের মধ্যে একমাত্র এম. বার্থেলমি, সেন্ট হিলারি, মি: জনসন ও মি. ষ্ট্যানলী লেনপুলের কথাই মনে করতে পারছি, যাঁরা পক্ষপাতদুষ্ট হননি।'[১৫০]

ইহুদীদের সাথে ব্যবহারে কঠোরতার সত্যতা সম্পর্কে মূরের সাথে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন না। তিনি এ ধরনের ব্যবহারকে শুধু ন্যায্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় বলেন: এটা আমাদের ধারণায় কঠোর শাস্তি, কিন্তু তৎকালীন যুদ্ধ আইনে তা ছিল প্রথাসিদ্ধ। এভাবে[১৫১] Grote-এর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটিয়ে তিনি নবীজীর আচরণ সম্পর্কে তাঁর আস্থার অভাব প্রকাশ করেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে শুধু প্রতিরক্ষামূলকই নন, বরং

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদের উপর বিশেষত খ্রিস্টান ও নবীজীর জীবনী লেখকদের বক্তব্যের উপর পাল্টা আক্রমণও চালান। ইসলামের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি সর্বদা 'খ্রিস্টান তার্কিকদের' বরাত দেন। এই ঢালাও সাধারণীকৃত বিবৃতি তাঁর নিজের অবস্থানকেই স্ববিরোধী করে, কারণ তার অনুকূল হলে তিনি পাশ্চত্য মনীষীদের উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেন। আমীর আলী মূরকে ইসলামের শত্রু বিবেচনা করেন, তবু তিনি মূরের উদ্ধৃতি দেন, যাতে মূর ইসলামের প্রশংসা করেছেন। মূর থেকে তাঁর উদ্ধৃতিকে তিনি বলেন যে, তা মূরের জন্য ছিল এক অজ্ঞাত পুলক।

অন্যান্য বিষয়ও তিনি এভাবেই ব্যবহার করেছেন। ইসলামী ধ্যান ধারণার প্রতি মূর ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তার অভিযোগ তিনি অনেকাংশে খন্ডন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রায় ঊনিশ শতকের শেষংশে বিবিধ সামাজিক আন্দোলনের দাবীর সঙ্গে ইসলামী ধারণার সামঞ্জস্য চিহ্নিত করেন। তিনি গর্ব অনুভব করেন যে, সপ্তম শতকে ইসলাম নারীকে তার পিতা বা স্বামীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্পত্তির মালিকানার অধিকার দিয়েছে, অথচ ইংরেজদের জমি সংক্রান্ত সাধারণ আইনে এ অধিকার ১৮৮২ সালের আগে স্বীকৃত হয়নি। ইসলামের পূর্বে সব সমাজেই নারীর অধিকার খর্ব বা অস্বীকৃত হয়েছে; আর ইসলামে নারীর সম্পদ ও অন্যান্য অধিকারের স্বীকৃতিতে পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে।[১৫২] তিনি ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম নারীর মর্যাদা পর্যালোচনা করেন এবং হযরত রাবেয়ার [ইসলামের দ্বিতীয় শতকের একজন মহিলা দরবেশ] উদাহরণ তুলে ধরে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে এক চটজলদি মন্তব্য করেন যে, ইসলাম রাবেয়ার মত হাজারো নারীর জন্ম দিয়েছে। এই বক্তব্য আধুনিক পণ্ডিতদের দৃষ্টি এড়ায় নি। উদাহরণসরূপ গিব চ্যালেঞ্জ করেন তাঁর এ কথা।[১৫৩] ইংলান্ডে নারীমুক্তি আন্দোলনের একজন নেতা মিল্লিমেন্ট ফসেট- এর সাথে খুব ঘনিষ্টতা ছিল সৈয়দ আমীর আলীর।[১৫৪] এ আন্দোনের অনেক দাবীর মধ্যে তিনি ইসলামে স্বীকৃত নারীদের অধিকারের সাদৃশ্য খুজেঁ পান। মনে হয়, এতে তিনি তাঁর স্বকীয়তায় গর্বিত হন এবং এই গর্ব থেকে মাত্রাতিরিক্ত দাবী করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শুধু ইসলামের গৌরবের ইতিহাস আলোচনা করেন। এতে ইসলামী ইতিহাসের রোমান্টিক রূপ দেখান হয় যা আপাতদৃষ্টিতে পরবর্তী বংশধরদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ভারত-বিখ্যাত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমেদ খান ইসলামী ইতিহাসের প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি মেলে ধরতেন এবং পরবর্তীকালে একই স্কুলের আরেকজন বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা শিবলী নূমানী এ ব্যাপারটি জোরালো করে তোলেন। আমীর আলীর মতো শিবলী নূমানীও ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্য মনীষার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হন এবং পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য তিনি ইসলামী ইতিহাসের সমালোচনী বিশ্লেষণ গ্রহণ করেন। সুতরাং নূমানী প্রাথমিক যুগের সিরাত সাহিত্যের প্রতিটি কাহিনী বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন এবং ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে ইউরোপীয় রচনার উপরও তাঁর পুরো আস্থা নেই। অপর দিকে, আমীর আলী মুসলিম ইতিহাসের প্রায় সব কিছুকে যথার্থ প্রতিপন্ন করতে চান। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় পরবর্তী মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তার উপর এভাবে যে, তাঁরা তাঁদের অতীতকে পর্যালোচনা করতে নিরুৎসাহী হয়ে পড়েন।

তিনি পুরানো ইসলামী রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সম্পাদনায় প্রচ্যাবিদদের উদ্যোগ, 'ইসলাম সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং 'Encyclopaedia of Islam' প্রকল্পের প্রশংসা করেন। আমীর আলীর রচনায় এ মনোভাব খুঁজে পাওয়া যায় না।[১৫৫]

আমীর আলী তাঁর সত্তায় গর্বিত। তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রী একজন মহিলা, এতে তিনি গর্ববোধ করেন।[১৫৬] কিন্তু নারীদের পর্দা সম্পর্কে ইসলামী বিধানে তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি মনে করেন যে, সে বিধান শুধু অস্থির ও অসভ্য সমাজে দরকার এবং আধুনিক মুসলিম সমাজে তিনি এ ব্যাপারে সংস্কার করতে চান।[১৫৭] তিনি এটা অনুধাবন করেন না যে, এ সংস্কার করতে চেয়ে নবীজীর সমাজকে হেয় করা হয়, যাকে তিনি সর্বদা গৌবাবান্বিত করতে চেয়েছেন। তিনি ভুলে যান যে, এ দাবী তাঁর অপর দাবী কুরআনের সার্বজনীনতার বিরোধী।

Dhaka University Institutional Repository

স্মিথ ঠিকই বলেছেন যে, আমীর আলী ইসলামকে খ্রিস্টধর্ম অপেক্ষা উন্নততর ধর্ম মনে করেন।[১৫৮] তিনি বলেন, এই মহত্বের মর্ম 'ইসলাম' তার নামেই বহন করছে। তাঁর মতে, শব্দটির অর্থ শান্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে পূর্ণ শান্তি অর্জন করা। তাঁর আলোচনার প্রত্যেক পর্যায়ে তিনি উভয় সভ্যতার লাগসই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। তিনি সর্বদা চেষ্টা করেন খ্রিস্টধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে। অবশ্য এই তুলনা তাঁর পাণ্ডিত্যে একক নয়। তাঁর আগে মূর প্রমুখ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পার্থক্য এই যে, তিনি ইসলামের মাহাত্ম তুলে ধরেন, অন্যরা খ্রিস্টবাদের।

তিনি মনে করেন যে, ইসলাম ও খ্রিস্টাবাদে মূলত পার্থক্য নেই, কিন্তু পলের প্রভাবে খ্রিস্ট ধর্মের মর্ম নষ্ট হয়েছে। ইসলামে অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। কুরআনেই ঘোষনা দেওয়া হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের পথ দেখানো হয়েছেন, কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে [সূরা ৫; আয়াত ১৪] এবং খ্রিস্টানরা তাদের নবীদের করে অস্বীকার ; বরং মুসলীমরা ইবরাহীমের সত্য অনুসারী [২ : ১৩৫] এবং ইসলাম প্রকৃত অর্থে সত্য ধর্ম [২ : ১২০]। এ ব্যাপারে আমীর আলীর বিশেষত্ব এই যে, তিনি খ্রিস্টানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে তাঁর বির্তকের সমর্থনে বিশেষ ঘঁটনার উল্লেখ করেন। কিন্তু সমস্যা হল যে, তিনি খ্রিস্টবাদের বিরূদ্ধে উথাপিত অভিযোগের সমর্থনে দলিল প্রমাণ দেন না। উদাহরণস্বরূপ, সহিষ্ণুতার ব্যাপারে খ্রিস্টবাদের সাথে ইসলামের তুলনা করে তিনি বলেন :

জানা গেছে যে, সতের শতকে একজন যুবককে ফাঁসি দেয়া হয় এই কারণে যে, সে মুহাম্মদ (সা:) খারাপ লোক মনে করত না।[১৫৯] কিন্তু এ বর্ণনার সমর্থনে সূত্রের উদ্ধৃতি দেননি।

সৈয়দ আমীর আলীর একটি প্রধান উদ্বেগ ইসলামে যুক্তির ব্যবহার, যেহেতু তিনি জানেন যে, পাশ্চত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়নে যুক্তি ছিল একটি প্রধান উপকরণ। অপর পক্ষে মূর এ ধারণার বিরুদ্ধে চালেঞ্জ দেন যে, ইসলাম যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধানের অনুমতি দেয় এবং দাবী করেন যে, ইসলাম অলৌকিকতা ও কুসংস্করে বিশ্বাসী।[১৬০] মূরের প্রতিবাদে আমীর আলী বলেন যে, ইসলাম শুধু যে যুক্তিকে অনুমতি

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছে তাই নয়, বরং খ্রিস্টবাদের সাথে তার পার্থক্য এই যে, ইসলাম যুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহ দিয়েছে। তিনি বলেন যে, ইসলামের শিক্ষা যুক্তিভিত্তিক এবং ইউরোপীয় মুক্তচিন্তার নিকটবর্তী। তিনি কুরআনের বিবিধ আয়াত উদ্ধৃত করেন, যাতে প্রকৃতির বিধান এবং একজন সর্বময় কর্তৃত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানবিক সচেতনতা বিকাশের আবেদন জানান হয়েছে।

তিনি দাবী করেন যে, ইসলামের নবী কখনোই যুক্তির বাইরে যাননি। সুতরাং তিনি ইসলামের সেসব ধারণার রূপক ব্যাখ্যা দেন সেগুলি উনিশ শতকের শেষভাগে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের আলোকে খাপছাড়া মনে হয়। তাঁর মতে, কবরের পরে চিরস্থায়ী জীবনের ধারণা নিশ্চয়ই মানব-আত্মার অমর হবার অবচেতন আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত, যেখানে প্রিয় বন্ধুদের বিচ্ছেদ যা বন্য ও সভ্য উভয় প্রকার মানুষের জন্য দু:খজনক এবং পুনর্মিলনে শেষ হওয়া উচিত। তিনি ইসলামী বিধান আলোচনা করেন এবং প্রাক-ইসলামী 'আরবের সামাজিক বিধানের সাথে এগুলোর পার্থক্য তুলে ধরেন।

তারপর তিনি ইসলামের বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা আলোচনা করে বলেন যে, নবীকে আধ্যাত্মিক জিনিসগুলো বস্তুগত রূপের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাখ্যা করতে হয়। এ চিন্তা অবশ্য ইসলামে নতুন নয়। মুতাযিলী ভাবুক ও দার্শনিকরা বেহেশ্‌ত-দোযখের রূপক ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেও দিয়েছেন।

আমীর আলী ঐতিহাসিক যীশুর একত্ববাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, যে, যীশুর ধর্মীয় সচেতনতা গড়ে ওঠার পদ্ধতিতেই মুহাম্মদের মন গড়ে ওঠে। সৃষ্টিকর্তা ও ইসলামের নবীর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে দিয়ে তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের নবীর মতো প্রতিটি মানুষেরই তার নিজের বুদ্ধিমত্তা গড়ে তোলার সুপ্ত ক্ষমতা আছে। তিনি বলেন:

তাঁর আত্মার বৃহত্তর জাগরণের সাথে সাথে বিশ্বস্রষ্টার সাথে গভীরতর সংযোগের ফলে তাঁর চিন্তাগুলো আধ্যাত্মিক হয়ে পড়ে, যা প্রথমে বস্তুগত ছিল। শিক্ষকের মন শুধু তাঁর ধর্মীয় সচেতনতার উন্নতি ও কালের গতিতেই আবর্তিত হয় না, বরং তাঁর ছাত্রদের

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক ধারণার উন্নতি শঙকাতেও। তাই পরবর্তী সূরাগুলোতে আমরা লক্ষ্য করছি, আত্মার মধ্যে দেহের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক মিশ্রণ।[১৬১]

সৈয়দ আমীর আলীর মতে মনে হয়, মুহাম্মদ (সা:) যা বলেছেন, তার প্রতিটির উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল।[১৬২] কিন্তু এ কথাকে সত্য ধরে নিলে কুরআনের এ আয়াত বুঝতে সমস্যা হয় :

"হে মুহাম্মদ, তাদেরকে বলুন, আমরা নিজের ইচ্ছায় এতে কোন পরিবর্তন আমি করতে পারি না। আমি শুধু তাই অনুসরন করি, যা আমার উপর নাযিল হয়েছে। বাস্ত বিকপক্ষে আমি আমার প্রভুকে অমান্য করি, তবে এক মহাবিপদের দিকে শাস্তির ভয় আছে" [১০ : ১৬]

ফেরেশতার অস্তিত্ব ব্যাখ্যায় আমীর আলী একই রকম সমস্যাবলীর সম্মুখীন হন। তিনি বলেন :

সম্ভবত মুহাম্মদ যীশু ও অন্যান্য শিক্ষকের মতো, মাধ্যম জীবের অস্তিত্বে, মানুষের প্রতি আল্লাহ্ও প্রেরিত আসমানী দূতে বিশ্বাস করতেন। ফেরেশতায় আধুনিক অবিশ্বাস হেতু আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণাকে হেয় করার কোন যুক্তি নেই। আমাদের বিশ্বাস তাঁদের বিশ্বাসের মতোই সংস্কারাচ্ছন্ন;-------- আধুনিক যুগে আমরা যাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলি, তাকেই তাঁরা ফেরেশতা মনে করতেন----------।[১৬৩]

কুরআনের কয়েকটি আয়াতে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে মাধ্যমের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হল, জিব্রাঈল, যিনি আল্লাহর ইচ্ছায় আপনার অন্তরে ওহী আনেন [২ : ৯৭]। কুরআনের আরেক যায়গায় ঘোষনা করা হয় যে, তিনি (নবী) এক মহা-শক্তি দ্বারা শিক্ষিত হন [৫৩:৫]। এ রকম পদ্ধতিতে একজন মাধ্যমের (জিব্রাঈল) আক্ষরিক অস্তিত্ব রয়েছে ।[১৬৪] অবশ্য কুরআনের দার্শনিক ব্যাখ্যায় এসব আয়াত আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা হয়নি। জিব্রাঈলের মধ্যস্থতাকে সক্রিয় বুদ্ধিমত্তার ধারণায় চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আল্লাহর নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিকে দার্শনিকরা নিশ্চিহ্ন (ফানা) হবার সাথে একীভূত করে দেখান।[১৬৫] আমীর আলী এসব দার্শনিক ধারণা আলোচনা করেন না, কিন্তু তিনি এ ধরনের ব্যাখ্যা পছন্দ করেন বলে মনে হয়। তাঁর রচনায় তিনি ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তার দার্শনিকদের অবদানকে শ্রদ্ধা দেখান। সৈয়দ আহমদ খানের এরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে গতানুগতিক ধর্মীয় পণ্ডিতদের বিরোধীতা হেতু তিনি সম্ভবত তাঁর মত ব্যক্ত করতেন সন্তর্পণে।

আমীর আলী এক পর্যায়ে দাবী করেন যে, কুরআন ইসলামে একমাত্র অলৌকিকতা বা মু'জিযা।[১৬৬] এটা তাঁর চিন্তাধারার স্ব-বিরোধীতা। তিনি তাঁর চিন্তাকে যৌক্তিক করে বলেন যে, নবীজীর মন সময়ের সাথে এগিয়ে গেছে, নবীজীর সব শিক্ষা তাঁর দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত। পক্ষান্তরে, তিনি কুরআনকে ইসলামের একমাত্র মু'জিযা বলতে কি বোঝান, তা বিস্তারিত আলোচনা করেন না।

তিনি ইসলামের অন্য কোন মু'জিযার অস্তিত্ব মোটেই স্বীকার করেন না। সৈয়দ আহমেদ খান বাইবেলের অন্যান্য নবী ও তাঁদের মু'জিযার অস্তিত্ব-কাহিনী আলোচনা করেছেন।[১৬৭] কিন্তু তিনি তা করেন নি; যেহেতু ইহুদী নবীরা মু'জিযা দেখিয়েছেন এবং সাধারণের বিশ্বাস : নবীরা মু'জিযা দেখান, তাই মুহাম্মদ (সা:)-কে ও তা দেখাতে বলা হয়। তাঁর মতে ইসলামের নবী 'মানুষের অন্তর-চেতনা'র সাথে কথা বলেন, 'তার দুর্বলতা বা সরল বিশ্বাসের' সাথে নয়। তিনি মূরের উদ্ধৃতি দেন যে, মূরও চেয়েছেন মুহাম্মদ (সা:)-এর দাবীকে আশ্চর্য কাজের দ্বারা সমর্থিত করতে।

একই ভাবে আমীর আলী নবীজীর জীবন সম্পর্কে আশ্চর্য ও সংস্কারাচ্ছন্ন গল্প এড়াতে চেষ্টা করেন। নবীজীর জন্ম সম্পর্কে কাহিনীর উপর মন্তব্য করে তিনি বলেন:

তাদের কথায় তাঁর জন্মের সময় এমন সব চিহ্ন ছিল, যা থেকে পৃথিবীর জাতিগুলো জানতে পারে যে, বার্তাবহ এসেছেন। যুক্তিবাদী ইতিহাসবিদ মুচকি হাসেন, ধর্মীয় তর্কবিদ অবরোহী (a priori) যুক্তি দিয়ে বিনা মন্তব্যে জ্ঞানী লোকদের তারকা অনুসারী বর্ণনা গ্রহণ করেন, এসব আশ্চর্য বস্তুতে অবজ্ঞা-ভরে উপহাস করেন। চিন্তাশীল ছাত্রের কাছে, যাঁর হৃদয় প্রথমিক চিন্তাধারার প্রতি সহানুভূতিশূন্য নয় এবং যিনি ধারণায় এক পেশে নন, তাঁর কাছে নবীজীর জন্মের সাথে মুসলমানেরা যেসব বিস্ময়কর পূর্বলক্ষণ ও চিহ্ন সংযুক্ত করেন, তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন---------- ।[১৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

আমীর আলী নিজেকে শেষ পর্যায়ের সাথে চিহ্নিত করে ঐসব কাহিনীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ চেয়ে পুরো ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছেন। এ সব কাহিনী সিরাত সাহিত্যের প্রথম যুগে, যেমন ইবনে হিশামের রচনায় পাওয়া যায়। ইবনে হিশাম রচিত নবী-জীবনী থেকে নেয়া তথ্যের নিন্দাপূর্ণ সমালোচনা করার জন্য তিনি মূরকে অভিযুক্ত করেন এবং এসব সূত্রকে অবজ্ঞা-ভরে উপহাস করেন। একই সময়ে তিনি ইবনে হিশামকে সমর্থন করেন এই বলে যে, রচনাটি নবীজীর সবচেয়ে সতর্ক ও বিশ্বাসযোগ্য জীবনী হিসেবে গণ্য হতে থাকবে। আসলে কিন্তু তিনি নিজেও ইবনে নিশাম বর্ণিত অনেক কাহিনী এড়িয়ে গেছেন, যেমন নবীজীর জন্ম-ইতিহাস। সৈয়দ আহমদ খান ও শিবরী নুমানী ইসলামী ইতিহাস পাঠের যেরকম বৈজ্ঞানিক ধারা উদ্ভাবন করেন, তিনি তেমন কিছু ছিলেন নি। তিনি শুধু সেসব বিবরণ গ্রহণ করেন যা তাঁর মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মজার ব্যাপার, তাঁর শেষ দিকের রচনায় নবীজীর নৈশ ভ্রমনের (মি'রায) পুরো ব্যাপারটি তিনি এড়িয়ে গেছেন বলে মনে হয় [১৭ : ১]। ব্যাপারটি তিনি শুধু তাঁর রচনা ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত ' A Critical Examination of the life and teaching of Mohammod'-এ-ই আলোচনা করেন, যেখানে তিনি নৈশ-যাত্রার (মি'রায) ব্যাখ্যা দেন স্বপ্ন হিসেবে এবং সমর্থনের জন্য মূরের বরাত দেন।[১৬৯]

আমীর আলীর রচনায় দু'টি সাধারণ প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রথমত নবীজীর চরিত্রকে মানুষ হিসেবে তুলে ধরা; আর দ্বিতীয়, শিক্ষক হিসেবে নবীজীর ভূমিকা, বিশেষত মানব সভ্যতার বুদ্ধিমত্তা বিকাশে তাঁর অবদান। নবীজীকে সমর্থন করার কারণ বিদেশী পরিবেশে তাঁর মুসলিম সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার বহমান আগ্রহ। যে পরিবেশে তিনি বাস করতেন, তা ছিল একান্তই ইংরেজ। তেমন পরিবেশে ঐ সমাজে তাঁর অস্তিত্বের স্বার্থেই তাঁকে নবীর সমর্থন করতে হত। একই সময়ে তিনি চাইতেন, তাঁর পশ্চিমা শিক্ষিত সমধর্মীরা নতুন পরিবেশে তাদের সত্তা বজায় রাখুক।

আমীর আলী তাঁর রচনায় পাতার পর পাতা ইসলামী দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের কথা আর ইসলামী সভ্যতার গৌরব বর্ণনা করেন। তিনি ইসলামী সভ্যতা বিকাশের প্রশংসায়

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তাদের উদ্ধৃতি দেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, ইসলামই ইউরোপকে যুক্তিবাদে অনুপ্রাণিত করে এবং আভেম্পাস (Avempace) ও আবূ রুশদ ছিলেন দেকার্তে, হব্‌স ও লক্-এর পূর্বসূরী। তিনি আরো অনেক পশ্চিমা চিন্তাবিদের উল্লেখ করেন যাঁরা তাঁর মতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের থেকে শিখেছেন। তারপর তিনি খ্রিস্টবাদের বিরুদ্ধে বিতর্কে যান এবং দাবী করেন যে, ইউরোপীয় ক্রুসেডারগণ মুসলিম দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে।

এখানে আমরা তাঁর এ দাবী পরীক্ষা করব না যে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা মুসলিম পণ্ডিতদের দ্বারা প্রভাবিত; বরং যা আমাদের উদ্বিগ্ন করে তা এই যে, কেন তিনি খ্রিস্টবাদ অপেক্ষা ইসলামের মহত্ত্ব এবং ইসলামের সাথে আধুনিক পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী চিন্ত াধারার সামঞ্জস্য প্রমাণের উদ্যেগ নেন।

এই আচরণের পিছনে কারণ তাঁর ইসলামী ইতিহাস লেখার ইচ্ছায় নিহিত। তিনি তাঁর পশ্চিমা পাঠকদের বলতে চান যে, ইসলাম সম্পর্কে যা প্রচলিত ধারণা, তা অনেকাংশে বিকৃত এবং তিনি সুমলিম যুবকদের অনুপ্রাণিত করতে চান যে, পশ্চিমা উদারনৈতিক মতবাদ গ্রহণের পরও তাঁরা ইসলামের গণ্ডির মধ্যেই থাকবেন। মুতাযিলী মতবাদকে চাপা দেবার কারণে আব্বাসীয় খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সমালোচনা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এ ধরনের মনোভাব হেতুই আধুনিক যুগের মুসলমানরা তাদের সমসাময়িক ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক পিছে পড়ে আছে। তিনি শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের বলেন:

পাচ শতাব্দী ইসলাম মুক্ত মানবিক চিন্তাধারা বিকাশে সহায়তা করে, কিন্তু তারপর এক প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন শুরু হয় এবং পুরো মানবজাতির চিন্তাধারা হঠাৎ করে পাল্টে যায়। বিজ্ঞান ও দর্শনের ধারক-বাহকদের ইসলাম-বহির্ভূত বলা হল। রোমের গির্জা থেকে সুন্নী মতবাদের কি একটি শিক্ষা নেয়া অসম্ভব? সমস্যা বিস্তার করা–বহুমুখী হওয়া সুন্নী মতবাদের পক্ষে কি অসম্ভব ? মুহাম্মদের শিক্ষায় এমন কোন নিষেধ নেই। ইসলামী প্রোটেস্টান্টবাদ, তার এক পর্যায়ে মুতাযিলীয়রা ইতিমধ্যে সে পথ

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে দিয়েছে। মহান সুন্নী মতবাদ পুরানো প্রতিবন্ধক ঝেড়ে ফেলে নতুন জীবনে উজ্জীবিত হবে না কেন?[১৭০]

তাঁর আহবানে মনে হয় যে, তিনি মুসলিম সমাজে ইউরোপীয় রীতির সংস্কার দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু এ আহবান বাইরে থেকে আসা তিনি পছন্দ করেননি।[১৭১] তাঁর যুক্তি, সংস্কার ভিতর থেকে আসে, বাইরে থেকে নয়।[১৭২] ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমা রচনাবলির উপর তাঁর সমালোচনী মনোভাবটাও বোধ হয় আরেক কারণ।

ইসলামী মতবাদের ব্যাখ্যা থেকে মনে হয়, আমীর আলী ঊনিশ শতকের শেষভাগে প্রচলিত ইংরেজ উদারনৈতিকতায় প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি ইসলামী মতবাদগুলোকে ইংরেজ-উদার মতবাদে ব্যাখ্যা করেন। পশ্চিমা সভ্যতার নানাবিধ ধারায় তাঁর রচনা বহুল-পঠিত হয়। ঊনিশ শতকের উদার বৃটিশ চিন্তাধারা বিকাশে ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে জেরিমি বেনহাম, জন স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট স্পেন্সার-এর অবদানকে তিনি প্রশংসা করেন।[১৭৩] ইংল্যাণ্ডে যাঁদের সাথে আমীর আলীর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল, তাঁদের কিছুসংখ্যক ছিলেন একত্ববাদী, কিছু দৃষ্টবাদী (Positivist), আর উদার বৃটেনবাসী (Briton)। যদিও আলীর অধিকাংশ মতবাদই ইসলামী ইতিহাসে বর্তমান ছিল, তবু মজার ব্যাপার হল এই যে, তিনি শুধু সেই মতবাদগুলোই কেন বেছে নিলেন, যাকিছু পশ্চিমা মতবাদের সাথে একীভূত!

ঊনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডে সব ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে একত্ববাদীদের সবচেয়ে ভাল মানবতাবাদী অনুভূতি ছিল। তাঁরা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের সব উদারনৈতিক পরিবর্তনের নেতা। সুতরাং সৈয়দ আমীর আলী স্বাভাবিক ভাবেই একত্ববাদীদের মানবতার মূল্যবোধে প্রভাবিত হন। ইংল্যাণ্ডে তিনি বিখ্যাত মার্কিন একত্ববাদী প্রচারকের ভাগ্নে হেনরী চানিঙের সংস্পর্শে আসেন। ফলে তাঁর পরিবেশে আলী ইসলামী মানবত-বাদী মূল্যবোধের সাথে ইংল্যাণ্ডের উদার নীতির মিল খুঁজে পান। তিনি ইসলামী মানবতাবাদের উপর আলোকপাত করে তাঁর পশ্চিমা শ্রোতাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইসলাম বহু যুগ পূর্বেই সকল মানবিক মূল্যবোধকে স্বীকার করেছে। বিশেষত যখন

Dhaka University Institutional Repository

নবীজীর বিয়ে, নারীদের অধিকার ও দাসপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন তিনি ইসলামের মানবতাবাদী মর্মকথায় জোর দেন। এ সব ব্যাপারে আলোচনায় তাঁর কিছু বাস্তব সমস্যা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যদিও ইসলাম নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেছে ও তাকে অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সীমিত সংখ্যক বহুবিবাহ ও ইসলামে গ্রহণযোগ্য। দাস প্রথার ক্ষেত্রেও। ইসলামের নবী দাসদের মানবিক অধিকার দিয়েছেন, কিন্তু এ প্রথা বিদ্যমান রয়ে গেছে এবং পরবর্তীকালের মুসলমানরা এসব প্রথার সুযোগ গ্রহণ করেছে। এসব ব্যাপারে ইসলামের পাশ্চাত্য সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। তাই আলী তাঁর পাশ্চাত্য পাঠকদের ইসলাম সম্পর্কে পরিষ্কার ও যথেষ্ট ধারণা দেবার জন্য ইসলামী বাণীর মর্ম অনুধাবন করতে বলেন। আলীর চিন্তাধারায় আরেকটি বিষয় ছিল যা একত্ববাদী ধারণার সাথে অভিন্ন। এটি খ্রিস্টবাদের ইতিহাসের ব্যাখ্যা। একত্ববাদীরা খ্রিস্টবাদের মূল সরলতা নষ্ট করার জন্য সেন্ট পলকে দোষ দেয়। আমীর আলীও মনে করেন যে, পলের কারণেই খ্রিস্টবাদ আজ দূষিত।[১৭৪] একত্ববাদীরা 'ধর্মীয় খ্রিস্টের প্রতি যতটুকু অনুগত, ঐতিহাসিক যীশুর কাছে তার চেয়ে বেশী।[১৭৫] এ ব্যাখ্যা আলীর মুসলিম সচেতনতার সাথে খাপ খায়। একত্ববাদীদের সাথে আধুনিক খ্রিস্টবাদের সমালোচনায় সুর মিলিয়ে আলী প্রায় একই অবস্থান নেন।[১৭৬]

বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে যুক্তির ব্যবহার এবং মানব জীবনে পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি উনিশ শতকের ইউরোপে সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলল। একত্ববাদী লেখকরা এ সমস্যার প্রতি নতজানু মনোভাব দেখান।[১৭৭] আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, আলী উনিশ শতকে বৃটিশ উদারনৈতিক চিন্তা-বিকাশে জেরেমি বেন্‌হাম, জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো দার্শনিকদের অবদানের প্রশংসা করেছেন। এঁদের মধ্যে বেন্‌হাম ও মিল একত্ববাদী ; একত্ববাদে স্পেন্সারেরও অবদান আছে এবং তিনি ছিলেন অন্যতম 'যুক্তিবাদী ও উওর-ভিক্‌টোরীয় যুগের সর্বাধিক আলোচিত ইংরেজ চিন্তাবিদ।' যদিও আলী মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁদের ধারণা পছন্দ করেন, তবুও সম্ভবত তিনি ভারতীয় মুসলিম স্বার্থের কারণে তাঁদের নীতিবাদী তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারেন না যে, 'বৃহত্তম জনগোষ্টির কল্যাণে যা করা হবে তা ন্যায্য।'[১৭৮] তাই তিনি

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের রচনার রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে নীরব। অবশ্য আলী ধর্মীয় জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিবিধ বিষয়ে তাঁদের ব্যাখ্যা পছন্দ ও সহজে গ্রহণ করতে পারেন।

'উন্নতির ধনাত্মক স্তর ধর্মতত্ত্বকে ছাড়িয়ে যায়।'- উনিশ শতকের ইংরেজ চিন্তাধারায় কোঁতের (Comte) এ তত্ত্ব প্রাধান্য বিস্তার করে।[১৭৯] অগাস্ট কোঁতের মানবতার ধর্ম 'উদার খ্রিস্টান চক্রসমূহে সংস্কার প্রবণতাকে উৎসাহ দেয়, কিন্তু মানবতার মতো ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মীয় আন্দোলনের উত্থানকে উদ্দীপিত করে।'[১৮০] জন স্টুয়ার্টমিল কোঁতের ধর্মীয় চিন্তাধারা গ্রহণ এবং ইংল্যান্ডে তা জনপ্রিয় করেন। বেন্থাম এবং স্পেন্সারও এরূপ ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামী বিশ্বাসের ব্যাখ্যায়ও এরূপ ধারণার অস্তিত্ব তুলে ধরেন। আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই যে, আলী কোঁতে পড়েছেন অথবা তিনি কোঁতের 'মানবতার ধর্ম' ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী বিশ্বাস ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারার সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। অবশ্য আমরা জানি যে, আলী যখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন তখন বিখ্যাত দৃষ্টবাদী জেমস তার মরিসন-এর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন।[১৮১] জন স্টুয়ার্ট মিলকে কেন্দ্র করে কোঁতের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে মরিসন লণ্ডনে তৎপর হন।[১৮২] যদিও মিল দৃষ্টবাদী বলে খ্যাত নন, তবু তিনি 'প্রধানত কোঁতের বিবর্তনবাদী ধারণার সাথে তাঁর পরিচয়ের মাধ্যমে একটি উন্নততর উপসংহারে উপনীত হন।'[১৮৩] বৃটিশ উদারবাদী ও দৃষ্টবাদীদের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ও তাঁর পড়াশুনার মাধ্যমে আলীর পক্ষে কোঁতের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হওয়া খুবই সম্ভব।

আমীর আলী ধর্মের সংজ্ঞা দেন এভাবেঃ যা নৈতিকতার মূল ধারাগুলোকে একটি প্রথাসিদ্ধ ভিত্তির উপর স্থাপন করে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবিক কর্তব্যের মাধ্যমে আমাদের পারস্পরিক নৈকট্য বাড়ায়, বুদ্ধিমত্তার সর্বোচ্চ বিকাশের মাধ্যমে, সকল সর্বাঙ্গীনের প্রতি।[১৮৪]

আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক ও ধর্মের এই উপলব্ধি দৃষ্টবাদীর ধর্মীয় চেতনা সংশ্লেষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টবাদের জনক কোঁতের মতে ধর্মের সংজ্ঞা হল, 'মানব জীবনের সেই সুশৃঙ্খল অবস্থা যা ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগত আকারে

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের সকল অংশে একে অপরের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক বিধান করে।'[১৮৫] কোঁতে প্রকৃতির আইনবিধানে বুদ্ধিমত্তা দেখতে চান। তাঁর উপলব্ধিতে মানব-সভ্যতার উন্নতি হয় এভাবে: মানুষ ও সমাজের সর্বোচ্চ উন্নতি আমাদের নৈতিক প্রকৃতির সকল ত্রুটির উপর আমাদের কর্তৃত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধির মধ্যে।[১৮৬]

কোঁতের বিশ্বাসের ভিত্তি পদার্থ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান। বুদ্ধিমত্তা বিকাশের প্রক্রিয়ায় মানুষ ক্রমবর্ধমান প্রকৃত সংশ্লেষণে পৌঁছে, যতই সে বুদ্ধিমত্তা উপলব্ধি করে, এবং সবশেষে বাইরের হুকুমে যে নৈতিক নিয়ন্ত্রণ তাও পুরোপুরি বুঝতে পারে---------।[১৮৭] কোঁতে আবার বলেন: দৃষ্টবাদের এই মৌলিক মতবাদ (বাইরের হুকুম) তার সম্পূর্ণ অর্থে কোন একক চিন্তাবিদের প্রাপ্য নয়। আলাদা বিভাগে সংঘটিত বিশাল প্রক্রিয়ার ধীর ফল এটি, যার শুরু আমাদের বুদ্ধিমত্তার শক্তির প্রথম ব্যবহারে এবং যা মাত্র সম্পূর্ণ হল তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঐসব ক্ষমতাকে তাদের সর্বোচ্চ রূপে প্রকাশ করে।[১৮৮] প্রকৃতির বিধানের ধারণা সম্পর্কে কোঁতে বলেন :

প্রকৃতির বিধান সম্পর্কে মৌলিক ধারণাবলি হচ্ছে বাইরের জগত ও আমাদের মনের যোগফল পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত কোন ধারণা নয়।[১৮৯] কোঁতে যেমন দৃষ্টবাদের পক্ষে যুক্তি দেন, আমীর আলী তেমনি ইসলামের কেবল যুক্তির আবেদন তুলে ধরেন। ঊনিশ শতকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঢেউ আলী ও কোঁতে উভয়কেই একমাত্র বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে। আলী যুক্তি দেন যে, কুরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যা মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রতি আবেদন রাখে, যাতে মানুষ একজন সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব চিনতে সমর্থ হয়।[১৯০] কোঁতেও ধীর পদ্ধতিতে যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এক 'সর্বশক্তিমান' বা চিরন্তন 'বিধানের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।[১৯১] এ ক্ষেত্রে আলী মনে হয় এড়িয়ে যান যে, যদিও কুরআন মানব-বুদ্ধির প্রতি আবেদন, তবু তার দাবী–শুধু বিশ্বাসীরাই হিদায়েত পারে। [২ :৩]

বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বাইরের শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা কোঁতে স্বীকার করেন যা তাঁর মতে সকল মানবিক কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।[১৯২] তিনি তাঁর শক্তির কাছে প্রর্থনা করার প্রয়োজনীয়তা বোঝেন। সৈয়দ আমীর

Dhaka University Institutional Repository

আলী সর্বশক্তিমানের কাছে সার্বিক আত্মসমর্পণের সুপারিশ করেন এবং ইসলামী প্রার্থনার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।[১৯৩] কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদ (rationalism) মুহাম্মদকে পাঠানো আল্লায়ী জ্ঞান-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়। (উনিশ শতকের শেষভাগের আবিষ্কার সমূহের আলোকে।)

কোঁতের দৃষ্টিতে ঐশী সংশ্লেষণ মানুষের আচরণের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, আর সময়ের সাথে তা লাভ করে। তিনি মনে করেন যে, ধর্মগুলো মানুষের বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম হয়েছে। আমীর আলী কোঁতের সাথে মানবজীবনে ধর্মের বাস্তব ক্রিয়া সম্পর্কে একমত।[১৯৪] কিন্তু এ সব প্রয়োজন যেমন ভালবাসার গুনাবলি, হৃদয় ও বুদ্ধিমত্তার যুক্ত ভূমিকার প্রয়োজন, মানবজীবনে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পূরণে ইসলামের ভূমিকা তুলে ধরেন,[১৯৫] অথচ কোঁতে এগুলোকে তাঁর 'মানবতার ধর্মেই করেন একীভূত। কোঁতে পুরানো ধর্মগুলো সম্পর্কে বলেন:

"তখন দৃষ্টবাদীরা হয়ত যে কেনো ধর্মে বিশ্বাসীদের চেয়ে বেশী সত্যভাবে জীবনকে চলমান ও বিশ্বস্ত উপাসনা-কর্ম মনে করতেন, যে উপাসনা আমাদের অনুভূতিকে করবে উন্নত ও পবিত্র, আমাদের চিন্তাধারাকে করবে মহৎ ও আলোকিত, আমাদের কাজকে করবে মহানও জীবন্ত।"[১৯৬]

আগেই দেখেছি, আলী মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোঁতের সাথে একমত, কিন্তু এ প্রয়োজন পূরণে তাঁরা একমত নন। আলী দাবী করেন যে, যদিও খ্রিস্টবাদ এ প্রয়োজন মেটাতে পারেনি, ইসলাম মানবজাতির এ সব প্রয়োজন পূরণ করে। তিনি বলেন:

সুতরাং ধর্ম, যা নৈতিকতার মূলনীতিকে প্রথাসিদ্ধ ভিত্তির উপর স্থাপন করে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবিক কর্তব্যের মাধ্যমে আমাদের পারস্পরিক নৈকট্য বাড়ায়, বুদ্ধিমত্তার সর্বোচ্চ বিকাশের মাধ্যমে। মুহাম্মদ যেমন শিখিয়েছেন, ইসলামের অনবদ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে যুক্তি ও মানুষের নৈতিক সত্তার।[১৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

কোঁতে দৃষ্টবাদক খ্রিস্টবাদের উত্তরসূরী ও শ্রেয়তর মনে করেন। তেমনিভাবেই আমীর আলী যুক্তি দেন যে, ইসলাম কিতাবী ধর্মগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।[১৯৮] এবং তার যুক্তির সমর্থনে 'নীচু জাতগুলোকে সামাজিক নৈতিকতার উচ্চতর পর্যায়ে' উঠানোর সাফল্যের উদাহরণ দেন। তিনি যুক্তি দেন যে, খ্রিস্টবাদ একটি 'অসম্পূর্ণ ধর্ম' রয়ে গেছে, কারণ খ্রিস্ট দীর্ঘদিন বাঁচেন নি এবং তাঁর মিশন পুরো করার দায়িত্ব মুহাম্মদের জন্য রাখা থাকে।[১৯৯]

সৈয়দ আমীর আলী এবং কোঁতে উভয়েই মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস (creeds) ও চিন্তা ধারার বিরোধী।[২০০] উপরন্ত তাঁদের মতে মধ্যযুগে সমাজের চরিত্র ছিল খুব সামরিক ও অভিজাত। কোঁতে মধ্যযুগের সমস্যাবলির সামাধান খুঁজে পান রাজনীতিকে নৈতিকতার অধীন করার মধ্যে। আলী এর সমাধান পান ইসলামের নবীর শিক্ষা পুনরুদ্ধারের মধ্যে। কোঁতে মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়া একটি ন্যায়নীতিপূর্ণ সমাজের জন্য দার্শনিকদের পৌরহিত্য চান।[২০১] এবং আলী শিক্ষিত ভারতীয় মুসলিমদের প্রতি আবেদন জানান মুসলিম সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার।[২০২]

কোঁতের সাথে আমীর আলীর চিন্তাধারা তুলনা করতে গিয়ে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমাদের হাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে, আলী কোঁতে পড়েছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের চিন্তাধারা একই ধরনের তাই আমরা বলতে পারি যে, আলী কোঁতের দ্বারা প্রভাবিত; যদি তিনি কোঁতে সরাসরি না-ও পড়ে থাকেন, তবু ঊনিশ শতকের শেষভাগে বৃটিশ উদারপন্থী চিন্তাধারায়- যাতে কোঁতের একটি স্থায়ী ছাপ ছিল, তাতে তিনি প্রভাবিত হন। কোঁতে ও আলীর তুলনা থেকে আরেক সমস্যা উদ্ভূত হচ্ছে যে, আমরা আলীকে দৃষ্টবাদী বলব কি না।

আমাদের মতে জবাব না- কারণঃ তাঁদের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য। কোঁতে তাঁর দৃষ্টবাদী চিন্তার মাধ্যমে এই উপসংহারে পৌছান যে, দৃষ্টবাদী চিন্তার চলমান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এটি এক চলমান পদ্ধতি, কোঁতের মতে। আলীর মতে যা কিছু দৃষ্টবাদী তা ইসলামের শিক্ষায় রয়েছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

যদি কেউ এসব শিক্ষা পালন করে, তবে সে এক ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

আমীর আলী প্রাথমিকভাবে পশ্চিমাদের সাথে পশ্চিমা ভাষায় কথা বলেন। তাঁর রচনা ছিল আধুনিক যুগের খ্রিস্টান-মুসলিম সংলাপের অংশ। তিনি ইমলামী চিন্তাধারাকে উনিশ শতকের ব্রটিশ সমাজের ভাষায় অনুবাদ করতে চেষ্টা চালান। সম্ভবত এ কারণেই তিনি ইসলামের মানবিক গুণাবলীকে তৎকালীন বৃটিশ মূল্যবোধের সাথে একীভূত করেন। যেহেতু কোঁতে সেই দার্শনিকদের অন্যতম, যাঁরা উনিশ শতকের ইউরোপীয় একটা নিশ্চিত প্রভাব ফেলেন, তাঁই আলী পশ্চিমা শ্রোতাদের সাথে সেই ভাষাতেই কথা বলেন।

আমীর 'আলীর রচনা ইসলামী চিন্তাধারায় আধুনিক ভাষ্যে আরেক গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধন করে। তাঁর এ চেষ্টা সুন্নী ও শী'আ মুসলিমদের পারস্পরিক নৈকট্য বাড়ানোর চেষ্টা। এ ব্যাপারে ইসলামের ভারতীয় জগতে চেষ্টা শুরু হয় শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌র চিন্তায়।[২০৩] এ ধারা ভারতে চালু থাকে এবং যখন আমীর আলী মঞ্চে আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি তৈরি পেলেন একটি 'শী'আ-সুন্নী মিশ্রণ'। তিনি এর কৃতিত্ব দেন মুসলমানদের উপর পশ্চিমা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে।[২০৪] তিনি এ 'মিশ্রণ'কে বাস্তব রাজনীতির একটি অংশ মনে করেন।[২০৫] ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর রচনায় আমীর আলী ইসলামের সব বীরকে গৌরবান্বিত করেন তাঁদের পটভূমি নির্বিশেষে। তিনি প্রথম দু'জন খলীফাকে ইসলামী সমাজ গড়ায় তাঁদের অবদানের পুরা মর্যাদা দেন।[২০৬]

ইতিহাসে আমীর আলীর সবচেয়ে চমদপ্রদ ব্যাপার তুরস্কে কামালপন্থীদের বিরুদ্ধে 'উসমানীয় খিলাফতের পক্ষ সমর্থন। ঐতিহাসিকভাবে বারো পন্থী শী'আ সর্বদা বিরোধীতা করেছে খিলাফত প্রথার; কিন্তু তার চিরাচরিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে আমীর আলী খিলাফত বিলোপের বিরোধিতা করলেন। তুরস্কে বিবিধ সংস্কার হয়। সংস্কারের পক্ষ সমর্থন করা সত্ত্বেও আমীর আলী এর খিলাফত সমর্থন যুগ-লালিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর ভাবাবেগ প্রকাশ করেন। সম্ভবত তিনি বৃটিশ রাজতন্ত্রের মতো প্রথা মুসলিম জগতেও দেখতে চেয়েছিলেন। আমীর আলীর রচনায় আরেক দিক ফুটে উঠেছে ভারতীয়

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে তাঁর অবদানের মাধ্যমে। তিনি শুধু ভারতীয় মুসলমানদের অধিকারের কথাই বলেন নি, অন্যান্য দেশের মুসলমানদের কথাও বলেছেন। তিনি মুসলিম দেশগুলোর প্রতি বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন। সময় সময় তিনি সাধারনভাবে ভারতীয়দের পক্ষে বলেছেন। তিনি ভারতের সমস্যা নিয়ে একজন ভারতীয় মুসলিম হিসেবেই লেখা শুরু করেন।[২০৭] কিন্তু শীঘ্রই তিনি নিজেকে একজন ভারতীয় মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর রচনা থেকে মনে হয়, তিনি বাকী জীবনের সবটুকু এ পরিচয় বজায় রাখেন। মুসলিমপন্থী মনোভাবের জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় ; কিন্তু আমীর আলী এ অভিযোগ কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। একই সময় তিনি স্বীকার করেছেন যে, একই দেশে হিন্দু-মুসলিম মিলন অসম্ভব।[২০৮] তিনি ভারতে বৃটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব চেয়েছেন। তিনি মনে করেন যে, বৃটিশ শাসন মুসলমানদের স্বার্থে। তিনি কখনো পৃথক মুসলিম সার্বভৌম রাষ্ট্রের কথা ভাবেননি ; কিন্তু একই সময়ে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম অধিকারের কিছু সংরক্ষণ চেয়েছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে উপযোগীবাদী (utilitarian) তত্ত্ব অনুযায়ী "কোন কাজ অধিকাংশ মানুষের উপকারে হলে তা-ই-ন্যায়" মানতে পারেন নি। তিনি দেখেছেন, তেমন সংরক্ষণ একমাত্র ভারতে বৃটিশ রাজত্বের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ইংরেজী ভাষা ও সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দেন, যাতে বৃটিশ-সহানুভূতি পাওয়া যায়।

আমীর আলী মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ-নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি ইউরোপীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে তুর্কিদের পক্ষে কথা বলেন। তিনি উদারনৈতিকতার নামে তাদের সচেতনতায় বৃটিশ জনমতের প্রতি আবেদন জানান, যেন বিশ শতকের প্রথম দিকে ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুরস্ককে সমর্থন দেওয়া হয়,- শুধু এজন্যে নয় যে, তুরস্ক ন্যায় পথে রয়েছে ; বরং এ কারণেও যে, ইংল্যাণ্ড তৎকালীন বিশ্বে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠির রাজশক্তি।[২০৯] ইটালীর বিরুদ্ধে তুর্কী বা লিবীয় কার্যক্রমকে তিনি মুসলিম আক্রমণ মনে করেন না। বরং তাঁর মতে, উভয় কার্যক্রমকেই বিরোধীতা করা উচিত,

Dhaka University Institutional Repository

কারণ দুটোই অন্যায়। তিনি অভিযোগ করেন যে, 'এসব কাজের এক ভগ্নাংশও (লিবিয়ায় ইটালীর আক্রমন) যদি তুর্কীরা করত, তাহলে সারা গ্রেট বৃটেনে নিন্দার ঝড় বয়ে যেত' আপাতদৃষ্টিতে হতাশ আমীর আলী প্রশ্ন করেন, 'ইংল্যাণ্ডের খ্রিষ্টান নারী-পুরুষ, যাঁরা তাঁদের অন্তরে মহান বিশ্বাস পোষণ করেন, তাঁরা কি অতীতের বর্বরতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হতেন না?[২১০]

ভারতীয়রা কানাডা ও আফ্রিকায় যে ব্যবহার পায়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমীর আলী পশ্চিমা সভ্যতাকে 'সাদা' ও বর্ণবাদী বলে সমালোচনা করেন। বেশ মজার ব্যাপার যে, যদিও তিনি সর্বদা মুসলিম স্বার্থের পক্ষে কথা বলেন, এ ব্যাপারে তিনি সাধারণত: ভারতীয়দের পক্ষে বলেন এবং কালোদের জন্যও নয়, এমন কি যদি 'কালো মুসলিমরাও' একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হত বৃটিশ উপনিবেশগুলোতে।[২১১]

সৈয়দ আমীর আলী ভারতীয় মুসলিম সমাজের ক্রান্তিমহূর্তের শুরুতে জন্মগ্রহণ করেন। এ ক্রান্তি ছিল জীবন ও কারিগরি উন্নয়নে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ব্যাপারে গতানুগতিকতাকে আধুনিক সমাজে পরিবর্তন। ভারতীয় মুসলিমরা শুধু বুঝল যে, তাদের শাসন আমল শেষ হয়েছে এবং নতুন পরিস্থিতিতে তাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন।

সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ও তার জবাব-এর খেলা। সভ্যতার উৎস সম্পর্কে টয়েনবী বলেন যে, যদিও তাদেরকে (সভ্যতা) অনুপ্রাণিত করতে কিছুটা বস্তুগত চ্যালেঞ্জ লাগেই, তবু প্রধান ও একান্ত আবশ্যকীয় চ্যালেঞ্জ হল মানবিক চ্যালেঞ্জ, যা সমাজের সাথে তার সম্পর্ক দ্বারা নির্ণীত।[২১২]

ইতিহাসে আমীর আলীর অবদান যেন টয়েনবীর তত্ত্বের একটি প্রমাণ।

পাশ্চাত্যে ইসলামের উপলব্ধি বিশেষত ইংরেজদের মধ্যে ভারতে মুসলিম সচেতনতাকে ততদিন নাড়া দেয় নি, যতদিন না বৃটেনের রাজনৈতিক প্রাধান্য তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। একমাত্র ১৮৫৭'র 'অভ্যুত্থান'-এ মারাত্মক অবদমনের পরেই ভারতীয় মুসলিমরা বুঝল যে, ইংরেজী ভাষায় ইসলামের বর্ণনায় তাদের কিছু আসে যায় না।[২১৩]

Dhaka University Institutional Repository

তারা বৃটিশদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য সহ্য করল, কিন্তু পারল না ধর্মীয় প্রধান্য গ্রহণ করতে। তারা এ চ্যালেঞ্জকে তাদের অস্তিত্বের প্রতি সরাসরি হুমকি মনে করল। খ্রিষ্টান মিশনারী তৎপরতা তাদের উৎকণ্ঠা আরো বাড়িয়ে দেয়।

আমীর আলী সেই গুটিকয়েক মুসলমানদের একজন যিনি ইংরেজী ভাষায় ইসলাম সম্পর্কিত সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেছেন। ভারতে ইংরেজ মিশনারী তৎপরতার মুসলিম প্রতিক্রিয়া শুরু হয় সৈয়দ আহমদ খানের রাজনীতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার মাধ্যমে। সৈয়দ আহমদ খান তাঁর ঘনিষ্ট সহযোগীদের সাহিত্য-চর্চা কম-বেশী ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজী ভাষায় ইসলামের বর্ণনার মুসলিম প্রতিক্রয়া আমীর আলীর রচনায় জোরালো ভাবে প্রকাশ পায়।

আমীর আলী স্বীকার করেন যে, তিনি ইসলামের নবী (সা:)-এর জীবন সম্পর্কে লেখা শুরু করেছেন পশ্চিমা ইতিহাসবেত্তাদের বর্ণিত 'প্রতিটি মিথ্যা তত্ত্ব' ও অপ্রমাণিক আজগুবি গল্প মিথ্যা প্রমান করার জন্য; তাঁর উদ্দেশ্য হল 'আরব নবীর জীবন ও শিক্ষার মূল বৈশিষ্টগুলো জনপ্রিয় রূপে তুলে ধরা, বহু পাঠকের মন থেকে ভুল ধারনা ও ভুল সংস্কার দূর করা; চেষ্টা ও প্রমাণ করা যে, ইসলাম মানব জাতির জন্য সত্যিকারে রহমত; এটি মানবতাকে উন্নত করতে সহায়ক ----------।[২১৪] জনাব আমীর আলীর মনোভাবকে সঠিকভাবে বলা যায় ইসলামের জন্য আনুগত্যমূলক।[২১৫] তিনি এমন কিছুর প্রতিবাদ করেন যা তাঁর ভাষায় 'মিথ্যা' তত্ত্ব'। তাঁর প্রথম প্রকাশনা যা ইংল্যাণ্ডে উচ্চশিক্ষার সময় লিখেছিলেন, যা ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। আমীর আলী তাঁর A Critical Examination of the life and Teaching of Mohammad (মুহাম্মদের জীবন ও শিক্ষার সমালোচনা) পুস্তকে ইসলামের নবী (সা)-এর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কিত সেসব প্রশ্নের জবাব দেন, যা তাঁর মতে মিথ্যা ধারণা।

আমীর আলী তাঁর মনোভাব কিছুটা বদলান যখন ১৮৯১ সালে তিনি তাঁর প্রথম বই পরিবর্ধিত করে রীতিমত ইতিহাস গ্রন্থের রূপ দেন Sprit of Islam (ইসলামের মর্মবাণী) নামে। তাঁর প্রথম গ্রন্থে খ্রিষ্টবাদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এই যে, মানবতার

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশে শুধু খ্রিষ্টবাদই নয়, ইসলামও অবদান রেখেছে মানুষের মর্যাদা বর্ধনে। ইসলাম ও খ্রিষ্টবাদ সমান সম্মান পেয়েছে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী রচনায় তিনি খ্রিষ্টবাদের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। এই সময়ের মধ্যে স্যার উইলিয়াম মূরের প্রতিও তাঁর মনোভাব বদলান, মূলত যাঁর তিনি প্রতিবাদ করতেন। আমীর আলীর প্রথম গ্রন্থে মূরকে 'ইসলামের শত্রু' মনে করেন।[২১৬] ক্রিটিকাল একজামিনেশন' গ্রন্থে আমীর আলী প্রায়শ মূরের বরাত দেন এবং তাঁর পাঠকদের আবেদন জানান, ইতিহাসের বর্ণনায় তাঁর ও মূরের পার্থক্য করে দেখার জন্য।[২১৭] কিন্তু পরবর্তী পরিবর্ধিত সংস্করণে তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে অধিকতর নিশ্চিত এবং এ প্রবনতা পুরোপুরি এড়িয়ে যান। তাঁর প্রথম বইয়ে তিনি এমন সব বিষয়ের সমর্থনে মূরের বরাত দেন যাকে মূর ইসলামের পরম বৈশিষ্ট্য মনে করেন। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে মূরের প্রতি তাঁর মনোভাব একেবারে প্রতিকূল। এমন কি নবী (সা:)-এর গুণ বর্ণনায় মূরের বরাত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা:) এত বড় মহান ব্যক্তিত্ব যে, মূরের মতো একজন শত্রুকেও তাঁকে স্বীকৃতি দিতে হয়।

এখন মজার প্রশ্ন হল যে, খ্রিষ্টবাদ ও মূরের প্রতি আমীর আলীর সমালোচনা মনোভাব কালক্রমে বেড়ে চলল কেন? আমদের মতে, এর কারণ আমীর আলীর পরিবেশ। সে পরিবেশ ছিল প্রধানত ইংরেজ ও খ্রিষ্টান। তিনি ইংরেজ সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে ভালভাবে পড়াশুনা করেন এবং ইংল্যাণ্ডে থাকা কালে কতিপয় বৃটিশ বুদ্ধিজীবীর সংস্পর্শে বৃটিশ উদার-নীতির দ্বারা প্রভাবিত হন। কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে তাঁর বাস্তব জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেছেন :

আমি কোন পৃষ্ঠপোষকতা আশা করিনি এবং পাইনি। ইংরেজ মামলা-পরিচালনা আমাকে একজন অনধিকার-হস্তক্ষেপকারী মনে করত; হিন্দুরা-খোলাখুলিভাবে অপছন্দ করত, ইংরেজ ধারায় জীবনযাপন করতাম বলে মুসলমানরা আমাকে ধর্মত্যাগী মনে করত।[২১৮]

আপাতদৃষ্টিতে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই ইংরেজ আবহাওয়ায় বাস করতে পছন্দ করেন, যেখানে অধিকাংশ ইংরেজ তাঁকে অনধিকার-হস্তক্ষেপকারী মনে করত। এটা

Dhaka University Institutional Repository

সত্য যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন 'কিছু মানসম্পন্ন' ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেন।[২১৯] এবং কিছু উদারপন্থি তাঁকে ধন্যবাদ যানান; কিন্তু সম্ভবত তিনি যেসব ইংরেজ ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের অধিকাংশই উদার মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না। এদিকে আমীর আলী তাঁর মুসলিম সত্ত্বা সম্পর্কে ছিলেন সদা সচেতন। অতএব, তিনি ঐ সমাজে ইসলাম ও নবী সম্পর্কে বহু প্রশ্নের সম্মখীন হন। এ সব মূরের 'life of Mahomet' দ্বারা সমর্থিত হতে পারে, কারণ তা ইংরেজী ভাষায় ইসলামের র্নিভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। বিদেশী পরিবেশে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার আবহমান প্রচেষ্টা ঐ সমাজে তাঁর অস্তিত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। মনে হয়, নিজেকে ঐ পরিবেশে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি এ বিষয়ে লেখা শুরু করেন। যেহেতু মতামতের জন্য মূরের সমর্থকদের থেকে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতার সম্মখীন হতে হয় তাঁকে, তাই মূর ও তাঁর খ্রিষ্টান সমর্থকদের প্রতি তাঁর মনোভাব কালের প্রবাহে বদলে যায়।

আমীর আলীর পরিবেশ তাঁর রচনার আরেক গুরুত্বপূর্ণ দিকে প্রভাবিত করে, তা হল সাধারণভাবে ধর্মে ও বিশেষভাবে ইসলামে যুক্তি ও মানবতার প্রশ্নে। আঠারো ও উনিশ শতকে ভৌত বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ইউরোপীয় দার্শনিক ও ধর্মবেত্তাদের মধ্যে এ সমস্যার আলোচনা হয়।[২২০] ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে আমীর আলী খ্রিষ্টান নতজানু ধর্মবেত্তাদের দ্বারা প্রভাবিত হননি, হয়েছেন বরং উদারনৈতিক চিন্তাধারার কতিপয় বৃটিশ বুদ্ধিজীবীর দ্বারা। উনিশ শতকে পর্দাথবিদ্যা ও জীববিজ্ঞান নতুন আবিষ্কারে নি:সন্দেহে বৃটিশ উদার-চিন্তা ছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, আমীর আলী আগাষ্ট কোঁতের দৃষ্টবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। কোঁতে ভাবতেন যে, ধর্মত্ত্বের সময় শেষ আর দৃষ্টবাদী দর্শনের সময় এসে গেছে। কোঁতে খ্রিষ্টবাদ ও সাধারণভাবে ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা করতেন এবং মনবতার গুনাবলি এবং বস্তুবিজ্ঞানের বিকাশকে উৎসাহিত করতে দৃষ্টবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর মতে খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বের সময় শেষ হয়েছে এবং তার স্থান নিয়েছে মানবতার ধর্ম অর্থাৎ দৃষ্টবাদ। এদিকে আমীর আলী দৃষ্টবাদের মানবিক ও যৌগিক গুণাবলিকে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সাথে একীভূত করে আপাতদৃষ্টিতে কোঁতের ধারণা গ্রহণ করেন। কোঁতে যুক্তি দেন যে, দৃষ্টবাদ হচ্ছে খ্রিষ্টবাদের উন্নত রূপ; আর আমীর আলী যুক্তি দেন যে, ইসলাম যুক্তিবাদ ও বস্তুবিজ্ঞানের বিকাশকে উৎসাহিত করেছে।

আমীর আলীর শ্রোতাদের প্রশ্নগুলো পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ঠ বিতর্কিত বিষয়। তিনি নিজেই দাবী করেন যে, ভারতীয় শিক্ষিত মুসলিম এবং ইসলাম সম্পর্কে 'ভুল ধারণার' পশ্চিমা শিকার–এই উভয় দলকে উদ্দেশ্য করে লিখছেন। তবুও তিনি দাবী করেন যে, তাঁর মনে প্রাথমিক উদ্দেশ্য ভারতীয় মুসলমান। ফজলুর রহমান ও ডব্ল্যু, সি. স্মিথ এই মত গ্রহণ করেন।[২২১]

মনে হয়, আমীর আলীর মনোভাব ভারতে ইসলামী উন্নতির এক বিকশিত উদাহরণ। সৈয়দ আহমদ খান তাঁর সময়ে চিন্তিত ছিলেন যে, যুবক মুসলিমরা আধুনিকতা বর্জন করেছে এবং এভাবে তারা তাদের ইউরোপীয় সমসাময়িকদের সাথে পেরে উঠবে না; আমীর আলী তার উল্টো চিন্তিত হলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবক মুসলিমরা তাদের প্রথাগত বিশ্বাস ও তাদের সত্তা অস্বীকার করে বসতে পারে। এদিকে আজিজ আহমদ মনে করেন যে, ইসলামের ইতিহাসে আলী পুনর্ভাবনা করেছেন পশ্চিমা শ্রোতাদের জন্য, যাদের মনে তা যথেষ্ট দাগ কেটেছে।[২২১]

আমীর আলীর রচনার প্রভাব সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব। আমাদের প্রচেষ্টা–মুখ্যত কার উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, তা নির্ধারণ করা। তাঁর অধিকাংশ রচনায় ইতিহাসের যেসব বিষয়ে তিনি একমত নন তাঁর সমালোচনা মাত্র কয়েক পাতা ব্যয় করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি ইসলামের বিখ্যাত আইনবিদ ও ধর্মবেত্তা আহমদ বিন হাম্বল (র)-এর চিন্তাধারা সম্পর্কে একমত নন, আব্বসী খলিফা মুতাওয়াক্কিলের মুতাযিলা-বিরোধী মনোভাবও তিনি পছন্দ করতেন না। নীতি অনুসারে দুই বিরোধী দলের বক্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গুণে, তাঁর সম্ভাব্য মতানুসারীদের মধ্যে চিন্তা জাগানোর জন্য তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল যে, কোন বিষয়ে আলোচনায় সঠিক পথ মুতাওয়াক্কিলের মতো চিন্তাকে চাপা দেয়া নয় ; বরং যেহেতু ইসলাম যুক্তিকে উৎসাহ দেয়, সুতরাং মুক্ত চিন্তাকে উৎসাহ দেওয়া উচিৎ। এটা করার বদলে তিনি খ্রিষ্টবাদের

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনা ও মুসলিম শাসক ও আইনবেত্তাদের কার্যকলাপকে ন্যায্য প্রমাণের প্রয়াসে বেশী শক্তি খরচ করেন। মনে হয় তিনি শুধু তাঁর সমাজের লোকদের বুঝাচ্ছেন যে, তাঁর অস্তিত্ব আইনসঙ্গত এবং খ্রিষ্টান ইতিহাস অপেক্ষা মুসলিম ইতিহাস নিম্নমানের নয়; পক্ষান্তরে তা অনেক দিক থেকে উৎকৃষ্টতর। তাঁর আশে-পাশের লোকজন সবসময়ই ইংরেজ , তা তিনি ভারত বা ইংল্যাণ্ড, যেখানে অবস্থান করুন না কেন।

খ্রিষ্টবাদের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বা নিয়ে তাঁর দাবী থেকে মনে হয় তিনি তাঁর উদারপন্থী বন্ধুদের সন্দেহ নাশ করতে চেয়েছেন যে, ইসলাম ভিন্নমত সহ্য করে এবং এ ব্যাপারে ইসলামের ইতিহাসে অনেক উদাহরণ রয়েছে। আলীকে যারা ইংরেজ পরিবেশে একজন অনধিকার প্রবেশকারী বিবেচনা করেন মনে হয় তাদের বিরুদ্ধে তিনি খ্রিষ্টবাদের সমালোচনায় মুখর। আমীর আলীর রচনায় এ প্রবনতা থেকে ধারণা হয় যে, তাঁর প্রধান উদ্যেগ তাঁর আশেপাশের পশ্চিমাগণ।

আমীর আলী তাঁর রচনার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী ব্যবহার করেছেন। যুবক ভারতীয়দের কথা তাঁর মনে থাকলে উচিৎ ছিল একটি ভারতীয় ভাষায় লেখা; কারণ তিনি সর্বদা দাবী করেছেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের একটি মাত্র সাংস্কৃতিক ভাষা।[২২২] পশ্চিমা শিক্ষিত মুসলমান ও ইসলামী ভাষায় শিক্ষিত মুসলমান উভয়ই তা থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারত। আমীর আলীর রচনায় আরেক দিক দেখায় যে, যাদের জন্য তিনি লিখেছেন তাদের পরিভাষাও ভিন্ন, যেমন, মুহাম্মদের চার্চ, সুন্নী চার্চ, সারাসেন্স, নিম্নতর জাতি, ভাববাদীতুল্য প্রভৃতি। এগুলো বিশুদ্ধ পশ্চিমা পরিভাষা আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিমরা এসব পরিভাষায় পরিচিত নন। আমীর আলী এ পরিভাষা ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দেন এ বলে :

আমি 'চার্চ' শব্দটি ব্যবহার করি এমন অর্থে যা অন্য কোন শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়- যুগব্যাপী প্রচলিত একটি সংহত মতবাদ যা জাতিসমূহের ধর্মীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগে পরিণত হয়েছে। [২২৩]

এ থেকে বোঝা যায়, আমীর আলী মুখ্যত পশ্চিমা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন। আলীর লেখা অধিকাংশ বই ও রচনা ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ থেকে এটাও বুঝা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য পশ্চিমাদের মধ্যে ইসলামের উপলব্ধি সাধন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় মুসলিম সম্পর্কে তাঁর কোন উদ্বেগ ছিল না। এই উদ্বেগ অবশ্য গৌণ প্রকৃতির।

ইসলামী ইতিহাসে আমীর আলীর ঝোঁক এটা দেখায় যে, ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে লেখার পিছনে তাঁর একটি বিশেষ যুক্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে, মুসলমানরা পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার জন্য ইসলামের গোড়ার দিকের মুতাযীলী চিন্তাধারা পুন;গ্রহণ করুক। তিনি ইসলামের মানবিক মূল্যবোধের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ইসলামকে প্রকৃতির ধর্ম হিসেবে তুলে ধরাও তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য। ইসলামের বাণী দ্বারা বস্তুগত, দার্শনিক ও নৈতিক উন্নয়ন সাধনের দিকেও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। এসব উন্নয়ন যখন মুসলিম শাসক ও আইনবেত্তাদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত, তখন তিনি তাকে রক্ষা করেন বা নীরব থাকেন। তাঁর সমালোচকরা এ পদ্ধতির ইতিহাস রচনার সমালোচনা করেছেন। আমীর আলী নিজেই মূরের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং তাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করেন যে, তিনি কতিপয় সযত্নে লালিত তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য ইতিহাস লিখেছেন।[২২৪] সেই তত্ত্বগুলো ভুল প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমীর আলী লেখেন আর আপাতদৃষ্টিতে তাঁরও নিজস্ব তত্ত্ব প্রমাণ করেন। সুতরাং পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁদের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। আমীর আলী আর মূরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, মূরের পূর্ব ধারণা ছিল ইসলাম ধর্ম খ্রিষ্টবাদের চেয়ে নিম্নমানের; আর তাই তিনি অনুভব করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে কর্মরত খ্রিষ্টান মিশনারীদের হাতে এমন এক রচনা থাকা উচিত, যা এ ব্যাপারে তাদেরকে আস্থাবান করে। আলীর পূর্ব ধারণা ইসলাম খ্রিষ্টবাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং শুধু বিজ্ঞান ও যুক্তির উপর ভিত্তিশীল, আর তাই মুসলমানদের এ ব্যাপারে আস্থাবান হওয়া উচিত। আলী মূলত একজন আইনজীবি, ইতিহাসবিদ নন। তিনি কতিপয় কারণে ইতিহাস লেখেন। এতে ইংল্যাণ্ডে 'আমীর আলী ও ইসলামের সুনামে ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশী হয়।'[২২৫] ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা এবং ইসলামী ইতিহাসের বিশেষ ঘটনাবলীতে তাঁর রশ্মিকেন্দ্র ভারতের শিক্ষিত যুবক মুসলিমদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, গৌরব ও আস্থা সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করে। এটি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি উন্নত অবস্থা। আমীর আলীর মতো অধিকাংশ পশ্চিমা শিক্ষিত ভারতীয় মুসলিম ব্যক্তিগত বা পেশাগত পর্যায়ে ইংরেজ পরিবেশের সংস্পর্শে আসেন। প্রাক্তন মুসলিম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গৌরবের কারণে তাঁরা হীনমন্যতার শিকার হন। যদিও তাঁরা পশ্চিমা মূল্যবোধকে সম্মান করেন, মানসিকভাবে তাঁরা পৈতৃক বিশ্বাস ত্যাগ করতেও পারেন না ; আর ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রচারণাও গ্রহণ করতে পারেন না। সৈয়দ আহমদ খানের তৎপরতা তাঁদেরকে পশ্চিমা সভ্যতা ও উন্নতির সাথে পরিচিত করে, কিন্তু গৌরবান্বিত হবার অনুভূতি দিতে পারে না। পক্ষান্তরে, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর আত্মরক্ষামূলক রচনাবলি তাঁদের নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করার প্রবণতাই বাড়িয়ে তোলে। পশ্চিমা শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানের যখন এই মানসিক অবস্থা, তখন আমীর আলী এগিয়ে এলেন আত্মরক্ষা নয়, বরং সমালোচনার মনোভাব নিয়ে। আমীর আলীর তর্কপ্রিয়তা ও বৃটিশ ভারতীয় সরকারে তাঁর উচ্চপদ এই নতুন বংশধরদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করে। এই নতুন আস্থা ভারতীয় মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করে ইংরেজ ভদ্রোলোকের মতো উদার হতে এবং একই সাথে তার স্বকীয়তার গৌরবান্বিত বোধ করবে। স্মিথ বলেন যে, আমীর আলীর বিস্ময়কর রচনা 'স্পিরিট অব ইসলাম' ভারতীয় মুসলিম সমাজের এই পুরো ধারাকে তুলে ধরে।[২২৬] স্মিথ এই যুবক মুসলিমদের বর্ণনা দেন এভাবে :

'ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক পরা এক যুবক মুসলিম তার বন্ধুদের সাথে লাহোর কফি হাউসে বসে ইংরেজী ভাষায় মার্ক্স বা টেনিস সম্পর্কে আলোচনা করছে। সে সম্ভবত কখনোই কুরআন অধ্যয়ন করেনি তবু মুসলিম বলে খুব সচেতন, সে জোর দিয়ে বলে যে, সে আর ভারতে তার ধর্মের লোকেরা এক জাতি এবং সে বলে যে, তাদের জন্য একটি মুক্ত দেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়তে সে প্রস্তুত।'[২২৭]

ইংরেজ উদারতাবাদে ও মুসলিম স্বকীয়তায় প্রভাবিত যুবক মুসলিমদের এ নতুন বংশধর তাদের 'আধুনিক' মনোভাব সম্পর্কে এতই আস্থাবান ছিল যে, যদি কেউ

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে ইসলাম ও উদার জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যকার আপাতবিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, তবে তারা সাথে সাথে জবাব দিত, 'বেশ, আপনি কি আমীর আলীর The Sprit of Islam পড়েন নি ? অবশ্য আমীর আলীর ব্যাখ্যার পরস্পরবিরোধ নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে প্রতিফলিত হয়।

নব্য যুব-মুসলিমদের যারা উচ্চ-মধ্য শ্রেণীর ভূমি-মালিক অভিজাত, আমীর আলী তাদের আদর্শ পুরুষ হবার আরেকটি কারণ আছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে মুসলিম চিন্তাধারা তুলে ধরার সাফল্য আমীর আলীকে এদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলে। আমীর আলী নিজেকে একজন 'প্রভুভক্ত' ভারতীয় মুসলিম বলে চিহ্নিত করেন এবং সারা জীবন ভারতীয় মুসলিমদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করেন। মুসলমানরা যাঁরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে বিপদে পড়েন, তাঁরা আমীর আলীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে উজ্জ্বল অগ্রগতির মধ্যে আশার আলো খুঁজে পেলেন। বৃটিশ ভারতীয় বিচার বিভাগের চাকুরিতে তিনি সফল হন এবং তৎকালে ভারতীয়দের জন্য প্রদত্ত সর্বোচ্চ পদে আসীন হন। সার্থক আইনজীবি হিসেবে তিনি শুধু ভারতের মুসলমানদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য ওকালতী করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্যে কিছু মিথ্যা তত্ত্বের দরুন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় পক্ষপাত আছে। আপাত দৃষ্টিতে তিনি এ ধর্মীয় পক্ষপাতের রাজনৈতিক প্রভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই তিনি জাতিপুঞ্জে কিছু মুসলিম দেশের অন্তর্ভুক্তির জন্য ওকালতী করেন, বলকান ও তুর্কী-ইটালী যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের সমর্থনে আবেদন জানান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের প্রতি বৃটিশ মনোভাবের সমালোচনা করেন। তাঁর স্বভাবসুলভ আত্মরক্ষামূলক সুর কখনো সমালোচনামূলক হয়ে ওঠে। তাই তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ও ইউরোপীয় মনোভাবকে আক্রমণ করেন :

'প্যান ইসলামিজমের ভূতকে ইউরোপীয় জনগণের মানস-চক্ষে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তা যেন খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধংদেহী এক জঙ্গী শক্তি, ক্ষতিকর আবিষ্কার ইউরোপীয় আক্রমণকে যথার্থ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে।[২২৮]

Dhaka University Institutional Repository

আমীর আলী অবশ্য ভারতীয় ছাড়া অন্য মুসলমানদের ব্যাপারে জনমতকে পক্ষে আনতে সক্ষম হননি। যদিও তৎকালীন বিশ্বে তিনি বৃটেনকে বিশ্ব শাসনকারী বৃহত্তম শক্তি মনে করেন, তবু তিনি বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি রচনায় কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হননি। উপরন্ত খ্রিষ্টবাদ ও সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর এলোপাতাড়ি সমালোচনা সম্ভবত তাঁর পাশ্চাত্য পাঠকদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, উদাহরণ স্বরূপ বৃটিশ 'রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি' পরিচালনায় বৃটিশ জনগণের সাহায্য পান; কিন্তু সে সাহায্য আপাতদৃষ্টিতে শুধু সামাজিক তৎপরতায়ই সীমাবদ্ধ ছিল।

ভারতে আমীর আলী চান হিন্দু-মুসলিম এক সমাজে সহাবস্থান করুক।[২২৯] কিন্তু স্বাধীন ভারতে তিনি মুসলিম অধিকারের সংরক্ষণ দেখতে পাননি। তাই তাঁর কাছে ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব একান্ত প্রয়োজন, আর তা মুসলমানদের স্বার্থেই।[২৩০]

বৃটিশদের প্রতি এবং ভারতের ভবিষ্যতের প্রতি আমীর আলীর মনোভাব শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের কাছে তাঁকে আরো জনপ্রিয় করে তোলে। সম্ভবত সে কারণেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ চেয়েছিলেন যেন আমীর আলী নিখিল ভারতে কংগ্রেসের সভাপতি হন, যখন জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিমকে এক মঞ্চে আনার চেষ্টা করন। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় আমীর আলীর অবদান পাকিস্তান সৃষ্টির পরও আপাতদৃষ্টিতে জিন্নাহর মনে ক্রিয়াশীল ছিল। জিন্নাহর এ বক্তব্য তার বহি:প্রকাশ যে, (পাকিস্তানে) কালে কালে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না এবং মুসলিমও আর মুসলিম থাকবে না- ধর্মীয় অর্থে নয়, কারণ তা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রের নাগরিক।' দার্শনিক কবি মুহাম্মদ ইকবাল যখন কেম্ব্রিজে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন, তখন আমীর আলীর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসেন। মনে হয়, তিনি আমীর আলীর স্পিরিট অব ইসলাম-এর নির্ঘন্ট তৈরি করেন।[২৩১]

আমীর আলীর রচনাবলী বিশেষত; স্পিরিট অব ইসলাম, যা ডব্ল্য. সি. স্মিথের ভাষায় উদারতাবাদের নিশানবর্দার ভারতের বাইরে অন্যান্য মুসলিম দেশেও প্রভাব ফেলে। বইটি আরবি, ইন্দোনেশীয়, তুর্কি ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয় এবং পরবর্তীকালের

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম পণ্ডিতরা এর প্রচুর উদ্ধৃতি দেন। পাশ্চত্যেও বইটি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে । একজন পশ্চিমা নও-মুসলিম লেখেন :[২৩২]

আমার ইসলামী অধ্যয়নে যে বইটি সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে, তা সৈয়দ আমীর আলীর The sprit of Islam- যদিও বইটিতে গ্রন্থকার বহু প্রথা ও মনোভাব সংস্কার করতে চেয়েছেন, যে ব্যাপারে মুসলিম জগতে বইটি সমালোচনাহীন নয়। অবশ্য বইটি ইসলামী বিশ্বাসের সত্য-গৌরব অনুপ্রেরণা এভাবে মুসলিমদের এবং গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরে যা পালন করার চেষ্টা বাস্তব জীবনে প্রতিটি মুসলিমের নিশ্চিত কর্তব্য হওয়া উচিত। নি:সন্দেহে বইটি মুসলিম ছাত্রদের অধ্যয়নের চেষ্টা করা কর্তব্য।[২৩৩]

পূর্বেই দেখেছি যে, খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে আমীর আলীর সমালোচনা বৃটিশ জনমতে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ভারতের বাইরে মুসলমানের পক্ষে তাদের সমর্থন জয় করতে তিনি ব্যর্থ হন। আমীর আলীর রচনার আরেকটি প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হয়, আর তা হয় শিক্ষিত ভারতীয় মুসলিমদের উপর। তিনি সর্বদাই মুসলিম শাসক ও বুদ্ধিজীবীদের অবদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইসলামী ইতিহাসের গৌরবময় অংশে এই গুরুত্ব আরোপ এমন ভাব সৃষ্টি করে যে, 'মুসলমানদের সব কিছুই ভাল' মানবজাতির ইতিহাসে মুসলমানদের ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ।' এই মনোভাব যুবক শিক্ষিত মুসলিমদের তাদের ইতিহাস সমালোচলকদের দৃষ্টি নিয়ে পড়তে বিমুখ করে, যার ফলে তাদের দিক নির্ণয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

আমীর আলী ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়গুলো সরাসরি আলোচনা করেন নি। কিন্তু ওহী নাযিলের ব্যাপারকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করার ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন, তাই 'উলামাকে প্রতিক্রিয়ামুখর করে তুলতে যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল। তাঁরা তা হন নি কেন, তা এক মজার প্রশ্ন বটে! সম্ভবত যে ধরনের 'উলামা সৈয়দ আহমদ খানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাঁরা আমীর আলীর ইংরেজি লেখা বোঝার অবস্থায় ছিলেন না। মার্কিন-নও-মুসলিমা মরিয়ম জামিলা (ইয়াহুদী থাকাকালে পূর্ব-নাম) পরবর্তীকালে আমীর আলীর রচনা সম্পর্কে বলেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

'উলামা যদি ঘুমানোর বদলে তাঁদের কর্তব্যে সচেতন থাকবেন, তাহলে এ বইয়ের বিষয়বস্তু (স্পিরিট অব ইসলাম) আল্লাহ-দ্রোহী বলে নিন্দিত হওয়া উচিত ছিল।'[২৩৪]

তবুও ভারতীয় মুসলিম সমাজ গঠনে আমীর আলীর রচনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি পশ্চিমা-ঘেঁষা সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকদের সত্তা সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে সফল হয়েছেন। আত্মবিশ্বাসে তাঁর গুরুত্ব আরোপ মুসলিম জাতিয়তাবাদী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে। রাজনীতিকে আমীর আলী ভারতীয় মুসলিম ভাইদের মঙ্গল বিধানে আগ্রহী ছিলেন। তাতেও তিনি তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাই ভারতে আলীগড় আন্দোলোনের সন্তানরা অধিকাংশ সময়ই আমীর আলীর রচনা থেকে তাঁদের বুদ্ধিমত্তার দিকনির্দেশ গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. প্রদীপ সিনহা বলেছেন, The question of Muhammadan leariring presents as varitety of facets, some of which are of fascinationg complexity. Pradip Sinha- Nintecnth Century: Aspect of Social History: Firma K.L Mukhopadhyay, calcutta, 1965. P. 50

২. The Indian Middle class. P – 12

৩. Pradip Sinha Niateenth contury: Aspect of social History : Firma K.L. Mukhopadhyay, Cacutta, 1965. P-50

৪. Abdul karim, B.A- Mohammedan Education in Bengal, Metcalfe Press, Calcutta, 1900. P.1

৫. উইলিয়াম এজাম তার রিপোর্টে বলেন, "Learned Musalmans are is general much better Prepared for ceception of European ideas then Learned Hindus.

৬. এন এন ল, প্রমোশন অব লার্নি ইন ইণ্ডিয়া, মুসলিম রুল, ৬১৬।

৭. ব্লকম্যান (অনুবাদক) আইন-ই-আকবরী, ১ম খঃ ২৮৮।

৮. ইকরাম মুসলিম সিভিলাইজেশন ইন ইণ্ডিয়া পাকিস্তান, পৃঃ ৪৬৯ এম এ, রহিম, প্রাগুক্ত, ৩১০-২৩।

৯-১০. হান্টার, প্রাগুণ্ড ১৭০, মল্লিক, প্রাগুক্ত, ১৫০

১১-১৪. জে লং এডামস রিপোর্ট, ১৮,২৯,৪০,৪২।

১৫-১৯. ঐ থার্ড রিপোর্ট, ২৮৯,২০০,৩৫,১৫৩,১৯৯।

২০. এম,এ,রহিম, পৃঃ ২৯১-৯২।

২১-২৪. জে লং, ১১১-১৬, ৪৮-৭৩, ২১৫-৩২৭।

২৫. এ আর মল্লিক, ১৫১-৫৩, ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. জে লং, ১৫৩-৫৬ ৭৩।

২৭-২৯. ঐ, ৯৭-৯৯, ১৫৬; মল্লিক, ১৬৪-১৬৫। শুভংকর কোন সময়ের লোক তথ্যসংকেত জানা যায় না। তাঁহার রচনায় ফার্সী শব্দের মুসলমানদের প্রথা আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাংলায় মুসলমান শাসনামলের লোক ছিলেন।

৩০.কাজী এ মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ৯।

৩১.জে লং ১-৪।

৩২.এম আলী, বেঙ্গল রিয়েকশন টু খ্রীষ্টান ২০৬।

৩৩-৩৬. জে লং, ৫-৮, ৫৪; মল্লিক, ৩৮৬।

৩৭-৩৯. আর সি মজুমদার, বেঙ্গল ইন নাইনটিনথ সেঞ্চুরী, ২৩-৩০, ৪৮। লুই হেনরী ভিভিয়ান ডরেজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। সামাজিক ভাবধারায় তিনি ছাত্রদেরকে প্রভাবিন্বিত করেন।

৪০. মান্নান, ৯; এম আলী ৬৮।

৪১-৪২. আর সি মজুমদার, ৩২, ৪৮।

৪৩. উইলিয়ম কেরী ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজিবলোচন, রমানাথ বাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ বিদ্যাসাগর ইহার শিক্ষক ছিলেন। ইহার উর্দু শিক্ষক কবি মীর আমানের 'বাগ ও বাহার' কলিকাতায় ছাপা হয়। ১৮৫৪ সালে এই কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হয়। (ইয়ুসুফ আলী, হিন্দুস্তান কী তমদ্দুন কী তারিখ, ১২৬-২৮।)

৪৪-৪৭. মল্লিক, ১৭৯-৯০।

৪৮. উপরে দ্রষ্টব্য।

৪৯-৫১. মল্লিক, ৯৬-৯৮-১৬৮।

৫০.হিষ্টরী অব ফ্রীডম মুভমেন্ট, ২য় খ: ১ম ভা: ২৫২।

৫১-৫২. মল্লিক, ২০১, ২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩.মজুমদার, ৪৭-৬৫।

৫৪-৫৮. মল্লিক, ৩০০-২৯; মজুমদার, ৪৮।

৫৯. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮০ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮৭ সালে; আলীগড় স্কুল ১৮৭৫ ও কলেজ ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬০-৬২. মল্লিক, ১৬৪, ২৯১-৯২; জে লং ২১৭।

৬৩. তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৪. হিন্দু কলেজে শুধু হিন্দুদেরকে ভর্তি করা হইত।

৬৫-৬৯. হান্টার, ১৭৩-৭৫; মল্লিক, ২২৬-৪৩, ২৪৯-৭৪।

৭০.জে লং, এডামস, সেকেণ্ড রিপোর্ট, ৯৭-৯৯।

৭১-৭৫.হান্টার ১৭৩-৭৫; মল্লিক, ২৭৪-৮, ৩২৫।

৭৬. মজুমদার, ৫০। এ রব (ফজলুল হক, পৃঃ ২) বলেন যে হুগলীর আহমদ মিয়া ১৮৬১ ও নবাব সিরাজুল ইসলাম ১৮৬৭ সালে বি, এ পাশ করেন।

৭৭-৭৯. রামগোপাল, ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, ৭৫; মজুমদার, ৫১।

৮০. Nawab Babadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, P. 216.

৮১. Muhammad Azizul Haq ----- History and Problems of Muslim Education in Bengal, Calcutta, 1917. মুস্তফা নূরউল ইসলাম কৃত অনুবাদ- বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৬৯, পৃ. ৪৫

৮২. The Proceedings of the Goverment of Indiai in the Home Department (Education) No, 300 Simla, 7 August 1871.

৮৩. W.W. Hunter—Report of the Indian Education Commission, 1883.

Dhaka University Institutional Repository

৮৪.১৭-সংখ্যাক সুপারিশিটি ছিল এরূপ: That the attention of the Local Goverment distributed among educaned Mahomedans in which the partronage is distributed among educaned Mahomedans and others" Report of the India, IIndians Education Commission, 1883.

৮৫. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃ, ১৭৬

৮৬.বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃ. ১৭৫

৮৭. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা . পৃ. ৩৭-৩৮

৮৮. Mahomedan Education in Bengal. See Appendix.

৮৯.তালিকাটি ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রণীত 'স্মারকলিপি' থেকে সংকলিত k. k. Aziz --- Ameer Ali : His Life and works. Karachi, Pp. 29-31.

৯০. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, ড. রশিদুল আলম, পৃ: ৬৪২.

৯১.বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাসে ও সমস্যা, পৃষ্ঠা. ৪০

৯২.সি. ই বাকল্যান্ড শিক্ষা বিষয়ক উডের ডেসপ্যাচকে ভারতের শিক্ষার সনদ' বলেছেন, লর্ড ডালহাউসির অভিমত, এতে সারা ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনা প্রতিফিলিত হয়েছে। অর্থাৎ এই শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বভারতীয় ঐক্য ও সমন্বয় সাধিথ হয়। C.E Buckand – Bengal under the Lieten Governors (1854-94). vol. 1. Calcutta, 1961. P.7

৯৩.Nawab Bahadur Abdul Latif: His writings and Related Documents, P. 216

৯৪.Muhammad Azizul Haq- History Education in Bangal. Calcutta, ১৯১৭, মুস্তফা নূরউল ইসলাম কৃত অনুবাদ- বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯ পৃষ্ঠা. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

৯৫.The Proceedings of the Goverment of Indian in the Home Department (Education) No, 300 Simla 7 August 1871

৯৬.W. W. Hunter – Report of the Indian Education Commission, ১৮৮৩.

৯৭.১৭- সংখ্যক সুপারিশটি ছিল এরূপ : The attention of the Local Goverment be invited to is dustribnuted among educated Muhomendans and others" Report of India, IIndeans Education Commission, ১৮৮৩

৯৮.বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা পৃ. ৪০

৯৯.বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃ. ১৭৫

১০০. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা পৃ. ৩৭-৩৮

১০১.ঐ পৃষ্ঠা . ৩৮

১০২.Mahomendan Education in Bengal, See A

১০৩. এম এ, বিএ, (অনার্স ও পাশ) এবং বি এল- এর সংখ্যা কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ সালে প্রাকশিত ক্যালেন্ডার (২য়) থেকে সংকলিত হয়েছে। এফ এ, আই এ এবং এন্ট্রান্সের সংখ্যা আজিজুল হকের পূর্বাক্ত গ্রন্থ (পরিশিষ্টি) থেকে গৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সব কলেজের মুসলমান ছাত্র গণ্য করা হয়েছে। তখন বাংলা বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বেঙ্গুন প্রভৃতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল।

১০৪.এই সংখ্যার মধ্যে কিছু পুনবৃত্তি আছে, কারন একই ব্যাক্তি বিএ, বিএল, এম এ পাশ করেছেন। এই সংখ্যার মধ্যে কতজন বাঙালি মুসলামন আর কতজন অবাঙালি মুসলমান তা সঠিক করে বলা যায় না।

১০৫. ১৮৬১ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো আরবি বিভাগে অধ্যায়রত ৩৩, তালুকদার ৩৭, মুনশী১৩, ব্যবসায়ী ৬, কাজী ৬, মুন্সেফ ৩, দারোগা-শিক্ষক-উকিল আয়মাদার ইত্যাদি অবশিষ্ট এ্যাংলো ফারসি বিভাগের ২৮০ জন মোক্তার

Dhaka University Institutional Repository

২২, নকলনবিশ২০, সরকারী, কোর্ট অফিসার ১৩, পুলিশ ডাক্তার ৯, কেরানী, ৮, সরকারি পেন্সন ভোগী ৮, পুলিশ অফিসার ৫, রুটি প্রস্তুতকারী ১, অপেশাজীবী ৫। Selection from the records of India, home Deptt, Calcutta 1886. PP- ২২-৩১.

১০৬.তালিকাটি ন্যাশনাল মোডামেজন এসোসিয়েসন কর্তৃক প্রনীত 'স্মায়কলিপি, থেকে সংকলিত K.K Aziz- Ameer Ali: His Life and Work? Karachi, PP. ২৯-৩১.

১০৭. The Indian Middle Class, PP. ১২৩. ১৩৩- ৩৪.

১০৮. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা : ডঃ বশীদুল আলম ২০০২, পৃষ্ঠার

১০৯.বাংলার কয়েকজন মুসলিম ফিশারী।

১১০.উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা ডঃ ওয়াকিল আহমেদ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৩১

১১১.আমীর হোসেন, মোহামেডান এডুকেশন, ১৮৮০, পৃষ্ঠা ১-৭

১১২.ডঃ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৬০

১১৩.আমীর হোসেন, মোহামেডান এডুকেশন, ১৮৮০, পৃষ্ঠা ১-৭

১১৪.এম, এ, খান, মুসলিম মডার্নিজম, প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ১৫-১৮

১১৫.+ ৩২ সেময়রস্ত ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৭-৭১।

১১৬.Memorial of the National Mahomedan Assoceation, Ameer Ali: His Lise and words, edited by K.K. Aziz, Lahore PP. ২৩-৪০.

১১৭.Memorials of the National Mahomeddn Association, Caluetta, February 1882 (Reprinted) in Ameer Ali: His Life and words, edited by K.K. Aziz, Lahore, P.P 23-40

১১৮.মেময়বস, ৬ষ্ঠ-খন্ড, পৃষ্ঠা, ১৬৭-৭১

Dhaka University Institutional Repository

১১৯. Ibid, P. 38

১২০. Ibid, (II), PP. 65-66

১২১. Ibid, P. 68

১২২. Report of the Moslem Education Advisory Committee. 1934, Pp. 73-74.

১২৩. Syed Razi Wasti, Pp. 58-59. * ভাষাণটির ইংরেজী অনুবাদ দেখুন- পরিশিষ্ট নং- ২

১২৪. Syed Razi Wasti, Pp. 58-59. * ভাষাণটির ইংরেজী অনুবাদ দেখুন- পরিশিষ্ট নং- ২

১২৫. Moslem Chronicle, January 13, 1900, P. 775.

১২৬. K. K. Aziz- Ameer Ali : His Life and Works, pp. 37-38.

১২৭. Abstract of the Proceedings of an Extraordinary Meeting of this Committee of the Mahomedan Lierary Society of Calcutta,..... 9June, 1900

১২৮. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভাসমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

১২৯. বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, পৃঃ ৩৫

১৩০. Syed Ameer Ali M. A., C. I. E- Muhammadan Education and Muhammadan Society (Presindential Address delivered at the Muhammadan Educational Conference of 1899, Calucuua, 1900.

১৩১. Report of the Proceedings of the First Provincial Mohammadan Educaitonal Conference held at Rampur Boalia, Rajshahi on the 2nd and 3rd April 1904, Pp. 6-9.

১৩২. Memor

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩. Ameer Ali to Private Sectretary, Viceroy, 10 March, 1884 (British Museum, Indian State Papers 2902/8) quoted in the Emergence of Indian Nationaism by Anil Seal (Camloridge, 1971), P. 312 (fn).

১৩৪. শেখ রশিদ, প্রাগুপ্ত, ১৯-৩১।

১৩৫. Syed Amjad Husain, Allama Wahed Husain : an Unforgettable Personality Pp. 7-9.

১৩৬. Memorial of the National Mahomedan Association. Calcutta, February 1882 (Reprinted) in Ameer Ali: His Life And works, eduted by K.K Aiziz, Lahone, PP. ২৩-৪০

১৩৭. Ram Gopal – Indian Mulsims, A Political Hisfory (1858-1947) , P.P. PP, ৮০-৮১

১৩৮. শেখ রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ১৬৭-৭১

১৩৯. মেময়রস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭০

১৪০. W.C. Smith, `Modern Islm in India' (London : Victor Gaollanez, ১৯৪৬) দ্র. ১১.

১৪১. D.C. Sen, History of Bengali Language and literature (Calcutta ; University of Calcutta, ১৯৪৫) দ্র. ৭১৭

১৪২. A. Ali, Menoris' Memoirs and other writings of Ameer Ali, ed. R. Wasti. (Lahore : People's Publishing House, 1968) pp. ৩২-৩৩

১৪৩..... `The Mohammedans of India and their place in the Empire' Ameer Ali : His life and work. ed. K.K. Aziz (Lahore : Publishers United ১৯৬৮) দ্র. ৩৭৮

Dhaka University Institutional Repository

১৪৪..... A Critical Examination of the life and teaching of Mohammed. (London: Willam and Norgate, ১৮৭৩) Preface, p. vii

১৪৫. Norman Daniel, Islam and the West : Making of an Image. (Edinburgh : Edinburgh University Press, ১৯৫৮) p. 294

১৪৬. উদাহরণস্বরূপ হুসেন হায়কল নবী-জীবনের উৎস হিসেবে কুরআনের ব্যবহারে মূরকে পণ্ডিত গণ্য করেন। [Muir rejects the forgery of the Quran : M.H. Haykal : The life of Muhammad, হায়াতে মুহাম্মদীর ইংরেজী অনুবাদ, অনুবাদক ইসমাইল রাজী আল-ফারুকী, ইণ্ডিয়ানাপোলিস, ১৯৭৬. নর্থ আমেরিকান ট্রাষ্ট পাবলিকেশন্স, পৃ. 1xiii-1xx]

১৪৭. Peter Hardy, The Muslims of British India (Cambridge : Cambridge University Press, ১৯৭২) p. 62.

১৪৮ uthern-Gi fvlvq Bmjvg সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় ধারণা :'..... এক বিপুলসংখ্যক শত্রু বাহিনী খ্রিস্টবাদকে সব দিকে দিয়ে হুমকি দিচ্ছে ; আর তাদের কোন মনোযোগ নেই নর্থমেন স্লভ ম্যাগিয়ারদের থেকে তওহীদবাদী ইসলাম অথবা Manichean heresy থেকে মুহাম্মদের ধর্ম পৃথক করার।" (R.W. Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge Harvard University Press, 1962, p. 3)

১৪৮. London Binder, The Ideological Revolution in the Middle East. (New York : John wiley and Sons, Inc. ১৯৬৪) p. 47

১৪৯. Joseph Scaff, `Christian Missionary Attitude Towards Islam in India' (Unpublished M.A. Thesis, montreal : M. Gill University, ১৯৮১) p. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

১৫০. A, Ahsan, `Muslim Response to the Western Criticism of Islam : A studdy of Amir Ali's life and works', (Unpublished M. A. Thesis, Johu Grant, ১৯১২) p. ৫২০

১৫১. W. Muir, Life of Mohammad, New revised ed. (Edinbugh : John Grant, 1912) p. ৫২০

১৫২. A. ali, The Spirit of Islam, ১৯২২ সালের সংস্করণ হতে পুনর্মুদ্রিত (করাচী:পাক পাবলিশার্স লিঃ ১৯৬৯) পৃ. ৭২

১৫৩. Muri. p. ২৪১

১৫৪. Ali, Spirit of Islam, pp, 73. ff

১৫৫. Ali, A short history of the Saracens. Revised ed. (London : MacMillan, ১৯৫১) ঢ় ১৪

১৫৬. আলী, Spirit of Islam, পৃ. ৮২

১৫৭. আলী, Spirit of Islam, পৃ. ২৫৬

১৫৮. H.A.R Gibb, Modern Trends in Islam (Chicago Unviersity Press. ১৯৫০) ঢ়. ৫৯

১৫৯. আলী, `Memoirs' p, ১৭

১৬০. Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan, ১৯৬৭) pp. ৭৭-৮৬

১৬১. Ali, `The Caliphate and the Islamic Renaissance' Life and Works, p. ৪৪০

১৬২. Ali, Spirit of Islam, p. ২৪৯

১৬৩. W.C. Smith p. ১২

১৬৪. Ali, Spirit of Islam, p. ১৩৭, ১২৮, ১৮০

১৬৫. Muir, Preface p. lxiv

Dhaka University Institutional Repository

১৬৬. Ali, Spirit of Isam, p. ৮২২

১৬৭. k. Criagg, Counsels in Contemporary Islam, p. ৫৪

১৬৮. Ali, Spirit of Islam, p. ৬৪

১৬৯. কাসিমী, তফসীর, খণ্ড ১৫, পৃ. ৫৫৫৫/ কুরতবী, আল-জামী খণ্ড ১৭ পৃ. ৯১/ কুতব, ফি জিলাল আল-কুরআন খণ্ড ২৭, পৃ. ২৫/ ইউসুফ আলী, The Holy Quran, পৃ. ১৪৪৩/জামাখশীরী, হক আল-মজিদ খণ্ড ২, পৃ. ১৪২০-২১।

১৭০. ইবন আরাবী, তাফসীর, খণ্ড ১, পৃ. ৭২ ও খণ্ড ২, পৃ. ৫৫৫, এ রচনার বিশ্বাসযোগ্যতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং বলা হয়ে যে, এটি ইবন আরাবীর নয়, বরং কাশানী-রচিত। H. Landolt, `Der Briefwechsel Zwischen Kasani und simnani, under Wahdar al-Wagad" Der Islam আমাদের মতে অবশ্য এ ধারণা ইসলামী দার্শনিকদের মধ্যে বিরাজমান ছিল।

১৭১. Ali, Spirit of Islam, p. ৩৪

১৭২. J. M. Baljon, the Reform and Religious Ideas of Syed Ahmad Khan (Leiden 1994) pp. ৫৫-৫৬

১৭৩. Ali, Spirit of Islam, p. ৩৩,৯

১৭৪. Ali, Critical Examination, preface. p. ix

১৭৫. Ali, Spirit of Islam, p. ৩৯৭, ৪৫৪

১৭৬. Ali, Islam and its Critics, Life and Works. p. ১২৭

১৭৭. Ali, `Memoirs' n. ৯৭

১৭৮. Raymond P. Holt, The Unitarian Contribution to Social Progrcss in England (London : George Allen and Unwin, ১৯৩৮) p. ১৮০, ১৩-২৮, ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯. Valdeman Argow, Unitarian Universalism : Some Questions Answered, Boston : Unitarian Universalist Association, n.d) p. ৬

১৮০. Ali, Spirit of Islam, pp. ১৭৮-১৮৩

১৮১. H. Malachlan, The Unitarian Movement in the Religious Life of England, (London : George Allen and Allen and Unwin. ১৯৩৪) pp. ১২৭-১৪৯

১৮২. Encyclopedia Britannica 1970 ed. S.V Utilitarianism, by J. D. M

১৮৩. Basil Willey, Nineteenth Century Studies (London : Chatte and Williams, 1949) p. ১৮২

১৮৪. Encyclopedia Britannica 1970 ed. S.V. `Comte' by H.E. Bar

১৮৫. Memoirs (পৃ. ৪৯) তিনি Gcorge cotter Morison সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে একটি ও গিবন সম্পর্কে আরেকটি বইয়ের লেখন (আলীর বর্ণনা মতে) তেমন কোন লোক তাঁর ইংল্যাণ্ডে থাকাকারে লন্ডনে ছিলেন না। অবশ্য এ ব্যক্তির উদ্ধৃত আরেক পরিচয় স্যার থিওডোর মরিসনের পিতা হিসেবে এটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইনি জেমস কটার মরিসন; এবং জর্জ কটার মরিসন নন।

১৮৬. G. H. Busey, `The Reflection of positivism in English Literature to 1880 : the Positivism of Frederick Harrison' (abstract of a ph. D. thesis, Univ, of 11 linois, ১৯২৪) p. ৫

১৮৭. W. L. blease, A Short History of Liberalism (London : T. Fisher & Unwin, ১৯১৩) p. 238

১৮৮. Ali, Spirit of Islam, p. 174

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯. August Comte, System of Positive Polity, ৪ খণ্ড (নিউইয়র্ক, বার্ট ফ্রাঙ্কলিন, প্রথমে ১৮৭৫ সারে লন্ডনে প্রকাশিত) পৃ. ২৮

১৯০. Comte, A General view of positivism (নিউইযর্ক, রবার্ট স্পেলার এণ্ড সন্স, ১৯৫৭) পৃ. ৩৫৫, ৩৬২

১৯১. কোঁতে, Positive Polity : পৃ. ২ : ১২, ২৫

১৯২. Comte, General view, p. ২৭

১৯৩. Comte, Positive Polity p. 2 : 25

১৯৪. Ali, Spirit of Islam, p. 144 ভভ

১৯৫. Comte, Positive Polity p. II-12, 16

১৯৬. Ali, Spirit of Islam, p 169 ff

১৯৭. Comte, General view, pp. 9ff

১৯৮. Ali, Spirit of Islam, p. 181

১৯৯. Comte, General view p. 365

২০০. Ali, spirit if Islam, p. 174

২০১. Comte, General view p. 387

২০২. Ali, spirit of Islam, p. 162

২০৩. Comte, General view, p. 362/Ali, Spirit of Islam, p. 454

২০৪. Ali, Spirit if Islam, p. 454

২০৫. I. H. Qureshi, The Muslim Community of the Indo-Pakistan-Sub continent (The Hague : Mouton and Co. 1962) pp. 178-182

২০৬. Ali, Mohommedan Law. 2 vol. (Calcutta : Thacker, Spind & Co. 1908) p. 1/3

২০৭. Ali, The Caliphate, p. 424

Dhaka University Institutional Repository

২০৮. Ali, Mahommedan Law. p. 1 : 3

২০৯. Ali, some Indian Suggestions for India, Life and Work. pp. 3-22

২১০. Ali, The Mohmmedans of India and their Place in the Empire, Life and Work, p. 383

২১১. Ali, Mohammedans of India. p. 384

২১২. Ali, Italy and Turkey. Life and Work, p. 365

২১৩. Arnold Toynbee, Anomalis of Civilization-A peril to India, Life and Work, pp. 290-1

২১৪. Arnold Toynbee, A Study of History. Abridgement edition (London: Oxford University press, 1960) p. 77

২১৫. বৃটিশের বিরুদ্ধে বিখ্যাত 'অভ্যুত্থান' সাধারণ পাক-ভারতীয় ইতিহাসবেত্তাদের দ্বারা 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' এবং বৃটিশদের দ্বারা 'বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হয়। অনুবাদকের টীকা : এ ব্যাপারে অনেকে অবশ্য ভিন্নতম পোষণ করেনস-------- ------ 'সৈয়দ আহম ও আবদুল লতিফ বৃটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত হতে চান নি। তাঁরা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই জাতীয় নবজাগরণ চেয়েছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী এরূপ রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা পছন্দ করতেন না।' -------- ডঃ ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, পৃ. ১১৪ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৯০। জলন্ধর জেলা নিবাসী উকিল মৌলভী নিয়াজ মুহাম্মদ খানকে এক পত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ লেখেন (১০-১২-১৮৮৮)-মুসলমানদের কোন প্রকারের রাজনৈতিক 'এজিটেশন' অবলম্বন করা সঙ্গত নয়। (দ্র : 'স্যার আহমদের পত্রাবলী, পৃ. ২০২ অনুবাদ : মুজীবুর রহমান, বাংলা কোডেমী, ঢাকা, ১৩৭৮)

Dhaka University Institutional Repository

২১৬. Ali, Crtical Examination. Preface. p. vii

২১৭. Encyclopaedia of Religion and ethics, s.v. Apologetics' by T.W. Crafer

২১৮. Ali, Spirit of Islam, IIIn.

২১৯. Ali, Critical Examination pp. 29 and passim.

২২০. Ali, Spirit of Islam, p. 43

২২১. Ali, Memoirs, p. 57

২২২. Thomus Wise, Amir and the English Views of Islam, The Journal of the University of Peshawar (no. 5. 1956) p. 68

২২৩. Encyclopeadia of Religion and Ethics, s. v Apo;ogetis' p. 613

২২৪. R. Rahman, Muslim Modernism in the Indo-Pakistan Sub-Continent Bulletin of the SOAS, Voi. XXI Part 1. 1958, p. 87/ Smitth p. 49

২২৫. Ahamad, p. 42

২২৬. Ali, A cry, p. 42

২২৭. Ali, The Caliphate, p. 388

২২৮. Ali, Critical Examination, Preface, p. vi

২২৯. Wise, p. 62

২৩০. W. C. Smith, Islam in Moddern History (New Youk : New American Library, 1957) p. 62

২৩১. Simith, Modern Islam. p. 8 Abyev`‡Ki UxKv: Avgxi আলীকে M. A. Karandikar (Islam in India's Transition to Modernity, Bombay : Orient Longmans, ১৯৬৮, pp. ১৫৮,

Dhaka University Institutional Repository

৩৬৭) 'আতি-প্রভুভক্ত' (Ultra-loyalist) আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, তিনি (আমীর আলী) গণতন্ত্র, মুক্তি, নারীদের সম-অধিকার প্রভৃতি সব কিছু ইসলামের কোন 'কোলে উপস্থিত বলে দেখিয়েছেন।

২৩২. Ali, Additional Chapter on Moslem Feelings, life and Work, p. 361

২৩৩. Ali, The Unrest in Inddia-Its meaning, Life and Work, p. ২৫১।

২৩৪. Ali, Presidential Address to the Muslim League Delihi Session, Life and Work, p. 330.

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ণ ঃ

সমগ্র ভারতীয় সমাজ যখন অবজ্ঞা ও কুসংস্কারের তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল এবং পাশ্চত্য শিক্ষার প্রতি তাদের বিরাগ ছিল প্রবলতর ঠিক তখনই সৈয়দ আমীর আলী প্রতীচ্য (ইসলামী) ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে এগিয়ে আসেন। তাঁর মত কর্মতৎপর ব্যক্তি সেসময়কার মুসলমান সমাজে খুব কমই ছিল। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব সবরকম সংকীর্নতা ও সাম্প্রদায়কতা উর্দ্ধে ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় লণ্ডনে "ব্রিটিশ রেডক্রস সোসাইটি" স্থাপনের মাধ্যমে। এর অন্যতম উদ্দোক্তা হিসেবে তিনি সমাজসেবার ক্ষেত্রে অণন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি শুধু প্রথিতযশা আইনবিদ, সংস্কারক ও দার্শনিকই ছিলেন না। তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্য, অসাধারণ ও বহুমুখী। তিনি যেমন ছিলেন সুপণ্ডিত, তেমনি ছিলেন সুলেখক ও সুসাহিত্যিক। হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন তিনি আইনের উপর অনেক বই লিখেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে সাক্ষ্যবিধি (Law of Evidence) বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন (Bengal Tenancy Act) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব বিষয়ে এগুলোই সবচেয়ে ভালো আর প্রামাণ্য হিসেবে আদৃত হয়ে আসছে আজও। কিন্তু দু'খণ্ডে সমাপ্ত মুসলিম আইনের বিরাট সংকলনখানাই হলো তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আধুনিক আইনজ্ঞদের সুবিধার জন্যেই একাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন।

সে সময়ে ইউরোপীয় লেখক এবং ধর্ম প্রচারকদের দিক থেকে ইসলামের উপর হামলার তীব্রতা বেড়েই চলেছিল। স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে কঠিন লড়াই করতে হচ্ছিল এই হামলার জবাব দিতে গিয়ে। লেখনীর সেই সংগ্রামে সৈয়দ আমীর আলীও শরীক হয়েছিলেন। ইসলামের দুশমনদের অপপ্রচারের ফলে মানুষের মনে যে বিভ্রান্তি ক্ষতিকর ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই গ্লানিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ইতিহাস ও ধর্ম সন্মন্ধে অনেক বই লিখেন। বস্তুত: বর্তমান যুগের পটভূমিকায় ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামের স্বার্থসংরক্ষণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন সুনিপুণ

Dhaka University Institutional Repository

যোদ্ধা। ইংরেজী ভাষায় তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। তিনি ইসলামের ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও দর্শন নিয়ে বহু প্রামানিক গ্রন্থ রচনা করেন। সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন ইসলামের অক্লান্ত কর্মী। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে ইসলাম বিপন্ন হলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না তা বিচারাসনেই হোক আর ব্যবস্থাপক সভাতেই হোক বা প্রিভি কাউন্সিলেই হোক। তিনি কখনো তাঁর কর্তব্য পালনে বিচ্যুত হতেন না। তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরকে ও বিমোহিত করে।

তাঁর জীবনের সর্বশেষ্ঠ কীর্তি পাশ্চাত্য জগতের কাছে ইসলামের মূলনীতি প্রচার ও বিশ্বে ইসলামের মর্যাদার উন্নয়ন সাধন। অসাধারণ দক্ষতার সাথে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হরেক রকম অভিযোগের সমুচিত জবাব দিয়েছেন। দূর করেছেন সমালোচকদের মনের অকারণ সন্দেহ। তাঁর পাণ্ডিত্যের ব্যপ্তি, যুক্তিগুণের বিশিষ্ট কৌশল বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। তাঁর দাঁতভাঙ্গা জবাবে দুশমন দল সন্ত্রস্ত থাকত। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের 'খুতবাৎ-ই-আহমদীয়ার চেয়ে সৈয়দ আমীর আলীর "The Sprit of Islam" নি:সন্দেহে উচুঁ পর্যায়ের সৃষ্টি, একথা গুণীমহলে শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করা হয়। কারণ নিজের ধর্মের প্রতি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ভালবাসা ছিল নিশ্চয়ই অগাধ; কিন্তু সেই অনুপাতে যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম এবং ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল একান্ত সংকীর্ণ। তাছাড়া আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারার বিশেৱষণে সৈয়দ আমীর আলী যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন-সৈয়দ আহমদ খানের লেখায় তেমন কিছুর সন্ধান মেলে না। দুনিয়ার নানাবিধ ধর্ম সন্মন্ধে সৈয়দ আমীর আলীর চর্চা ছিল ব্যাপক ও সুগভীর। আধুনিক যুক্তিসম্মত উপায়ে পারস্পারিক তুলনামূলক বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে তিনি প্রমাণ করেন যে, ইসলামই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন একজন উৎসর্গীত সমাজসেবক। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিচারক হিসেবে কর্মজীবনের মধ্যেও তিনি সমাজসেবা অব্যাহত রাখেন। তিনি একনিষ্ঠ সমাজসেবক কিন্তু তাই বলে অমুসলমানদের প্রতি আদৌ অসহিষ্ণু ছিলেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশাবলীর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম প্রস্তাব ছিলো এই যে, 'ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের কল্যাণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

সৈয়দ আমীর আলীর ইসলাম সম্মন্ধে প্রকাশ ভঙ্গি ছিল চমৎকার, অনুপ্রেরণা মূলক ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী দুনিয়ার সর্বত্র এবং সকল মতের মুসলমানদের প্রশংসা অর্জন করে। ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করে তিনি তুলে ধরেছেন যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা:) একজন আদর্শ মানব ও নেতা। একথা সবিশেষ উলেৱখযোগ্য যে, মুসলমানদের রেণেসাঁ বা পুনর্জাগরনের জন্য ভারতের অন্যান্য মুসলমান নেতাদের অপেক্ষা সৈয়দ আমীর আলীর অবদান অনেক বেশী মূল্যবান ও ফলপ্রসু ছিল। আব্দুর রহিমের মতে 'ইসলাম যে মণীষা বিকাশের শক্তিরূপে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তাতে তিনি গৌরব অনুভব করতেন।

মুসলমান জাতির পতনের কারণ ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ না করা ইসলামকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ও হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জীবনাদর্শের অনুসরণ দ্বারাই মুসলামানদের পুনজাগরণ সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর The Sprit of Islam গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন- "in the following pages I have attempted to give the history of the evolution of Islam as a world-religion; of its rapid spread and the remarkable hold it obtained over the conscience and minds of millions of people within a short space of time. The impulse it gave to the intellectual development of the human race is generally recognized. But its great work in the uplifting of humanity is either ignored or not appreciated; nor are its rationale; its ideals and its aspirations properly understood. It has been my endeavor in the survey of Islam to elucidate its true place in the history of religions. The review of its rationale and ideals, however feeble,

Dhaka University Institutional Repository

may be of help to wondrous in quest of a constructive faith to steady the human mind after the train of the recent cataclysm, it is also hoped that to those who follow the faith of Islam it may be of assistance in the under standing and exposition of the foundations of their convictions."

সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাশীল কর্মধারা ও মননশীল রচনাবলী বাংলার মানুষের কাছে যদি সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হত, তা হলে হয়ত তিনি বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের জোয়ার আনতে পারতেন। হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার-পর থেকে ক্রমশ তাঁর জন-সংযোগ হ্রাস পায়। লণ্ডনে যাওয়ার পর থেকে তা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে, রমেশদত্ত, আশুতোষ মুখপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু নেতা স্বজাতির জন্য যা করতে পেরেছেন, সৈয়দ আমীর আলী ঠিক ঐরূপটি করতে পারেননি। তাঁর মত একজন মণীষীকে পেয়েও মুসলমান সমাজের বদ্ধমুখ, রুদ্ধগতি অপসারিত করে নব জাগরনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পেরেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই দেশে ও দেশের বাইরে সৈয়দ আমীর আলীর (তাঁর) চিন্তার ফসল সরাসরি দেশবাসীর কাছে পৌঁছেনি, তবে কিছুকাল পরে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের প্রচেষ্টায় বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে তা প্রচারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

মুসলমানদের আধুনিকীকরণ ছিল সৈয়দ আমীর আলীর স্বপ্ন। নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদের মতো তিনিও উপলব্ধি করেন যে, ভারতে আত্মমর্যাদা নিয়ে টিকে থাকতে হলে ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া মুসলমান সমাজের অন্য কোন উপায় নেই। তাইতো তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করে গিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে রাজনৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ব্যতীত মুসলমান সমাজে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি প্রথমে রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা চালিয়েছেন।

তিনি (সৈয়দ আমীর আলী) মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাদের কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ উদঘাটিত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। মুসলিম অতীতের গৌরবময় কার্যকলাপকে তিনি বাংলার মুসলমানদের পুনর্জাগরনের ভিত্তি স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন।

তিনি (সৈয়দ আমীর আলী) ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংস্কার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে বলা যেতে পারে মুসলিম রাজনৈতিক পুরোধা। তিনিই প্রথম উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, "ভারতীয় মুসলমানগণ একটি জাতি।" ১৮৭৭ সালে তিনি সেন্টাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" গঠন করে মুসলমানদের জন্য রাজনৈতিক স্বতন্ত্রের আন্দেলোন শুরু করেন। দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবনব্যাপী অবসর জীবনযাপন কালে ইসলামী বিষয়ের সমর্থনে এবং ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি বিধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দোষ ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই সৈয়দ আমীর আলীও এর থেকে মুক্ত নয়। তার মাঝেও কিছু নেতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়। তৎকালীন সমাজে তাঁর মত বৃটিশ সরকারের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন। অথচ তিনি মুসলমানদের প্রাণের অনেক দাবী উপেক্ষা করে গেছেন। তিনি বৃটিশ সরকারের সাথে সুরে সুর মিলিয়ে উচ্চ শিক্ষার কথা বলে গেছেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করে দেখেননি যে, সবার পক্ষে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ তার মত সোনার চামচ মুখে নিয়ে ক'জনের জন্ম। তিনি উচ্চ বিলাসী ছিলেন। তিনি পশ্চিমা ধাচে চলাফেরা পছন্দ করতেন। তাইতো তিনি জীবনের অবসর সময় বিলেতেই কাটিয়েছেন। তাঁর এসব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি যে ভারতবর্ষ তথা গোটা বিশ্বের মুসলমানদের কল্যাণের জন্য কাজ করে গেছেন তা সত্যি বিরল।

Dhaka University Institutional Repository

সমাপনী বক্তব্য ঃ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ও বিলাতের বার-এট-ল পাশ সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্ব ছিল উচ্চ ও বহুমাত্রিক এবং গতিশীল। তাঁর 'সেন্টাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ছিল রাজনৈতিক সংগঠন। তিনি বাংলার ও ভারতের নব্য শিক্ষিত শ্রেণীকে এই সভার মাধ্যমে সংগঠিত করেন এবং মুসলিম জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করেন। ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তা তাঁর লক্ষ্য হলেও বিশ্ব-মুসলিমবাদের আদর্শ থেকে তিনি বিস্মৃত হননি। বিশ্ব-মুসলিমবাদের জন্মদাতা সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীকে আবদুল লতিফ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বক্তৃতা করতে দেননি। আমীর আলী এলবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। ব্রিটিশ সরকার জামালউদ্দীন আফগানীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি ইসলামি ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সভ্যতার গুণকীর্তন করে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। উর্দু তাঁর মাতৃভাষা, ইংরেজি শিক্ষা ও চর্চার ভাষা। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার লোপ ও ইংরেজি প্রচলন চান। আবদুল লতিফ মাদ্রাসা শিক্ষা অক্ষুণ্ন রেখে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন চান। সুতারাং কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভিন্নতা ছিল। তবে মুসলিম সমাজের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আবদুল লতিফের মত আমীর আলীও অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন।

মুসলমানদের আধুনিকীকরণ ছিল সৈয়দ আমীর আলীর স্বপ্ন। তাইতো মুসলিম সংহতির চিন্তায় সর্বদা তাঁর প্রাণ কাঁদত। কারণ মুসলমানরা রাজ্য হারিয়ে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হারিয়ে, রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা হারিয়ে অভিমানবশত শাসক ইংরেজদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইংরেজী ভাষা উপেক্ষা করেন। এককথায় পাক্ ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা পাশ্চত্য শিক্ষা বর্জন করেন। ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের কারণেই মূলত মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করে। পক্ষান্তরে এই উপমহাদেশের অমুসলিমরা পাশ্চত্য শিক্ষা গ্রহণ করে বিজেতা ইংরেজদের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠে এবং তাদের নিকট হতে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকে। ইংরেজদেরকে সম্পূর্ণ বয়কট করায় মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার বরেণ্য সন্তান সৈয়দ আমীর আলী অনুভব করেন যে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে যেমন অজ্ঞনতার অন্ধকার দূরীভূত হবে, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজদের সংগে মুসলমানদের সুসর্ম্পকও স্থাপিত হবে। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রাষ্ট্রীয়ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমমর্যদার আসনে আসীন হবার জন্য উৎস প্রদান করেছেন।

মুসলমান নেতাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। কেননা তিনি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা দেখতে পান। এ কারণেই তারা তাদের ন্যায অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়। এজন্যই তিনি ১৮৭৭ সালে মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (সেন্টাল ন্যাশনাল মোহমেডান এসোসিয়েশেন) স্থাপন করেন। কেননা তিনি বুঝতে পারেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংখবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের কাজে অধিকতর সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সমাজ যখন অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল এবং পাশ্চত্য শিক্ষার প্রতি তাদের বিরাগ ছিল প্রবলতার ঠিক তখনই সৈয়দ আমীর আলী পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ধর্মানুরাগী ছিলেন কিন্তু ধর্মীয় কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন উদার পন্থীদের একজন। তাই বলে তিনি ধর্মকে উপক্ষো করেননি। তার প্রমান মেলে তাঁর রচিত ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আহবান জানিয়েছেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে মুসলমান জাতির উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। আর এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তার। এ ছাড়া মুসলমানদের মুক্তির আর অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু মুসলমানদের ধারণা ছিল ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে ধর্ম ত্যাগ করা হবে। তাই তারা এ শিক্ষা থেকে দূরে থাকত। তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন যে, স্বজাতির বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতি এবং রাষ্ট্রীয় দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য তাদের ইংরেজী শিক্ষা অপরিহার্য । এ শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষার নিরিখেই তিনি মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তার চেয়েছেন। কারণ তিনি ইংরেজী শিক্ষার পুরোপুরি সর্মথক ছিলেন। তাই তিনি ১৮৭৭ সালের ১২ মে প্রতিষ্ঠা করেন "ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েসন" পরে এই সমিতির নামকরণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ প্রতিষ্ঠানটি মুসলমানদের অন্যান্য দাবী-দাওয়ার সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী- দাওয়া গুলোও বৃটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর এ প্রতিষ্ঠানটি সম্ভাব্য সকল উপায়ে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে।

সমিতিটি শহরের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে। ন্যায় সঙ্গত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি সাধন করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। তাঁর চেষ্টায় করাচীতে মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থাবলী রচনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষার দ্বার উম্মোচন করে দিয়েছেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানগণ তাদের অতীত ইতিহাস ও কীর্তি হতে শিক্ষা ও অনুপেরণা পাবে যা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে।

এসমিতি নারী শিক্ষার অচলাবস্থা দূরীকরণেও চিন্তা-ভাবনা করে। সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য অনেক বিষয়ের মতো নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল ছিল। তিনি ১৮৯৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে' সভাপতির ভাষণে বলেন যে, মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরালভাবে চলা উচিত। তাতেই সমাজে ভারসাম্য রক্ষিত হবে, পুরুষ নারী একত্রে সমান উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে না। বরং এক অংশকে শিক্ষিত ও অপর অংশকে নিরক্ষর করে রাখলে ফল মারাত্মকই হবে। শিক্ষিত অংশ আনন্দালাভের জন্য অসামাজিক আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়বে। আমীর আলী নারীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত দিলেও তিনি সে শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য কোনো চেষ্টা করেননি।

পরিশেষে আমরা তাঁর কর্মজীবন পর্যালোচনা করে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, মুসলমান রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রণী রূপে এবং পুনর্জাগরণের জন্য সৈয়দ আমীর

Dhaka University Institutional Repository

আলী যে অবদান রেখে গিয়েছেন তা মুসলমান সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা তিনি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। তাইতো তিনি মুসলমানদের পুণর্জাগরনে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং সাথে সাথে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মুসলিম ভাতৃত্ব ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবস্মরণীয় আর শিক্ষা ক্ষেত্রে ও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মোটকথা তাঁর ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা, সামর্থ্য, জাতীয় উদ্দিপনা, চরিত্র, ধর্মীয় শ্রদ্ধা-বোধ এবং তাঁর রচনা সম্ভার অবশ্যই পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমান সমাজের এক অমূল্য সম্পদ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. নূর নূরানী কোরআন শরীফ, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) সোলেমানিয়া, বুক হাউস, ঢাকা, ২০০৮ আগষ্ট

২. ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় খন্ড- ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

৩. বাংলা পিড়িয়া, ১০ম খন্ড- ওয়াকিল আহমেদ, আব্দুল মোমিন চৌধুরী, এস, এম, মাহফুজুর রহমান, কামাল সিদ্দিকী এবং এস, এম, হুমায়ন কবির, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রধান সম্পাদক-সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা, ২০০৩

৪. চরিতা বিধান, শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১০, ১৯৮৫,

৫. The Sprit of Islam- সৈয়দ আমীর আলী, অনুবাদন ডঃ রশীদুল আলম, প্রকাশনা মল্লিক ব্রাদার্স পুনমুদ্রন ১৯৯৭,

৬. A Short History of Saracens- সৈয়দ আমীর আলী, অনুবাদকঃ হাবিব আহসান, সম্পাদনায়ঃ ডঃ ওসমানগণী, পুনমুদ্রণ ১৯৯৭।

৭. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭, ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, আহমদ পারলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৭৬।

৮. মুসলিস দর্শনের ভূমিকা, ডঃ রশিদুল আলম, সাহিত্য সোপান, বগুড়া, পুণমুদ্রণ-জুলাই ২০০২,

৯. উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, ইয়াসমিন আহমেদ-আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, প্রকাশ জুন ১৯৯০।

১০.বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস-১৮৫৭-১৯৪৭, অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হক, পৃষ্ঠা-৪৮

১১.সমাজকল্যান (স্নাতক), মোঃ আতিকুর রহমান, কোরআন মহল, ঢাকা, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১২. মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিতিক, ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, সাহিত্য সোপান, ঢাকা, ১৯৯৮।

১৩. সমাজকল্যান সমিক্ষন, প্রথম খন্ড; শিরোনাম-সমাজ কল্যান ইতিহাস ও দর্শন, সৈয়দ শওকতুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০।

১৪. উন্নতজীবণ গ্রন্থমালা-১, শিরোনামঃ আমীর আলী, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৭৫।

১৫. উপমহাদেশের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব-অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম-বই বিতান, প্রকাশ ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ১৭-২২।

১৬. Autobiography (Islamic culture- 1934-35), Eminent Mussulman) G.A water @ Co. Madras-1926.

১৭. M.C. Smith, Modern Islamic in India, London 1947. Index.

১৮. H.R.A Gibb, Modern trends in Islam Chicago- 1947. Index.

১৯. K.K. Aziz, Ameer Ali: His Life and works Lahore, 1964.

২০. Abdullah Ahsan, Memris and other writings of Syed Ameer Ali on Islamic History and cultures. Lahore . 1968

২১. Martin Forward.A late nineteenth century Muslim response to the western criticism of Islam an analysis of Amir Ali,s life and works ; American journal of blamic social science, 1985,

২২. A Failure of Islamic Modernism? Syed Amir Alis interpretation of Islam. Bern-1999.

২৩. বাংলার মুসলমানদের আদি বৃত্তান্ত, কলকাতা, ১৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. Anil Seal, Amir Ali to Private sectary, viceroy, 10March, 1884 (British Museum Indian state papers 290/8) quoted in the emergence to Indian Nationalism, Cambridge, 197.

২৫. The sprit of Islam (history of the evolution in ideals of Islam with a life of the prophet). Christopher, London 1955 (amplified and revised' 8th edition.) PV 11 (Preface)

২৬.Memoirs and other writing of Syed Ameer Aliu- edited Syed Razi Wasti, 1968.

২৭. ভারত কোষ-পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য, ১ম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬৫.

২৮. Rules and objects of the central national Mahomrdan Association and its Branch Associations with the quinqunnial and Annual reports, and list of members, Thomas S. Smith, city press Calcutta, 1888.

২৯. Indian Muslims, A Political History (1858-1947_, Ram Gopal, Asia Publishing House Calcutta, 1964 reprinted,

৩০. আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী (১৮৫৭-১৯৪৭) ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কামিয়ার প্রকাশক, এপ্রিল ২০০০।

৩১. মেময়বস অব আমীর আলী, ইসলামীক কালচার, ৫ম খন্ড, ১৯৩১, বেনামী লেখক ইসিনেন্ট মুসলমানস ।

৩২. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন শেখ এ রশিদ, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭২।

৩৩. মোহামেডান এডুকেশন, আমীর হোসেন প্রকাশকাল (১৮৮০) .

৩৪. মুসলিম মডার্নিজম- এস, এ খান (প্রবন্ধ), ১৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. মুসলিম মনীষা- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, প্রকাশক- মুহাম্মদ নুরুল আমীন, প্রকাশকাল জুন ২০০১.

৩৬. Rules and objects of the central National Mahommadan Association and its Branch Associations with the Quinqunnial and Annual reports and list of members. Tomas S. Smith city press, Calcutta, 1885.

৩৭. The Moslem chronicle. 21st March 1895

৩৮. মীর মোশাররফ হোসেন "সৎপ্রসঙ্গ" কোহিনুর, ভাদ্র ১৩০৫

৩৯. সৈয়দ এমদাদ আলী, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ নেতার অভাব, ইসলাম প্রচারক চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৯-১০

৪০. Indian Muslim: A political history P 329 (Appendix)

৪১. D.C. Sen. History in Bangali language and literature (Calcutta: University of Calcutta 1945) .

৪২. A. Ali 'Memoirs' Memoirs and other writings of Ameer Ali, ed. R. Wasti (Lahore: people's publishing house, 1968) .

৪৩. The Mohammedans of India and their place in the empire' Ameer Ali : his life andwork. Ed. K. K. Aziz (Lahore : publishers united 1968) .

৪৪. A critical examination of the life and teaching of Mohammed. (London: Willam and Norgate, 1873) .

৪৫. Norman Daniel, Islam and the west: making of an image (Edinburgh University press. 1958) .

৪৬. উদাহরণ স্বরূপ হসেন হায়কর নবী জীবনের উৎস হিসেবে কুরআনের ব্যবহারে

Dhaka University Institutional Repository

মূরকে পন্ডিত গন্য করেন। (Muir rejects the forgery of the Quran : M. H. Haykal. The life of Muhammad, হায়াতে মুহাম্মদীর ইংরেজী অনুবাদ. অনুবাদক ইসমাইল রাজী আল-ফারবকী, ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৯৭৬, নর্থ আমেরিকান ট্রাষ্ট পাবলিকেশন্স, প্রঃ

৪৭. Peter Hady, The Muslims of British India (Cambridge. Cambridge University press, 1972) .

৪৮. London Binder, The Ideological Revolution in the Middle East. (New York: John Wiley and Sons, Inc. 1964)

৪৯. Joseph Scaff, Christion missionary Attitude Towards Islam in India' (unpublished M.A. Thesis, Montreal: M. Gill University, 1981) .

৫০. A, Ahsan, `Muslim Response to the Western Criticism of Islam: A study of Ameer Ali's life and works ;(unpublished M.A. Thesis, John Grant, 1912) .

৫১. H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam (Chicago Chicago University Press. 1950) .

৫২. Islamic Modernism in India and Pakistan (oxford: Oxford University Press, 1967) .

৫৩. Counsels in Contemporary Islam (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1965).

৫৪. বৃটিশ ভারতের শাসন তান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭), অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, মোজাম্মেল হক, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫৪. জীবন চরিত, আজিমদ্দিন মুহাম্মদ চৌধুরী, সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল, ১২৯৬।

৫৫. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনন্স, অনু, হাবিব আহসান, এম এ, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৫৬। স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনু: মোহম্মদ দরবেশ আলী খান, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৫।

৫৭. উপমহাদের রাজনীতি ও ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম, বইবিতান, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৮৫।

৫৮. আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েক জন মুসলিম দিশারী (১৮৫৭-১৯৪৭), ড: মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, কামিয়াব প্রকাশন, এপ্রিল ২০০০।

৫৯. উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।

৬০. The Law Relating to Gifts, Trusts, and Testamentary Dispostions among the Mahommedans, Syed Ameer Ali, Bombay, Thacker, vining Co. London. w. Thacker & co. calcutta. 1885.

৬১. Law Evidence Applicable To British India, Syed Ameer Ali, Thacker, Spink & Co, Calcutta. 1905.

৬২. Law of Evidence, Woodroffe & Ameer Ali's, Law Book Company Allahabad, Calautta, 1979.

৬৩. Personal Law of the Mahommedans, Syed Ameer Ali you Books New Delli, India, 1929.

৬৪. A Commentary on the Bengal Tenancy act, Syed Ameer Ali, 1885, Law Book Company, Allahbad Calcutta, 1904.

৬৫, Thomas and Smith, Ruled Objects of the central National Mahomedan Association and it Branch Associations with theQuinquinnial and Annual Reports and List of members, City Press, Calcutta, 1885.

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. Mahammedan Law, ১ম খন্ড Syed Ameer Ali, New Dilhi, India 1985.

৬৭. Muslims Laws and Legislation, Syed Ameer Ali.

৬৮. Tagore Law Lectues, Mahommedan Law ২য় খন্ড, 1884, Himalayan Books, New Dilli, India. 1985.

৬৯. বঙ্গীয় মুসলমান, নওশের আলী খান ইউসফ জরী, হিন্দু প্রেস, কতকাতা, ১২৯৭।

৭০. ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ সংস্কার, মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ ও আবদুর রহিম মিলন প্রেস ডিপজিটরী, কলকাতা, ১২৯৭।

৭১. সমাজ ও সংস্কারক, রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী কলকাতা, ১২৯৬।

৭২. দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্, উইলিয়াম হান্টার, (অনু. আবদুল মওদুদ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪।

৭৩. বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (অনুঃ ডঃ মু স্তফা নুরউল ইসলাম), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৬৯।

৭৪. বাংলার সামাজিক ইতিহাতের ধারা (১৮০০-১৯০০), ৫ম খন্ড, বিনয় ঘোষ, পাঠভবন, কলকাতা, ১৯৬৮।

৭৫. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, যোগেশচন্দ্র বাগল, বঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৮৬৩।

৭৬. লিগ্যাল স্টেটাস অব উইমেন ইন ইসলাম, স্যর সৈয়দ আমীর আলী, লন্ডন ১৮৯১।

৭৭. Isamic History and Culture, Syed Ameer Ali, Tahir Mahmood, New Delhi, India, 1928.

৭৮. Dictonary of Indian Biography, London, 1906.

৭৯. Indian Policial Associations and Reform of Legislature

Dhaka University Institutional Repository

(1818-1917), Bimanbehari Majumdar, Firma, K. L. Mukhaopadhy aya, Culcutta, 1956.

৮০. British Policy and the Muslims in Bangal (1757-1856), Dhaka, 1961.

৮১. মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, হুমায়ুন আব্দুল হাই, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।

৮২. History of the Indian Association (1878-1951), Calcutta, 1953.

৮৩. History and Pollitics of Moslem Education in Bengal, Calcutta. 1917.

৮৪. History of English Education in India (1781-1893), Syed Mahmood, Aligarh, 1895.

৮৫. Muhammadan Education and Muhammadan Society, (Presidential address delivered at the Muhammadan Educational Conference of 1899) Calcutta. 1900.

৮৬. Muslims of Calcutta, M. K. A. Siddiqui, Calcutta, 1974.

---------- 0 ----------